তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ, ১৩৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ বৈশাখ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ॥ বৈশাখ, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক ঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর ঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃ

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ ঃ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই ঃ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁর কাছ থেকে প্রথম সাদর আহ্বান পেয়েছিলাম সেই
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের করকমলে

র জীবনকালের কথায় নিজের জীবনকে গৌণ করে কালকে বড় করে
র কথা এবং কৈশোরের কথা লিখে সাহিত্যজীবনের কথা লেখার
যখন করেছিলাম তখন এ কাজ যে কতো কঠিন তা ভেবে দেখি
ন লিখতে বসে মনে হচ্ছে এমন কঠিন কাজে হাত না-দেওয়াই ভালো ছিল।
নে পড়ছে বাল্যজীবনে প্রথম যেদিন কবি হিসাবে আত্মঘোষণা করি, সেই
নের কথা।

আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের
ঠকখানা-বাড়ির একটা খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন বয়স আমার
ত বৎসর—আটে পড়েছি। সুদীর্ঘকাল—বোধ হয় সতেরো আঠারো বৎসর ওই
লখা শিলালিপির মত ধূলার আস্তরণের নিচে থেকে বিবর্ণ সাদা অক্ষরে আঁকা
ল। আমার বয়স যখন ছাব্বিশ-সাতাশ তখন আমিই নিজে একদিন সাদা রঙ
য়ে দরজাটা রঙ করে সে লেখা মুছে দিয়েছি।

অল্পস্বল্প ছড়া কবিতা—এ ছেলেরা ছ-সাত বছর থেকেই মুখে মুখে রচনা করে
চরকাল। যে সবচেয়ে কম রচনা করে—সেও অন্তত অন্যের উপর বিরক্ত হয়ে
তার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করে থাকে। ওই লেখা
চনাটির আগেও আমার আশৈশব বন্ধু নারানকে ভেঙিয়ে আমি রচনা করেছি
ন্নে, খান্নে, টান্নে, মান্নে, ঘান্নে, ন্নে-ন্নে-ন্নে-ন্নে ইত্যাদি। একালের ছেলে-
মেয়েদেরও লক্ষ্য করেছি—আমার পাঁচ বছরের পৌত্র বারু (ডাক নাম) আমার
ার বছরের দৌহিত্রকে ভ্যাঙায়, বাবলু—খাবলু।

বাবলু বলে, বারু—খারু।

আমার দরজার লেখা কবিতাটি কিন্তু ও ধরনের ব্যঙ্গ-কবিতা নয়।
সলে জাত-কবিতা, তাই। দস্তুরমত করুণ রস অবলম্বন করে লেখা।
তে খেলা করছিলাম, হঠাৎ আমাদের বৈঠকখানার সামনের বাগানে
গাছের ডালের পাখির বাসা থেকে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে গেল

খাটতে। তিন বন্ধুতে ছুটে গিয়ে তাকে সযত্নে তুলে এনে বাঁচাবার এমন মারাত্মক চেষ্টা করলাম যে বাচ্চাটি বার কয়েক খাবি খেয়েই মরে গেল। বাল্য-মনে একটি করুণ রসের ধারা সঞ্চারিত করে গেল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল পাঁচু। তার জিহ্বায় ছিল জড়তা, সব সময় সব তাতেই সে হি হি করে হাসত। আর-একজন ছিল, তার নাম দ্বিজপদ। তিনজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম বোধ হয়। তারপর কল্পনা করেছিলাম বাগানের মধ্যে পক্ষী-শাবকটির সমাধি রচনার। যেমন কল্পনা তেমনি কাজ। ভাঙা ডালের টুকরা নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে-ঘটনাটুকুর জন্য সমস্ত ঘটনাটিই মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে গেল এবং সাহিত্যরচনার প্রেরণা এসে গেল আমার জীবনে।

পাঁচু হঠাৎ বললে—দেখ দেখ।

—কি?

—পাখিতার মা এচেছে। দাকছে।

সত্যিই পক্ষীমাতা বাসায় ফিরে শাবকটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মরা ছানাটির পাশে এসে ঠোঁট দিয়ে তাকে নাড়া দিচ্ছে—ডাকছে। একটি আহা শব্দ আমাদের তিনজনের মুখ দিয়েই বোধ হয় বেরিয়েছিল। কিন্তু বালক-চরিত্র বিচিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজপদ পা টিপে টিপে পক্ষীমাতাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল। পক্ষীমাতা উড়ল। এবং কিচ-কিচ শব্দ করে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল মাথার উপর।

হঠাৎ পাঁচুর হাত দিয়ে কবিতা বেরিয়ে গেল। আদিকবি বাল্মীকির কবিতা মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—কামার্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত হতে দেখে। পাঁচুর কাব্য নিঃসৃত হয়েছিল অনুরূপ প্রেরণায়। সে একটা খড়ি দিয়ে আমাদের ওই দরজায় খসখস করে দু-লাইন কবিতা রচনা করে ফেলল।

তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতার ছন্দ পাঁচুর তখন আয়ত্ত হয়েগিয়েছিল। দ্বিজপদ এ সবের ধার কোনদিনই ধারে নি, সে-দিনও না।

আমার মনে কিন্তু দোলা লেগে গেল। পাঁচু—পেঁচো! যার জিহ্বায় জড়তা, অহরহ অস্থির চঞ্চল যে পেঁচো, পাঠশালা-পলাতক যে পেঁচো সেই পেঁচো, খস-খস করে পদ্য লিখে ফেললে? একেবারে ছন্দে গেঁথে মিল দিয়ে পদ্য! প্রাপ্তবয়স্ক রসিক জন ও কবিতায় মিল খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আমি সেদিন মিল পেয়েছিলাম—'আমি' এবং 'করি' শব্দ দুইটি হ্রস্বইকারান্ত, ওই হ্রস্ব-ই—হ্রস্ব-ইয়ে মিল দেখেছিলাম। আর কিছু বয়স্ক হলে পাঁচু সহজেই 'মরিয়াছে আজি' না লিখে 'আজি গেল মরি' লিখে পরের লাইনের 'কেঁউ কেঁউ করি'র সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিল দিয়ে দিত। কিন্তু বালক কবিচিত্ত ওতেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল, ছন্দে গেঁথে তার মনের কথা বলা তো হয়েছে—আর বেশীর দরকার কি? আমার কাছে সে কবিতা সেদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলে মনে হয়েছিল!

দ্বিজপদ কিন্তু এতে একটুও চঞ্চল হয় নি, প্রেরণাও পায় নি। আমি হলাম, আমি প্রেরণা পেলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য, কাব্যসাধনার মহিমা সেদিন নিশ্চয়ই বুঝি নি, তবু সেদিন এটুকু বুঝেছিলাম যে, পাঁচু যা করেছে তা মহাগৌরবের, তার মূল্য অর্থের নয় মহিমার। ওদিকে পাখির মা তখনও কাঁদছে, একবার এসে ছানার পাশে বসে তাকে ঠোঁট দিয়ে নাড়ছে আবার উড়ে গিয়ে ডালে বসছে। আমিও পাঁচুর খড়িটি নিয়ে পাঁচুর কবিতার নিচে লিখলাম—

> পাখির ছানা মরে গিয়েছে
> মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
> মাটির তলায় দিলাম সমাধি
> আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

এমনি পোষা জীবজন্তুর সমাধি লক্ষ্য করলে অনেক বালক-কবির রচনা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরলে শিশু বালক তেমন উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু তার প্রিয় পাখিটি কি কুকুরটি যখন মরে তখন সে কাঁদে, তাকে সমাধি দেয়, তার উপর তার চিত্তের স্বতোৎসারিত বেদনাপ্লুত কাব্য উৎকীর্ণ করে দেয় সে। আমাদের গ্রামে ঢুকবার মুখেই পথের পাশে এমনি একটি কুকুরের সমাধি ছিল। তার উপরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ছিল—

সমাধি মোদের ভুকুর—
আমাদের ভাল কুকুর।

কুকুরটার নাম ছিল ভুকু।

মাটির তলায় পাখির ছানাকে সমাধি দিয়ে দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলাম পাঁচুর প্রেরণায়। পাঁচু এর পর এমন কবিতা আর রচনা করেছিল কি না জানি না, তার আর কোনো লক্ষণ আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু আমার নেশা লাগল। এর পরই পূজোর সময় পূজামণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে আমাদের গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রচিত আগমনী কবিতা চোখে পড়ল। হাতে লিখে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। প্রতিবৎসরই তিনি কবিতা লিখে এই ভাবে দেওয়ালে সেঁটে দিতেন। আমারও সাধ হল পূজা উপলক্ষে কবিতা লিখব।

আমার বাল্য-সাথী ছিল লক্ষ্মীনারাণ। তাকে সঙ্গে নিয়ে পর বৎসর আগমনী কবিতা রচনা করলাম। প্রথম দু-লাইন আজও মনে আছে—

শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।

আরও এক লাইন মনে পড়ছে—'চারিদিকে বাজিতেছে কত ঢাক ঢোল'। এর সঙ্গে কি মিল দিয়ে কি লাইন রচনা করেছিলাম তা মনে নেই তবে 'গোলে হরি বোল' দিই নি এটা মনে আছে। যাই হোক এই কবিতা আমরা লিখেই ক্ষান্ত হই নি, রীতিমত ছাপিয়ে সকলের মধ্যে বিলি করে কবি সাহিত্যিক হিসাবে আত্মঘোষণা করেছিলাম। আজ সাহিত্যিক জীবনের কথা লিখতে গিয়ে সেই দিনের স্মৃতি মনে জেগে উঠছে। আমার বাল্যকালের স্মৃতির কথা 'আমার কালের কথা'য় যা লিখেছি তাই তুলে দেব।

সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে দুটি শিশু-কবি সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে আত্মঘোষণা করলে—'আমাদের পদ্য পড়ে দেখুন'। আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল নিশ্চয় বিচিত্র হাসি হেসেছিলেন। বুঝতে পারি নি আমি সেদিন আমার জীবনের সঠিক চলার পথে পা দিলাম।

যাক আমার আত্মঘোষণার কথাই বলি। বাংলার ক্ষুদ্র একটি পল্লীতে সে-কালের সমাজে আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। বাংলাদেশে তো কবির অভাব ছিল না। অনেক আউল কবি, বাউল কবি, তন্ত্রসাধক কবির নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে আছে, আরও অনেক অনেক জনের নাম কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তারা ছাড়াও খেয়া-ঘাটের মাঝি ছিল কবি, হাল-বলদের লাঙলের কারবারী চাষীও ছিল কবি; মুদি ছিল কবি, ময়রা ছিল কবি —চণ্ডাল বলতাম যাদের তাদের মধ্যেও অনেক কবি জন্মেছে। উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটে এমনি এক চণ্ডাল কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আলাপ হয়েছিল, এক রাত্রি তার সঙ্গে ঘন জঙ্গলে ভরা গঙ্গার তটভূমের উপর শ্মশানের টিনের চালায় বাস করেছিলাম। পৈত্রিক পেশা তার—শ্মশানে শবদাহ করা, কড়ি আদায় করা, শবের সঙ্গে থেকে কাপড় খুলে নেওয়া, বিছানাপত্র জড়ো করে একদিকে রেখে দেওয়া—সে তাই করছিল। পোড়া শবের গন্ধ ওঠে, সেইখানেই আসে তার ভাত—সেই ভাত সে হাত মুছে খেতে বসে যায়; মদ খায়; নির্লিপ্ত চিত্তে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চিতার দিকে চেয়ে বসে গান গায়—

"আমার মনের চিতে নিভল না।
দেহের জ্বালা জুড়ালোরে চিতের আগুনে, আমার মনের চিতে নিভল না।"

আমাদের গ্রামে বাউড়ীদের মধ্যে ডোমেদের মধ্যে কত কবি আছে। তাদেরই একজনকে নিয়ে আমার মানস সরোবরে স্নান করিয়ে আমার 'কবি' উপন্যাসের নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি।

বাংলা দেশটাই কবির দেশ। কবি অনেক আছে, কবির কাব্য শুনবার লোকেরই বরং অভাব, শ্রোতা নেই। তাই আগের কালের কবিরা কাব্য রচনা করে তাতে সুর যোজনা করে নিজেকেই নিজে শুনাত। মাঠের মধ্যে হাল বইতে বইতে চাষী কবি গান বেঁধে সুর দিয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠত—পাশে পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি সে-গান শুনেছি।

'চাষকে চেয়ে, গোরাচাঁদরে মান্দেরী ভা-লো—' গোরাচাঁদ কোনো বন্ধু চাষী নয়, গোরাচাঁদ—বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের গোরাচাঁদ—শচীমায়ের দুলাল। তাকে ছাড়া কাকে বলবে দুঃখের কথা? আমার ব্রজজ্যেঠা ছিলেন

পোস্টাপিসের চাকুরে, তন্ত্র-মন্ত্র সাধক, গাঁজা খেতেন, মদ খেতেন, আধপাগলা আত্মভোলা মানুষ; সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে কুটুম্ববাড়ি যাওয়ার পথে জুতো জোড়াটা ছিঁড়ে গেল। উত্তপ্ত বীরভূমের লাল কাঁকরের পথে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কুটুম্ববাড়িতে (মস্ত জমিদারবাড়ি) উপস্থিত হলেন। কুটুম্ব সত্যেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বারান্দায় বসে ছিলেন, তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি ব্রজবাবু, খোঁড়াচ্ছেন কেন ? কি হল ?'

ব্রজ জ্যাঠা সেই অবস্থাতেই সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে খাঁটি মনোহরশাহী কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন—

"ভাস্করেরই কর (ও) অতীব প্রখর (ও)
ফোসোকা (ফোস্কা) পড়িল পায়ে।
তাহার (ও) উপর (ও)—পথেতে কাঁকর (ও)
লবণের ছিটা ঘায়ে॥"

সুতরাং এদেশে কবি হওয়াটা এমন আর কি বিস্ময়ের কথা ?

কিন্তু না। বিস্ময়ের কথা বটে।

ছাপানো হরপে, আধুনিক কালের ধারায় আগমনী কবিতা। এতে শারদীয়া শব্দটি আছে, বহিরঙ্গের রূপ আছে, ঢাক-ঢোল আছে, বিচিত্রবর্ণ বেশ-ভূষার উল্লেখ আছে কিন্তু আগমনীর মধ্যে গিরিরাজ কই ? গিরিরানীর মেনকা কই ? নূতন কালের নূতন ধারা যে এ কাব্যরচনার মধ্যে স্পষ্ট। এ যে রীতিমত মাইকেল, বঙ্কিমবাবু, নবীনবাবু, হেমবাবুর মতো একটা কেউকেটা হবার চেষ্টা !

কবিতাটি ছাপানো হয়েছিল কলকাতায় কালিডোনিয়ান প্রেসে। মস্ত বড় প্রেস—সাহেব কোম্পানির ছাপাখানা, ছাপা চমৎকার—নীল কালির হরপগুলি চোখ জুড়িয়ে দেয়। আমার বন্ধু নারানের পিতামহ ছিলেন কালি-ডোনিয়ন প্রেসের বড়বাবু। তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল নারান—তিনি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কাব্য যেমন হোক তার প্রকাশের আড়ম্বর এবং সমারোহ দেখে লোক একবার কাগজখানার দিকে, একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকালে। আমাদের গ্রামের অবস্থা তখন বিচিত্র। গ্রাম্য সমাজে উচ্চতম আসনের অধিকার

নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মত দ্বন্দ্বজর্জর। কুরুক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ পদাতিক এখানে নগণ্য—গৌণ, মুখ্য এখানে রথীর দল। শিক্ষায় সভ্যতায় সম্পদে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সত্যই তখন রথীপদবাচ্য। কিছু জমিদার, কিছু জমি, পুকুর, বাগানের মালিক সকলেই। সকলেই মহামানী দুর্যোধনের মত মানী। সকলেরই পণ—বিনা রণে নাহি দিব স্বচ্যগ্র মেদিনী। এঁরা তো শল্য প্রভৃতির মত রথী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জুনের মত রথীও ছিল। স্বচ্ছল জমিদারি—বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, প্রাচীন কালের শিক্ষা-ও আভিজাত্য-সম্পন্ন কয়েকটি পরিবারও ছিল। কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায় প্রচুর অর্থ, এমন পরিবারও ছিল একটি। তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা ছিলেন। তাঁরা বারোমাস থাকতেন কলকাতায়। এ ছাড়া উকিল ছিলেন, চাকুরে ছিলেন কয়েক জন। এই প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বজর্জর লাভপুর ক্ষেত্রে সকলেই ছিলেন যুধ্যমান। তাঁদের কাছে কাগজে ছাপিয়ে কবিতা বিলি করে আত্মঘোষণার অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন বালক দুটি কোন কালের কবি হতে চায়। এবং সে কবিকে এ কালের বিধি অনুযায়ী কোন প্রাপ্য দিতে হবে!

ব্রজ জ্যাঠা—জমিদার সত্যেশবাবুর বাড়িতে যখন গান রচনা করে গেয়ে ঢুকলেন "ভাস্কর কর অতীব প্রখর—ফোসোকা পড়িল পায়ে" তখন গৃহস্থ সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে কবির পদসেবার ব্যবস্থা করে এক জোড়া জুতাও তাঁর পায়ে সপ্রেমে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কালের কবিরা ছিলেন মানুষের প্রাণের মানুষ, রাজসভায় সভাকবি, দেশের মধ্যে কীর্তনীয়া, কবির সর্বোচ্চ আসন ছিল মহাজনত্ব। এ-কালের কবিরা—কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে পরিবর্তিত হয়েছেন। তাঁরা রাজসভায় যান না। রাজার বন্দনা রচনা করেন না। জনতার সভায় সভাপতির আসনে বসে অভিভাষণ দেন; গান তাঁরা আর গেয়ে শোনান না। এ-কালের কবির দাবি অনেক; দম্ভ না হোক—মর্যাদা আকাশস্পর্শী। কাজেই এ-কালে কবি বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকামী যাঁরা, তাঁদের পথ হয়েছে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ। সেকালের কবিদের পরস্পর সম্পর্ক ছিল ভাববিনিময়ের—রস-

সাধনায় সহযোগী ছিলেন তাঁরা। একালে আমাদের সাহিত্যিকদের পরস্পরের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার। রস-সাধনায় আমরা প্রতিযোগী—হয়তো ছিদ্রান্বেষীও। একালে সাহিত্যে সমালোচনা আছে, সমালোচনার পত্রিকারই কদর বেশী। পাঠকেরাও প্রিয় কবি সাহিত্যিককে জনতায় অপদস্থ দেখে প্রীতিলাভ না করলেও কৌতুক খানিকটা উপভোগ করেন। এ পরিবর্তনের কারণ বোধ হয় ওই। প্রাণের মানুষ গুরুঠাকুর হয়ে বসেছেন, নিজেদের দুর্লভ করেছেন বলেই বোধ করি পূজার ফুলের ভিতরের কীটদংশন স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করছেন।

এই কালের প্রারম্ভ তখন। ইংরাজী উনিশ শো চার-পাঁচ সাল। শহরে এর অনেক আগেই হয়তো এ-কাল আরম্ভ হয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ-কালের তখন প্রারম্ভ। আমাদের গ্রাম অন্য গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে ছিল। সুতরাং সেদিন কবি হিসাবে আমাদের আত্মঘোষণায় সকল রথীই উদ্যত ধনুর্বাণ হস্তে একবার সংশয়তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ইঙ্গিতেই প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যই তোমরা প্রতিষ্ঠাকামী? যে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছ—সে অস্ত্র সত্যই তোমার? প্রয়োগবিধি জান তুমি? মনে পড়ছে বহুজনের দৃষ্টিকোণে এই সংশয় দেখে ভীত হয়েছিলাম। সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম।

শুধু তিনজনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছি। একজন স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে একজনের অতি কটুবাক্য মনে পড়ছে, আজ পর্যন্ত ভুলতে পারি নি। তাঁর নাম করব না, তিনি আজও জীবিত—বলেছিলেন, হরিবাবুর ছেলেটা ইঁচড়ে পেকে গেল! চুরি করে পত্ত লিখে ছাপিয়ে বিলুচ্ছে। উচ্ছন্নে যাবে।

ওই কথা মনে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যসত্যই প্রবেশ করলাম তখনকার কথা। তারপর এই দীর্ঘকালের কথা। বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর'। '৩৪ সালের ফাল্গুনের কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশিত হওয়ায় যান্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। 'হারানো' সুর প্রকাশিত হল একমাস পর; তখন সম্পাদক জানালেন, আমাকে আর কল্লোলের জন্য মূল্য দিতে হবে না, কল্লোল আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। সুতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব। ১৩৩৫ থেকে ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর পূর্ণ দুটি যুগ। এই চব্বিশ বৎসরে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আমার বাল্যের ঐ দিনটি থেকে তো পৃথক নয়। প্রকৃতিতে এক। দ্বন্দ্বজর্জর। হবে নাই বা কেন? মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের পূজামণ্ডপকে ঐশ্বর্যে, মহিমায়, শোভায় তীর্থস্থলে পরিণত করেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এই তীর্থক্ষেত্রের পানে। এখানে সেবাইতের অধিকার পাবার জন্য প্রবেশপত্র পাওয়া তো সাধারণ কথা নয়। প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব সেও সহজ দ্বন্দ্ব নয়। একই দলের সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ঈর্ষা যে জর্জরতা দেখেছি, যে সমস্ত মন্তব্য উচ্চারিত হতে শুনেছি সে সব প্রকাশের অধিকার আমার নাই। নাই এই কারণে যে, তার মূলে বিদ্বেষটা খাঁটি সত্য ছিল না। যার নিন্দা করেছে তারই জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তার প্রাণ উতলা হয়েছে—আকুল হয়েছে—তাকে কাছে পেয়ে বিপুলানন্দে জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্তকে পেয়েছে সে। তবু তার নিন্দা করেছে। করতে বাধ্য হয়েছে বেদনার্ত জীবনের প্রলাপের মত। এ ব্যক্তিগত হীনতা নয়, এ জীবনের স্বভাব। অবশ্য এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁকে হীন না বলে উপায় নাই, কারণ তিনি হীন অভিপ্রায়ে এই দুর্বলতাকে গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন—তাও এমন ভাবে

করেছেন যে, যেন গল্পের নায়কটিকে সহজেই পাঠক চিনে নিতে পারে। আমার ভালো লাগে নি। অবশ্য গল্পের মধ্যে আমি নেই তবুও ভালো লাগে নি। বাঙলার পাঠক-সমাজেরও ভালো লাগে নি। তার প্রমাণস্বরূপ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের পাঁচশর প্রথম সংস্করণটিব অর্ধেকেব উপর আজ প্রকাশকেব ঘরেই বয়েছে।

ঠিক এই কারণেই আজ সাহিত্য-জীবনের কথা লিখতে বসে মনে হচ্ছে এ সঙ্কল্প কবে ভালো করি নি। সাহিত্য-জীবনের প্রথম ভাগটা আমাব ভাগ্যের অবহেলার কাল, অবজ্ঞার যুগ। অবহেলা অবজ্ঞাব সে এক বোঝা ঘাড়ে নিযে পথ চলেছি। সে সব কথার যতটা প্রকাশ না করলে নয়—তাই করব কিন্তু তাও কে অবজ্ঞা করলে, তার নাম আমি প্রকাশ করব না। প্রকাশ করব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাব কাছে কত ভালোবাসা পেয়েছি। কে কতখানি এগিযে দিয়েছেন। আব প্রকাশ কবব যে-কালেব মধ্যে আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেলাম সেই কালে সাহিত্যের কি কি রূপান্তর ঘটল তাই।

আমার সাহিত্য-জীবনেব শুরু কোনখান থেকে করব সে নিয়ে আমার মনে কোন অস্পষ্টতা নেই। এই শুরুটি জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবেই ঘটেছিল।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখানা থেকে বেব হলাম সেই দিনই মনে মনে এ সংকল্প করেছিলাম। জেলখানাতেই তখন 'চৈতালী ঘূর্ণি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুখানি পত্তন কবেছি; এবং তখন জেলখানায় রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি; চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ, হিন্দুসংস্কৃতির পথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি। কোন মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পথে অগ্রসর হতে মন রাজী হল না। আত্মাই যদি কলুষিত হয় তবে স্বাধীনতার মধ্যে কি পাব আমি? বন্ধনমুক্ত জীবনে কোন আত্মার বিকাশ হবে—প্রকাশ হবে? সব থেকে পীড়িত হলাম আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র! মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল

ভাঙিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও সম্মুখে মন্ত্রিত্বের গদি ছিল না, ছিল জেলা কংগ্রেসের চৌকি। অ্যাসেম্ব্লির চেয়ার তখনও অনেক দূরে, শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ মাত্র সম্মুখে।

সেদিন যা দেখেছিলাম ভুল দেখি নি। ঠিকই দেখেছিলাম। ১৯৩২।৩৩ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে সে কদর্য দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য শ্রীযুক্ত আনে এসেছিলেন কলকাতায়। মীমাংসা হয় নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সে দ্বন্দ্ব ভাঙনে পরিণত হল। তার জের আজও চলেছে, চলেইছে। ইংরেজ চলে গিয়েছে: আজ সে কদর্যতা নখর-দন্ত প্রকাশ করে যুধ্যমান। দক্ষিণপন্থী বামপন্থী; দক্ষিণপন্থীর মধ্যে একশ দল; বামপন্থীর মধ্যে হাজার দল। নিত্য প্রভাতে সংবাদপত্রে প্রচারিত পরস্পরের নিন্দাজনক বিবৃতি পড়ি আর সেদিনের সংকল্পকে প্রণতি জানাই। কিন্তু দেশের মুক্তিযজ্ঞের সাধকদের মনে যজ্ঞশেষে চরুলোভ যে সিদ্ধির আত্মপ্রসাদের পরিবর্তে এমন কুৎসিত গ্রাস প্রকাশ করবে, তা ভাবি নি। অবশ্য এখানে একটি কথা না বললে আমাকে পাপ স্পর্শ করবে তাই এ প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে সেই কথা বলব। সত্যকারের মুক্তিসাধক আজও আছেন, তাঁদের অনেককে জানি—চিনি। অনেককে জানি না। তাঁদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলি, অরণ্যের অন্ধকারে কুটিল-জান্তব কোলাহলের মধ্যে তোমাদের প্রশান্ত কণ্ঠের আশ্বাসই যে আজ আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা!

১৯৩০ সালে ডিসেম্বরে জেল থেকে বের হবার আগে রাত্রে জেলখানায় বিদায় অভিনন্দন-সভা বসল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিদায়-সভায় চিরাচরিত ভাবে বক্তৃতা হল। বক্তারা বললেন, পুনরাগমনায় চ! শীঘ্র আবার ফিরে এস।

আমি সেই সভাতেই আমার সংকল্পের কথা ঘোষণা করেই বললাম। বলা বাহুল্য ধিক্কৃতও হলাম। ধিক্কার দিলেন না শুধু শরৎবাবু। তিনি স্মিত মুখেই বললেন, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

সুতরাং এইখান থেকেই আমার সত্যিকারের সাহিত্য-জীবন শুরু।

তবুও এর পূর্বের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবন এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এবং তার প্রভাব এমন ভাবে আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে যে, সে ঘটনাকয়টি প্রকাশ না করলে আমার সাহিত্য-জীবনের গতি-প্রকৃতি সঠিক ব্যাখ্যাত হবে না।

সাহিত্যের হাতে-খড়ি নিয়েছিলাম কবিতায়। সবাই নিয়ে থাকে। বাংলা তেরশো বত্রিশ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল—সে সম্মেলনে মূল অধিবেশনে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে কবিতা পাঠ করলাম। সম্মেলনশেষে লাভপুর ফিরলাম, সঙ্গে দুজন প্রতিনিধি এলেন। তাঁদের নিয়ে গেলাম চণ্ডীদাস নান্নুর। আমদপুর থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ছোট লাইনের উপর লাভপুর এবং কীর্ণাহার স্টেশন, কীর্ণাহার থেকে নান্নুর ছ-মাইল পথ। যানবাহনের মধ্যে একমাত্র গোরুর গাড়ি পাওয়া যায়। সঙ্গীরা গোরুর গাড়ি পছন্দ করলেন না; পদব্রজেই রওনা হলাম। কিন্তু বৈশাখের রৌদ্রে কষ্ট হল খুব। অন্তত তাঁদের হয়েছিল। আমার পথ হাঁটা অভ্যাস তখন খুব। ফেরার পথে দুর্বিপাক ঘটল, ট্রেন ফেল হল,—ফলে কীর্ণাহার থেকে লাভপুর পর্যন্তও পদব্রজে ফিরতে হল। মোটমাট একুশ-বাইশ মাইল পথ। যাই হোক সঙ্গীদের ফুটবাথ দিয়ে—খাইয়ে-দাইয়ে রাত্রের ট্রেনে রওনা করে দিয়ে সেই ক্লান্ত দেহ মন নিয়েই 'নান্নুর পথে' বলে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটির ছন্দের মধ্যে ক্লান্ত মনের একটি সুন্দর সুর ধরা পড়েছিল।

কতদূর কতদূর, মধুগীতি ভরপুর
পীরিতি-সায়র-তীরে মধুব নান্নুর।

এই কবিতাটি ভারতবর্ষে প্রকাশিতও হল। জলধর সেন মহাশয় লিখলেন, 'এমনি মিষ্টি ছোট কবিতা মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ো।' কিন্তু তবুও কবিতার পথে মন যেতে চাইল না। তখন আমাদের গ্রামে নাটকের রচনার ঢেউ উঠেছে। স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার হিসাবে বাংলা দেশে খ্যাতিলাভ করেছেন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হয়েছে। সে-সব নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হত আমাদের গ্রামের রঙ্গমঞ্চে। গ্রামে মস্ত পাকা নাটমঞ্চ, সামনে টিনে ঢাকা বিস্তৃত একটি দর্শক বসবার আসর। এমন কি

বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাটক লেখেন, শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাটক লেখেন। হরি স্বর্ণকার—নাট্য সম্প্রদায়ের দূত-প্রহরীর ভূমিকায় অভিনয় করে, ঘরে সোনা-রুপার গয়না গড়ে—সেও একখানা প্রহসন লিখে বসল। গোরু-মানুষ। প্রচলিত গল্পকে সে প্রহসন আকারে লিখেছে। সে প্রহসনও আবার চুরি হল; চুরি করলে এক ব্রাহ্মণতনয়। উমা সরকার ওরফে সাঁওতাল সরকার সেই প্রহসন নিজের নাম চালাবার চেষ্টা করলে; হরি স্বর্ণকার সেই নিয়ে মামলা করলে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডে। মামলা দায়ের করলে, কি কববার আয়োজন করলে ঠিক মনে নেই; তবে মামলা উঠল না, তার আগেই মিটমাট হয়ে গেল। উমা সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করে তার দাবি প্রত্যাহার করলে। এমনই আবহাওয়ার মধ্যে আমার মনেও নাটক রচনার জন্য আকুলতা জাগল। অনেক ভেবে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে একখানা নাটক লিখলাম। আঠারো টাকা খরচ করে **Grant Duff**এর তিনখণ্ড মারাঠাদের ইতিহাস কিনে পড়লাম। নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। নাটকখানি মঞ্চে আশ্চর্য রকম জমে গেল।

অভিনয়ের পর নির্মলশিববাবু বললেন, নাটকখানিকে ভাল নকল করে আমাকে দে, আমি কলকাতায় দেখাব। আর্ট থিয়েটারে দেব।

আর্ট থিয়েটারের তখন সমারোহের যুগ। কর্ণার্জুন থেকে মগের মুলুক পর্যন্ত অপরেশবাবুর নাটক একটার পর একটা হৈ-হৈ করে চলেছে। কলকাতার প্রবেশমুখে শ্রীরাপুরের স্টেশনের দেওয়াল থেকে ওদিক বোধ হয় রানাঘাটের দেওয়াল পর্যন্ত রঙীন প্রাচীর-বিজ্ঞাপনীর ছটায় ঝলমল করে। গোটা কলকাতায় পথের দু পাশের দেওয়াল নাট্যকারের এবং নাটকের নামের যেন নামাবলী গায়ে জড়িয়ে থাকে। অভিনয় হয়, দর্শকে করতালি দেয়, মনে হয় অভিনন্দন জানাচ্ছে নাট্যকারকে। নাটকের মত অন্য কোন রচনা বোধ হয় রচয়িতাকে এমন নগদ বিদায় দেয় না। সুতরাং নির্মলশিববাবুর কথায় আমার চোখে সেদিন রঙীন স্বপ্ন নেমে এল। স্বপ্ন দেখলাম। অনেক স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম। রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকার। অনেক—অনেক—অনেক।

মহাকবি কালিদাস নিজে বামন ছিলেন না কিন্তু বামনেরও যে চাঁদ ধরতে সাধ হয় এবং লোকে উপহাস করলেও ওটা যে মনুষ্যস্বভাবের কোন আত্মবিস্মৃত মুহূর্তেব ধর্ম এটা তিনি বুঝেছিলেন তাই নিজে বামন অর্থাৎ ব্যর্থ কবির দলের বেদনার ভাগ নিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে রঘুবংশের ভূমিকা রচনা কবেছিলেন। স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক, আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু উপহসিত হলাম। সেটা আমি আকাবে খাটো বলে নয়, সাধারণ নাটমঞ্চ কৌশলীব হাতেব ক্রেনেব টানে নাগালেব বাইরে চলে গেল বলে। নির্মলশিব বাবু তখন নাট্যকাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন—তার উপর তিনি ছিলেন বসিক মানুষ, সর্বোপবি কাঞ্চন-কৌলীন্যে নিকষ কুলীন। খ্যাতি অপেক্ষাও খাতিবটা ছিল ওজনে অনেক ভারী। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার তাঁব অন্তবঙ্গ বন্ধু। নির্মলশিববাবু তখন সিউড়ীতে রাজপুরুষদের বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, নিজে আর নাটক লেখার সময় পান না, বোধ করি সেই কারণেই অধ্যক্ষ বন্ধু বলেন—কই মশাই—নাটক-টাটক কিছু এনেছেন? দিন, মশাই—এক-আধখানা নাটক দিন। নইলে আর পারছি না, একা আর কত কবব? সেই আশ্বাসেই নির্মলশিববাবু কলকাতায় এসে তাঁর হাতে নাটকখানি দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন। নাটক ভালো হয়েছে। আমি পড়েছি, অভিনয় করেছি—খুব জমেছিল।

—আপনি পড়েছেন মানে? আপনাব নাটক নয়? অধ্যক্ষ নিজের হাত দুখানি পিছনের দিকে নিয়ে মুঠি বেঁধে একটু ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমার সময় কোথায়। নাটকখানি ভাগ্নী জামাইয়ের লেখা। তাবে তো দেখেছেন আপনি।

—হ্যা। বসুন। তামাক খান। তারপর আর সংবাদ কি বলুন?

নাটকের বাঁধানো খাতাখানি হাতে নিয়েই নির্মলশিববাবু আর আর সংবাদ বললেন। ভাবলেন—বিদায়ের সময় হাতে তুলে দেবেন।

বিদায়ের সময় অধ্যক্ষ বললেন—ও আমি নেব না মশাই। জানেন তো—নাটক চুরি নিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার নাট্যকারদের বদনাম আছে অনেক।

হেসে নির্মলশিববাবু বললেন—পড়ে দেখুন, ভালো লাগবে। খুব জমবে আমি জোর করে বলতে পারি।

—না মশাই। মাফ করবেন আমাকে। তা ছাড়া ডিরেক্টরদের হুকুম ছাড়া নাটক আমি নিতে পারব না।

নির্মলশিববাবু আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু। আমার প্রতি ছিল অগাধ স্নেহ। তিনি এতেও দমিত হলেন না। ডিরেক্টরেরাও তো তাঁর অপরিচিত নন! অনেকেই তাঁর বন্ধু। পরের দিন তিনি বইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। হরিদাসবাবু সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন পড়ে···বাবু। নির্মলশিববাবু বলছেন ভালো নাটক। দেখুন! আপনার পছন্দ হলে আমি পড়ে দেখব।

হরিদাসবাবুর নাটক বোধ প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র মৈত্রের মানময়ী গার্ল্স স্কুল—নাটক নির্বাচনে তিনি সে পরিচয় দিয়েছেন। শনিবারের চিঠিতে নাটকখানি পড়ে তিনিই সেখানিকে নির্বাচিত করেছিলেন। মঞ্চে তখন নাটকের দারুণ অভাব। এবং অধ্যক্ষ নাট্যকার রোগে শয্যাশায়ী অক্ষম। তাই তাঁকেই সেদিন নাটকের খোঁজে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখলেন। জেলার কর্তার কাছে কোন দরখাস্ত পাঠালে—সে দরখাস্ত তিনি যেমন নিয়মমাফিক তদন্ত ও মতামতের জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন, ঠিক তেমনি ভাবেই অধ্যক্ষের হাতে দিয়ে তাঁর মতামতের প্রতীক্ষায় রইলেন। নইলে তিনিই যদি পড়তেন তবে কি হত বলতে পারি না। কারণ অনেক কাল পরে—এই কিছুদিন আগেও কোন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ ওই নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলেন; তাঁদেরও পছন্দ হয়েছিল। আমিই দিই নি। থাক—সে পরের কথা। সেই ঘটনার কথাই বলি।

এবার অধ্যক্ষ মশায় নাটকখানি হাতে নিলেন। মজলিসের রসালাপের মধ্যে এক সময় একান্তে নির্মলশিববাবুকে বললেন—একটু অপেক্ষা করে যাবেন।

মজলিশ ভাঙল। সকলে নামলেন। অধ্যক্ষ এবং নির্মলশিববাবু রইলেন। সিঁড়ির উপরের পাদুকাধ্বনি ক্রমশ মোটরের স্টার্ট নেওয়ার শব্দের মধ্যে

সঙ্গতের তেহাই শব্দে সঙ্গীত শেষ ঘোষণার মতই ঘোষণা করলে—তাঁরা চলে গেছেন। অধ্যক্ষ খাতাখানি নির্মলশিববাবুব হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—অনুগ্রহ করে এখানি নিয়ে যান। নাট্যকারকে ফিরিযে দেবেন।

—পড়বেন না?

—না। এবার গম্ভীর ভাবে অধ্যক্ষ বললেন—দেখুন নির্মলবাবু, আপনি বন্ধু লোক, আপনি আগেই নাট্যকার হিসেবে মঞ্চে পাসপোর্টও পেযেছেন, আপনার নিজের নাটক যদি থাকে আম্বুন, আনন্দেব সঙ্গে নেব, অভিনয়ও হবে। কিন্তু দোহাই! বন্ধু আত্মীয এদেব এনে ঢোকাবাব চেষ্টা করবেন না। আজকেব স্ফুচ কাল ফাল হযে ভুমি বিদীর্ণ কবে বেব হলে—আমাদের পস্তাতে হবে। আপনি বড়লোক, নাটক লেখা আপনাব নেশা—আমাদের এটা পেশা। এগানে সহজে তো শরিক ঢুকতে দেব না! বঙ্গমঞ্চের চৌঘুড়ীব রাশ ধবে সারথ্য করা অভ্যাস, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন দিন ভুলেব জন্য সারথ্য-কর্মচ্যুত হলে অশ্বের জন্য তৃণ কর্তন ছাড়া আর গতি থাকবে না। সে ভুলের ত্রিসীমায় পা বাড়াই না আমি।

নির্মলশিববাবু নত মস্তকেই খাতাখানি ফিরে নিযেছিলেন।

নত মস্তকেই আমাকেও ফিরে দিয়েছিলেন। আমিও কলকাতায় এসে-ছিলাম। কংগ্রেসের একটা কাজ ছিল—সেটাকে লক্ষ্য ঘোষণা করেই এসেছিলাম কিন্তু আসলে ওটা ছিল উপলক্ষ্য—লক্ষ্য আসলে ছিল—ওই নাটক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা। কলকাতায় এসে উঠেও ছিলাম নিঃ লশিববাবুদেরই বাসায়। দেশে মস্ত জমিদারি থাকলেও—তাঁদের মূল ব্যবসা কলকাতায়—কয়লার ব্যবসায়। মস্ত আপিস—প্রকাণ্ড বাসা। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। অপরাহ্নে নির্মলশিববাবু থিয়েটারের মজলিশে যান—ফেরেন সাড়ে দশটা এগাবোটা কোনদিন বা একটায়। আমি জেগেই থাকি, যদি ডাকেন—তৎক্ষণাৎ গিয়ে দাঁড়াব। সুসংবাদ শুনব। সেদিন এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর চলে গেলেন। তাঁর হাতে খাতাখানা আমার তীক্ষ্ণ উৎসুক চক্ষুর দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু উঠে গিয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা বোধ করলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার ফিরে এলেন। তিনিও থাকতে পারেন নি। বেদনা তিনিও পেয়েছিলেন, যথেষ্টই

পেয়েছিলেন। আমায় ডাকলেন। আমি উঠে এলাম। নীরবে তিনি খাতাখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আমি খাতাখানি নিলাম, একবার অকারণে পাতাগুলির কয়েকখানা উলটে বললাম—হল না?

—না।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি চলে গেলেন। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। আবার তিনি ফিরে এলেন। মনে হল কিছু বলতে চাচ্ছেন—বলতে পারছেন না।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—কী খারাপ হয়েছে বললেন?

—ভালো-খারাপের কথাই নাই তারাশঙ্কর, বইখানা না পড়েই ফিবিয়ে দিয়েছেন।

—না-পড়েই?

—হ্যাঁ।

তিনি আবেগভরেই সমস্ত কথা আমাকে বলে গেলেন। বললেন—তবে তুই যেন ছাড়িস নে। কতকাল আটকে রাখবে?

ভেঙে গেল নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন।

পরদিনই কংগ্রেস-সংক্রান্ত কাজ শেষ করে সন্ধ্যার গাড়িতে চলে গেলাম। বাড়ি ফিরে খাতাখানি উনানে গুঁজে দিলাম। ভাবাবেগে বিচলিত হয়েছিলাম, নইলে মনে হওয়া উচিত ছিল যে, ঐ খাতাখানিই আমাব হাস্যকর উদ্বাহু মূর্তির একমাত্র চিত্র নয়, ওই খাতারই আরও নকল আছে। দেশের মঞ্চে অভিনয় হয়েছে, সেখানে আছে, বাড়িতেও আছে, মূল খাতাখানিই আছে। সে রয়ে গেল ভাবীকালে আমার ভাগ্যে আরও একবার মসীলেপনের জন্য। থাক, সে কথা যথাস্থানে হবে।

এই ঘটনাটি আমার জীবনে সাহিত্যসাধনায় একটি ধারা-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সেদিন যদি এই ঘটনাটি না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হত, এমন কি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে দেখার ছল করেও দু-দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার সঙ্গে 'হল না' কথাটা বলতেন তা হলে নাটক লেখা ছাড়তাম না। নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়তো আমার পরিচয় হত। কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম। কী লিখব? কিছুই লিখব না। স্থির করলাম কিছুই লিখব না।

লিখলাম না কিছুই কয়েকমাস।

কংগ্রেসের কাজ রয়েছে, সমাজ সেবক সমিতির সেবাধর্ম রয়েছে, বাড়িতে অভাব-অভিযোগের মধ্যেও ক্ষেতের ধান-চাল রয়েছে, এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ানো রয়েছে—এর মধ্যে একটি ধোকার টাটি তৈরী করা এমন শক্ত কি?

হঠাৎ আবার ঘটল একটা ঘটনা।

নির্মলশিববাবুর বড় ছেলে সত্যনারায়ণ—সে নিজে লেখে না কিন্তু সাহিত্যে তার খুব শখ। কালটা যদি পুরাকাল হত আর সত্যনারায়ণ যদি রাজপুত্র হত তবে সে সত্যাদিত্য নামে সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলে বিখ্যাত হত এ নিশ্চয় বলতে পারি। সে হঠাৎ এল, মাসিক পত্রিকা বের করবে। এবং আমাকে হতে হবে সহকারী সম্পাদক। সম্পাদক নির্মলশিববাবু। অবশ্যই উৎসাহিত হলাম। ভুলে গেলাম লিখব না সংকল্পের কথা। রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় লিখেছেন সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়। অর্থাৎ কামড় দিলে সহজে সে কামড় ছাড়ে না। সেটা অবশ্য সাহিত্যিক এবং পাঠক সম্পর্কে লিখেছেন। লেখা শোনাবার লোক পেলে সাহিত্যিক সহজে তাকে ছাড়ে না, ক্ষিদে পেলে খাইয়েও লেখা শোনায়, ঘুম পেলে খুঁচে ঘুম ভাঙিয়েও শোনায়। মশা কামড়ালে মশারি খাটিয়ে তার মধ্যে বসিয়েও লেখা শোনানো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আছে, আমাকেই শুনতে হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি

সাহিত্যসেবার নেশার কথা। এটিও ওই কচ্ছপের কামড়। তফাত এই যে, মধ্যে মধ্যে ব্যর্থতার ধাক্কার মেঘ গর্জনে ছেড়ে দেয়, এবং আবার কিছুদিন পরেই জলাশয়ের ধারে গেলেই সাহিত্য-কূর্ম তেড়ে এসে দ্বিগুণ জোরে কামড়ে ধরে। আমারও তাই হল। সত্যনারায়ণের খনিত সাহিত্য-সরোবরে সেদিন যেমন নেমেছি অমনি কামড় খেলাম। ধরলেন সাহিত্য-কূর্ম। শ্রোতা এ কামড়ে বেদনা অনুভব করে—কিন্তু সাহিত্যিককে সাহিত্য-কামড়ে ধরলে ঠিক তার উলটো হয়, সে বেশ পুলক অনুভব করে। বাতের ব্যথায় রক্ত মোক্ষণের মত একটা আরাম হয় তার। ফলে এবার লিখতে লাগলাম দু হাতে। কবিতা গল্প সমালোচনা সম্পাদকীয় অনেক লিখে যাই। কাগজখানির নাম ছিল 'পূর্ণিমা'। আমিই প্রায় রাহুর মত গিলে ফেলতাম তার অর্ধেকটা, কিন্তু একটা কী যেন খচ-খচ করত তবু মন ভরত না। যে সব লেখা পূর্ণিমার কর্তৃপক্ষের ভালো লাগত সে সব আমার ভালো লাগত না।

ঠিক এই সময়ে একদিন—সিউড়ীতেই হবে, এক উকিলের বাড়িতে উঠেছি কংগ্রেসেরই কাজে। উকিলবাই তখন কংগ্রেসের পাণ্ডা। বীরভূমে শরৎবাবুই ছিলেন কংগ্রেসের প্রাণ। সভাপতি। কিন্তু প্রাণ আর মস্তিষ্ক দুটো স্বতন্ত্র বস্তু। মস্তিষ্কের বাড়িতে রাত্রে থাকতে হল। রাত্রে ঘুম আসে না। হয় গরম নয় শীত, দুটোর একটা হেতু বটে। তার উপর ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সিউড়ীতে মশকের উপদ্রবের অবস্থাটা অন্ধের দিবারাত্রির মত, ওর আর শীত-গ্রীষ্ম নাই। জেগে বসে বিড়ি খাই আর গুনগুন করে গান গাই। এমনই অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!

তার আগে পূর্ণিমায় আমি একটি 'স্রোতের কুটো' বলে গল্প লিখেছি। গল্পটি আমার বিচারে ভালোই হয়েছে কিন্তু পূর্ণিমার বিচারে ভালো হয় নি। তবু বেরিয়েছিল; জঠর পূর্তি করতে খাদ্যেরই যেখানে অভাব সেখানে ভালো খাদ্যের কড়াকড়ি তো খাটে না। বুনো ওল থেকে মেটে আলু যা হোক হলেই চলে। সেদিন রাত্রে দেখলাম ওই লেখাগুলির সঙ্গে আমার স্রোতের কুটোর ঢং-এর বেশ মিল আছে। তবু একটা কথা মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত,—পরাভূত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি ঐ আবেগের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তার স্বাভাবিক ধর্ম, তারও অভাব রয়েছে বলে মনে হল। জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।

দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরই মহলে। যেখানে বাসা হল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিক জনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ! বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। আমি পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরই ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে মাজা রেকাবিতে দু-খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোট-এলাচ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে—বললে, প্রভুর জয় হোক।

উঠবার সময় মাথার কাপড় একটু সরে গেল। রাখাল-চূড়া-বাঁধা কেশ প্রসাধন চোখে পড়ল। আবার ঘোমটাটি তুলে দিয়ে সে খুঁটিয়ে আমার বাড়ির কুশলবার্তা নিলে। সে যেন পরমাত্মীয়।

কী একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়েছি—কানে এল—আমাদের গোমস্তা বলছে—পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্ট।

মনে হল—বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। উঁকি মারলাম। দেখলাম—না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু!

এই তো! এই তো সেই জীবনের জয়।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্ম ফুলের মত।

এর পরই এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে—ক্ষ্যাপা। সঙ্গে তার বলাই মোড়ল।

ক্ষ্যাপা ফাঁক পাবা মাত্র গিয়ে উঠল কমলিনীর আখড়ার।

পুলিন ওখানেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকে। সেদিন রাত্রে শুনেই শুনলাম—কমলিনী বলছে পুলিনকে—যাও—বাড়ি যাও।

—কেন?

—রাগ করবে যে।

—কে?

—কে আবার? তোমার বষ্টুমী। বলেই সে হেসে ছড়া কেটে উঠল—পাঁচসিকের বষ্টুমী তোমার গোসা করেছে—হে গোসা করেছে।

আমার ঘুম ছুটে গেল। দোয়াত কলম খাতা নিয়ে বসে গেলাম। পেয়েছি। 'রসকলি'র পত্তন করলাম।

গ্রামে ঢুকতেই ছোট নদীর ধারে একটা বটগাছ দেখেছিলাম; বিচিত্র বটগাছটা। তার শিকড়গুলোর তলায় মাটি ধুয়ে গিয়েছে; বড় অজগরের মত এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আছে শিকড়টা। মনে হয় একটা বড় সাপ গর্তে মুখ ঢুকিয়ে দেহটায় রোদ-বাতাস নিচ্ছে। সেটা মনে পড়ে গেল। সেখান থেকেই শুরু করলাম।

গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল।

শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্প লেখার ওইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয় কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী—তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন—আর মন্ত্রই বলুন—এটা কারুর কাছ থেকে শিখেছেন কিনা—অথবা শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কিনা। তবে আমার মনে হয়—ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন করে জানি না—শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে—ফুটে ওঠে। এইটুকুর জোরেই আমি যতটুকু পেরেছি—সেটুকু সম্ভবপর হয়েছে। এই কারণেই আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায়—রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হই নি। সে শক্তি বোধ হয় আমার নেই এবং সে চর্চা করার ঝোঁকও আমার জাগে নি। নইলে অনুকরণ করে একটা ভাষা তৈরী করা খুব কঠিন নয়; বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার যে আধুনিক ঢংটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষার অক্ষম অনুকরণ। ক্ষেত্র-বিশেষে ফরসা বাঙালী মেয়ের মুখের লিপস্টিক রুজ প্রসাধনের মত ঝকঝকে হয়ে ওঠে বটে কিন্তু তাতেও তার মেকি ফিরিঙ্গীয়ানা ঢাকা পড়ে না। আমি আমার দেশের মানুষকে যতদূর জানি এবং আমি নিজেও সেই মানুষদেরই একজন বলে—বেশ একটু খুঁতখুতে-চিত্ত। সেই কারণেই বর্ণসাঙ্কর্যকে পছন্দ করি না। আত্মাকে খর্ব করে যেখানে দেহ-পরিতোষ বা পরিচর্যা বড় হয়ে ওঠে সেখানে ভিতরটা হয় খাটো, বাহিরটাই হয় বড়। বাহার বড় হলে সে হয় বিলাসিনী, তাকে নিয়ে প্রমোদ-রসের রঙীন ফানুস উড়িয়ে উল্লাস করা চলে কিন্তু তাকে নিয়ে অন্তরের দুঃখের কথা বলা চলে না, গভীর সুখের কথাও না। রাসবিলাসের তৃপ্তিসাধন আর অন্তরের তৃষ্ণা মেটানো—দুটো সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র কথা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য—তাঁর নিজের রূপ এবং আত্মার

মতই ষড়ৈশ্বর্যশালী। রসলালিত্য ও বৈচিত্র্যে সে যত ললিত এবং বিচিত্র, ভাবগভীরতায় আত্মিক ধ্যানে সে তত গভীর এবং তন্ময়। নিজের পুঁজি বুঝেই আমি তাকে অনুকরণ করি নি।

থাক ও কথা এইখানে!

আমার কথায় ফিরি। নূতন গল্পটি লিখে মনে হল, আমি, আমার মনে যে মানুষগুলি আছে তাদের বাইরে এনে জীবন্ময় করে জীবনের হাটে মুক্তি দেবার সোনার কাঠি পেয়েছি।

গল্পটি লিখে তার নাম দিলাম 'রসকলি'। আমাদের পূর্ণিমা তখনো চলছে। কিন্তু আগের গল্প 'স্রোতের কুটো' সম্পর্কে মন্তব্যের কথা স্মরণ করে এবং মন্দ কবির স্বভাবগত যশোলিপ্সার প্রেরণায় ওটিকে পূর্ণিমায় না দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম —বাংলাদেশের একখানি বিখ্যাত পত্রিকায়। ডাক-টিকিট অবশ্যই দিলাম। এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে দিন গণনা করতে লাগলাম। দিন পনের পর একখানি রিপ্লাই কার্ড লিখলাম। পনের দিন পর দু-ছত্রে জবাব এল—গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

আবার মাসখানেক পর আর-একখানা রিপ্লাই কার্ড লিখলাম।

জবাব এল। সেই দুছত্রের জবাব, সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

আবার লিখলাম চিঠি। আবার সেই এক জবাব। এক সই।

বোধ হয় সাত-মাস কি আট-মাস চলে গেল। মোটমাট—আট থেকে দশখানি রিপ্লাই-কার্ড আমি অক্লান্ত ভাবে লিখে গেলাম। তাঁরাও সেই একই জবাব দিলেন। আট-মাস পর আমি আবার এলাম কলকাতায়; কাজ দু-চারটে ছোটখাটো, তার মধ্যে ওটাও একটা। এবার স্বয়ং গিয়ে আপিসে হাজির হলাম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম—আমার একটা গল্প—

—দিয়ে যান—ওখানে।

—না। অনেক আগে পাঠিয়েছি।

—পাঠিয়েছেন? কি নাম আপনার? গল্পের কি নাম?

বললাম নিজের নাম, গল্পের নাম। তাঁরা একখানা খাতা খুলে দেখেশুনে বললেন—ওটা এখনও দেখা হয় নি। দেখা হয় নি? বিবেচনাধীন থাকার এই

অর্থ? আমার ধারণা হয়েছিল—পড়ে দেখা হয়েছে—হয়ত কিছুটা ভালো লেগেছে—কিছুটা লাগে নি, সেইজন্য বিবেচনা করছেন—দেওয়া যায় কি না যায়। তা ছাড়া গল্পটি নিছক প্রেমের গল্প; পত্রিকাটির রুচি সম্পর্কে কড়াকড়ির একটা খ্যাতিও আছে; কটন-ইস্কুলের মত গল্পটিকে সায়েস্তা করে নেওয়ার বিবেচনাও এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। গল্প যে প্রকাশযোগ্য সে বিশ্বাস আমার ছিলই।

আজ এই উত্তরে মনে একটা ক্ষোভ জেগে উঠল। নূতন লেখক বলে তাঁরা গল্পটা পড়েও দেখেন নি? মনে পড়ে গেল মারাঠা তর্পণের লাঞ্ছনার কথা। ভাবলাম, সাহিত্যসাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে—গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরে যাব এবং শান্ত গৃহস্থের মত জীবনটা ধানচালের হিসাব করে কাটিয়ে দেব। আর বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্য দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।

বললাম, দয়া করে আমার গল্পটা ফেরত দিন।

—নিয়ে যান। দেখে দিন মশাই—।

অন্য একজন দেখেশুনে লেখাটা ফেরত দিলেন। আমি লেখাটা হাতে করে মধ্য কলিকাতা থেকে দক্ষিণ কলিকাতা পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। চোখে বার কয়েক সেদিন জল এসেছিল। ভাগ্যকে তখন মানতাম, ভাগ্যকেই সেদিন বার বার ধিক্কার দিলাম। বাড়ি চলে গেলাম সেই রাত্রেই। গঙ্গাস্নান আর করা হল না।

(৪)

জলাঞ্জলি দেবার সঙ্কল্পটিকে কাজে পরিণত করবার জন্য কর্মজীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ধানচালের হিসাবের কাজ নয়; ওতে মনই উঠল না। কাজ, দেশসেবার কাজ। কংগ্রেসের আদর্শে খানিকটা গঠনমূলক কাজ হলেও কংগ্রেসের কাজ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলাম। কিছু কাজ আমার চাই। চরকা কাটি বটে কিন্তু ওতে সমস্ত দিনটা কাটে না। আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের অবস্থা তখন বিশৃঙ্খল। ওই কাজই ঘাড়ে তুলে নিলাম। একটা বাই-ইলেকশনে মেম্বর হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেণ্ট হলাম। আমার মনের অবস্থা বুঝবার জন্যেই

ঐ কথা এখানে উল্লেখ করছি। সকালে বাইসিকল নিয়ে বের হই—গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ-ঘাট নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই, আঁকা-বাকা নালাকে সোজা করে কাটাই; ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি। বাড়ি ফিরি দুটো আড়াইটের সময়। তারপর স্নান-আহার। বিকেলে বোর্ড আপিসে খাতাপত্র দেখা, মজুরদের মজুরি দেওয়া নিয়ে কেটে যায়। দেখতে দেখতে কাজটা বড় ভালো লাগল। ভুললাম যেন মনোবেদনা। ভাবলাম এই পথেই চালিয়ে দেব জীবন। প্রশংসা তো পেলামই—মনও কর্মের তৃপ্তিতে ভরে উঠল। একদিন ডান হাতখানাকে প্রায় ভেঙে ফেললাম উৎসাহের প্রাবল্যে।

একটি গ্রাম্য পথের খানিকটা অংশ নিয়ে ইউনিয়ন-বোর্ডের এক সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবারের সঙ্গে নয় বৎসর ধরে বিরোধ চলছিল। ওই অংশটার পাশে ছিল ওই চাষী ভদ্রলোকের পুকুর। তাতে রাস্তাটি সেখানে এমনই সংকীর্ণ যে, গরুর গাড়ি কোন ক্রমেই যেতে পারে না। পুকুরের ধারে একমানুষ-সমান উঁচু তালগাছের সারি দুর্ভেদ্য বেড়ার মত খাড়া হয়ে রয়েছে। বোর্ড বলে, এনক্রোচমেণ্ট। ভদ্রলোক বলেন, কিসের এনক্রোচমেণ্ট? বোর্ড হল কবে? এ রাস্তা এ-রকমই চিরকাল। শীতে গ্রীষ্মে ক্ষেতের উপর দিয়ে গাড়ি চলে। অন্য সময় গ্রামের মধ্যে গাড়ি সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলেই না।

এই নিয়ে প্রথম ওখানকার প্রেসিডেণ্ট জমিদার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় চেষ্টা করেন। সফল হন না। ভীতি প্রদর্শন করেন—তাতেও না। তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসেন—হুকুম করেন, কিন্তু তাতে চাষী ভদ্রলোক দমেন না। শেষে মামলা হয়। মামলাতে ইউনিয়ন বোর্ড হেরে যায়। বোর্ড তখন স্থির করে উপরে লিখে সরকারী জমিক্রয় বিধানে ওই অংশ কেনা হবে। কিন্তু এই সময়েই নির্মলশিববাবু হলেন পীড়িত—স্বাস্থ্যের জন্য তিনি চলে গেলেন কাশী, বোর্ডে হল বিশৃঙ্খলা, রাস্তাটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল। আমি ওখানে মজুর লাগাবার কথা বলতেই সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। মজুর উঠিয়ে দেবে। বোর্ডের অপমান হবে। সকল বিবরণ বললেন তাঁরা। আমি ভাবলাম। ভেবে বললাম, মজুর ওখানেই লাগানো হোক। দায়ী রইলাম আমি। আমার জোর, আমি

তো জানি এদেশের মানুষকে। যতদূর জানি তাতে এ-দেশের মানুষের কাছে প্রার্থনা করে নিষ্ফল হয়ে ফেরার তো কথা নয়! সংকল্প করলাম যাচাই করে দেখব। এ-দেশের মানুষকে জানার একটা অহঙ্কার ছিল।

সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত লোকেরা চাষী সজ্জনদের জানেন অনুগত জন হিসেবে; বৈষয়িক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই সে পরিচয়টা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে চাষীরা অনুগ্রহ নেন, সম্ভ্রান্তরা অনুগ্রহ করেন। সে অনুগ্রহ এদের শোধ হয় না, শোধ করতে চেষ্টাও করে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আমার পরিচয় এদের সঙ্গে ওই তিন ধারাতেই হয়েছিল। বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয়ও ছিল; দেনা-পাওনা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, কখনও বা দু-একটা মামলাও হয়েছে। কিন্তু ওদিকে আমার বা আমার অভিভাবিকা আমার মায়ের আসক্তি খুব প্রবল ছিল না বলে অল্পেই আপোস হয়ে যেত। আমাদের জিদ ছিল না বলেই ওদের জিদ বাড়ে নি। নইলে ওদের যে জিদ সে জিদ জমিদারের চেয়ে কম নয়। মামলা চালিয়ে ওরাই সর্বস্বান্ত হয়েছে বেশী। সর্বস্বান্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে যতজন হার স্বীকার করছে তাদের সংখ্যা সর্বস্বান্ত হয়েও যারা হার স্বীকার করে নি, পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে তাদের সংখ্যার চেয়ে বেশী নয়। এ পরিচয় আমি জেনেছিলাম। এ নিয়ে আমার একটি গল্প আছে 'রাজা রাণী ও প্রজা'। রাধাবল্লভ বলে একটি প্রজার সঙ্গে মামলা বাধল। সে গৃহত্যাগ করে ফিরতে লাগল, তবু সে অবনত হল না। অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে রাধাবল্লভ পেলে আমাদের বাড়িতে সস্নেহ সমাদর। সে গলে গেল। আমি যখন ঘটনাস্থলে অর্থাৎ বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম তখন এক মুহূর্তেই সব মিটে গেল।

এ ছাড়া এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক। এদের অতিথি হয়েছি, পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হয়েছি। এমনও হয়েছে, গরমের দিন, মশার উপদ্রব, সঙ্গে মশারি নাই—তাদেরও মশারির অভাব, যা আছে তাও বের করতে লজ্জা পেয়েছে—সুতরাং বিনা মশারিতেই শুয়ে মশার কামড়ে অস্থির হয়েছি—এমন সময় পাখার হাওয়া গায়ে লেগেছে। গৃহস্বামী নিজে কখন উঠে এসে বাতাস করতে শুরু করেছেন। অথচ গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট লোকে যখন

জিজ্ঞাসা করেছেন, উঠেছেন কোথায় ? বা উঠেছিলেন কোথায় ?—উত্তরে যখন গৃহস্বামীর নাম করেছি তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, উঠবার আর জায়গা পেলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি যে, এতবড় কুটিল মামলা-বাজ কুচক্রী আর দ্বিতীয় নাই এ অঞ্চলে। বলেছেন, যে অন্ন পেটে গিয়েছে সে হজম হলে হয়। গ্রাম্য ভদ্র-জনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মত আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন—ওদেরই একজনের মত।

আর-একটা সুযোগ আমার হয়েছিল।

দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা-সাহিত্যে বাউণ্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খমানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র ; কিন্তু সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারীতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মত আবির্ভূত হয়েছে ; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ঐ রকম। মদ গাঁজাটা খাই না—কিন্তু তারও চেয়ে কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪।২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছমাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয় নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রী দেবতা'-র মধ্যে আছে।

এই জোরেই, এই জানার অহঙ্কারে সেদিন আমি বলেছিলাম, মজুর ওখানেই লাগানো হোক ; দায়ী রইলাম আমি। এবং এই জোরের যাচাই করে দেখবার সাহস পেয়েছিলাম। এই জোরেই এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি, নিজের কথা বলার মত করেই বলেছি। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র মানুষদের পর্যন্ত আমার এই ভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকাল বেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার 'কবি' উপন্যাসের বনিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে। রাজা পয়েন্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ-খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাড়ায়, বলে—হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভালো আছে ? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে ?

আমি হেসে বলি—তুই কেমন আছিস ?

—আমি ? ঠোঁটে পিচ কেটে সে বলে—যম ভুলেছে, কানা হয়েছে, নইলে আর আমাকে থাকতে হয় ? তোমাদিগে রেখে আমি যেতে পারলেই খালাস।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব দেয়—কে কে চলে গেছে এর মধ্যে। তাদের জন্যে কাঁদে।

কান্নার পালা শেষ করে বলে—দেখ ক্যানে নেকনের ভোগ, পোড়া প্যাটের দায়, ওই গাঁয়ে বিয়ে ছিল, নাচতে যেয়েছিলাম। তা পুরনো কাপড় দিয়েছে দুখানা, আরও সব দিয়েছে। শ্যাষ—।

তারপরই মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে—শ্যাষ বলে কি—দাদা—! বলে রাঙা শাঁখা পরতে হবে। মরণ! এই বয়েসে আর শাঁখা পরতে হয় ?

বিদায়ের সময় বলে—এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে বেজধামকে ভুলে থেক না। ভালো হবে না। মাসে একবার করে এস।

তারপর আমি চলি। মাঠে মাঠে ঘুরি। এমনি করেই ঘুরতাম চিরকাল। রেলের লাইন ধরে নদীর ধাব। সেখান থেকে সাঁওতাল পাড়া। সাঁওতাল পাড়া থেকে মাঠে মাঠে জীবের বটতলা হয়ে কু-সতীনে ঝরনা, সেখান থেকে তারা মায়ের ডাঙা। সেখানে বসে থাকি গাছতলায়। হঠাৎ কানে এসে পৌঁছায় গানের সুর। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, নজরে পড়ে—গাছতলায় বসে কি গাছের উপর চেপে কেউ গান ধরে দিয়েছে। এইখানেই একদিন দেখেছিলাম আমার কবির নায়ককে। গাছগুলিকে মুগ্ধ রসিক শ্রোতা ধরে নিয়ে সে বাঁ হাত গালে দিয়ে—ডান হাতখানি নেড়ে নেড়ে আপন মনেই কবিগান শোনাচ্ছিল। মাঠে গান গায় চাষীরা—'চাষকে চেয়ে গোরাচাঁদ রে, মান্দেরী ভাল।' কেউ বা গায়—বিচিত্র গান—'হায় হ্যাশে কি রোগ উঠেছে ও-লা উঠা, লোক মরিছে অসম্ভব।'

বেলা বেড়ে ওঠে, বারোটা বাজে, গ্রামান্তর থেকে মাঠের পথগুলির মাথায় স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ—কাশফুল ফুটে ওঠে। ঝকঝকে মাজা ঘটি মাথায় মেয়েরা আসে দুধ নিয়ে ঘুঁটে নিয়ে।

বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে প্রশ্ন করে—কবে এলেন? বউদিদি, ছেলেরা ভালো আছে?

এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি—প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এ পাওয়া যে কী পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতা-ভাজন নয়, ভালবাসার জন। সেই দাবিতেই সেদিন যাচাই করে দেখতে সাহসী হয়েছিলাম, বলেছিলাম—দায়ী আমি।

পরের দিন সকালে গেলাম মজুর নিয়ে। তাঁর সীমানায় একটু দূরে যেখানে

কোন বিরোধ নাই সেখানে তাদের লাগিয়ে দিলাম। তারা কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল—সেই সীমানার দিকে। এদিকে বেলা চড়ে উঠল। আমি এরপর গিয়ে হাজির হলাম বৃদ্ধের বাড়িতে।—চৌধুরী-মশায়!

—কে? বৃদ্ধ তামাক টানছিলেন, হুঁকো নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়ালেন—আসুন বাবা আসুন! এই রৌদ্রে এই সময়ে এখানে কোথা গো! ওঃ ঘামে যে ভিজে গিয়েছেন গো! বসুন। জল খান, হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন। ওরে! ছেলেদের ডেকে হুকুম করলেন। নিজে একখানা পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই। একবিন্দু অমিল হল না। আমার জানায় ভুল হয় নি।

ইতিমধ্যে ছেলেরা নিয়ে এল—সরবত, কাঁকুড়, পাকা আম, গুড়, জল। একজনের হাতে আসন। বৃদ্ধ আসনখানি নিয়ে নিজে পেতে দিলেন, বললেন—বসুন বাবা। সেবা করুন।

আসনে বসে আমি বললাম—শুধু খাব না কিন্তু চৌধুরীমশায়; দক্ষিণে নেব আমি।

—দক্ষিণে? হাসলেন তিনি। ভাবলেন রসিকতা। বললেন—বেশ তো! মাথাটা চরণতলে নামিয়ে দি। নিয়ে যা হয় করুন।

আমি এবার হাত জোড় করে বললাম—আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি চৌধুরীমশায়।

বৃদ্ধ শশব্যস্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—কী বলছেন বাবা? আমার যে অপরাধ হবে। বলুন কী বলছেন?

আমি বললাম—রাস্তাটিকে রাস্তার মত করতে যতটুকু জমি প্রয়োজন সেই জমিটুকু আমাকে ভিক্ষা দিতে হবে।

তিনি একবার হেসে ফেললেন, বললেন—আপনি বাবা জাত বামুন। তা, নেন, আগে জল খেয়ে নেন। তারপর চলুন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুকুরের পাড় কাটিয়ে দিয়ে দক্ষিণান্ত করে আসি।

তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেই মানুষ-ভোর উঁচু তালগাছ কাটিয়ে জমি রাস্তার অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। তারপর বললেন—ছোটবাবুকে দিই নাই, ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেবের চোখরাঙানিকে ভয় করি নাই। মামলায় জিতেছি। কিন্তু আপনার কাছে হারলাম। তা হেরে সুখ পেলাম, মনটা ভরে গেল গো। এইবার কিন্তু আমি নোব। আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে ফিরে যাব। ওপারে আমার জমিদারির ব্যবস্থা করে দিলেন আপনি।

বৃদ্ধ পায়ের ধুলো সেদিন নিয়েছিলেন। প্রণাম আমি নিই না বৃদ্ধজনের। সেদিন না বলতে পারি নি। বৃদ্ধ চলে গেলেন। আমি উৎসাহের প্রাবল্যে নিজেই কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে গেলাম; বৃদ্ধের সীমানার এপারে একটা তেশিরের বেশ বড় গাছ জন্মেছিল—সেই গাছটা। গাছটা পড়ল, পড়ত মাথার উপরেই, কোন রকমে মাথাটা সরালাম কিন্তু ডান হাতের কব্জির উপর পড়ল একটা ডাল। হাড় ভাঙল না কিন্তু দেখতে দেখতে ফুলে উঠল—আর অসহ্য যন্ত্রণা।

মনে আছে এই বেদনার জন্য কয়েকদিন ঘরে বসে ছিলাম। যেমন বসে থাকা অমনি আবার মনের মধ্যে লেখার বাসনা জেগে উঠল। মাথার মধ্যে গল্পের কাঠামো খাড়া হল কিন্তু লেখা হল না। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কয়েকদিন পর আবার পড়লাম কাজ নিয়ে। কেটে গেল প্রায় সাত-আট মাস। হঠাৎ সাত-আট মাস পর আবার আক্রান্ত হলাম সাহিত্য-রোগে, মন্দকবির মত উদ্বাহু হলাম। সকালে ইউনিয়ন-বোর্ডে যাবার পথে একবার পোস্টাপিসে হাজরে দিয়ে যেতাম। ওটাও সাহিত্যব্যাধির জের। রিপ্লাইকার্ড লিখে ওই যে আটমাস নিত্য পোস্টাপিস যেতাম উত্তরের প্রত্যাশায় সেইটেই একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিজের পত্র কদাচিৎ থাকত, তবে বোর্ডের পত্র থাকতই —সেইগুলি নিয়ে important person-এর মত বোর্ডে চলে যেতাম। সেদিন চোখে পড়ল একটি মোড়ক। মোড়কটির উপর সুন্দর একটি ছবি। সমুদ্রের বেলাভূমে নটরাজ নৃত্য করছেন—তাঁর পায়ে আছড়ে এসে পড়ছে সমুদ্র-তরঙ্গ। তুলে নিলাম মোড়কটি। 'কল্লোলে'র ঠিকানা পেলাম। মোড়কটি এসেছিল নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। ভিতরে ছিল একটি লেখা। বুঝলাম, নিত্যনারায়ণ গল্প পাঠিয়েছিল—সেটি ফেরত এসেছে। মনে আবার জেগে উঠল বাসনা, নির্বাপিতপ্রায় বহ্নি আবার উঠল জ্বলে। কল্লোলের ঠিকানাটা টুকে

নিলাম। বোর্ড-আপিসে গিয়ে কয়েকটা কাজ সেরে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরে কলকাতা যাওয়ার সেই স্যুটকেসটা খুলে বের করলাম—রসকলির পাণ্ডুলিপি। শেষ পৃষ্ঠাটি নূতন করে লিখে পৃষ্ঠাটি পালটে দিলাম। ও পৃষ্ঠায় পোস্টাপিসের ছাপ ছিল। সন্দেহ হল—ওই ছাপ দেখে অনুমান করা কঠিন হবে না যে লেখাটি কোন কাগজ থেকে ফিরে এসেছে। সেই দিনই দিলাম পাঠিয়ে।

আশ্চর্য—দিন চারেক পরেই, পোস্টাপিসে পেলাম 'কল্লোলে'র গোল ছাপ দেওয়া সাদা পোস্টকার্ডে একখানি পত্র। লিখেছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চিঠিপত্র সবই আমার হারিয়ে গেছে। নইলে এখানে পুরো চিঠিখানি তুলে দেওয়া আমার উচিত ছিল। তবে মনে আছে, পবিত্র লিখেছিলেন—"আপনার গল্পটি মনোনীত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসেই ছাপা হইবে।" শেষের দুটি ছত্র আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। পবিত্রই আমার প্রথম উৎসাহদাতা। তিনি লিখেছিলেন —আপনি এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?

সমস্ত অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। কী বলতে চেয়েছেন? আপনার আরও আগে আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল?

'রসকলি' প্রকাশিত হল। আমি 'কল্লোলে'র গ্রাহক হলাম। এরপর দীনেশরঞ্জন লিখলেন—এখানে 'রসকলি'র যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে। বৈশাখের 'কল্লোলে'র জন্য একটি গল্প পাঠাবেন।

তখন আমি জ্বরে শয্যাশায়ী এবং হাতও তখন অপটু, ফুলে রয়েছে, বেদনাও আছে। সেই অবস্থাতেই—হাতভাঙা অবস্থায়—যে গল্পটির কাঠামো মাথায় এসেছিল—সেইটিকে কাগজে কলমে লিখে ফেললাম।—'হারানো সুর' আমার দ্বিতীয় গল্প। ১৩৩৫এর বৈশাখের 'কল্লোলে' বের হল।

এরপরই একদিন ডাকে পেলাম একখানি 'কালিকলম'। তাতে সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—রসকলি এবং হারানো সুরের মত রসসৃষ্টি অধুনা সাহিত্যে বিরল।

'কল্লোল'—'কালিকলম'—এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে। রাজনীতির পথে। সে বন্ধন, সে আকর্ষণ আমার তখনও কম দৃঢ়, কম প্রবল নয়। এই কারণেই এর পরে—মাত্র মাস ছয়েক পরেই যখন

তিরিশ সালের আন্দোলনের বাজনা বেজে উঠল তখন—কলম ছেড়ে তাতেই পড়লাম ঝাঁপিয়ে।

মোহ কাটল—জেলখানায়।

(৫)

জেলখানায় মোহ কাটল ১৯৩১ সালের সূচনায়।

'রসকলি' 'হারানো সুর' প্রকাশিত হয়েছিল—১৯২৯ সালে, বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনে এবং ১৩৩৫ সালের বৈশাখে। সুতরাং মধ্যে রয়ে গেল প্রায় দুটো বছর। এই কিছু কম দুটো বছর আমার মনের অবস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগটাই ছিল প্রবল। এক সময় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান। সে বহ্নি ছিল পরম পবিত্র। কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর ১৫।১৬ সালে তিনি যখন অন্ধনিয়তিকে বন্য ঘোড়ার মত বেঁধে তার পিঠে সওয়ার হয়ে নিরুদ্দেশ—তখন হঠাৎ আমার বোনের বিবাহ উপলক্ষ করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ও দিকে বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্যোগ নেমে এল। দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম। আমাকে কিছু দিন ধরেই পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কাটাতে হল। তার পর এল উনিশ শো একুশ। একটা যুগান্তর ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে। আমার জীবনক্ষেত্রেও এল। আমি দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাইনি। কাজেই আমার জীবনে দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না। দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল। কোন্ সমিধে যজ্ঞ বিধেয়—যজ্ঞডুমুরে অথবা অশ্বত্থকাষ্ঠে—এ নিয়ে শাস্ত্রবিধান তখনও আমার বড় হয়ে উঠতে পায় নি। যজ্ঞ-বহ্নিই ছিল বড়, তাতে আত্মাহুতিই একমাত্র বিধি ছিল আমার কাছে। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার

কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবল ভাবে। যা ঘটে নাই—সকলে যা ঘটতে পারে না বলে ভাবে—তাই ঘটবে—সেই আকাশকুসুম ফোটানোর উন্মাদনাই বড় ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই আমার জীবনে সাহিত্যের দিক থেকে ওই আবেগ আমাকে আকর্ষণ তখন বেশী করত। আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল—সেটা হল মানব জীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা। মধ্যে মধ্যে দেশের রাজনৈতিক জীবনের স্তিমিত দশায় সাহিত্য করত আকর্ষণ। ১৯২৯ সালে তখন দেশের রাজনৈতিক জীবনের ধূমায়মান অবস্থা। মনে হচ্ছে জ্বলবে, আবার জ্বলবে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহ্নিমান হয়ে উঠবে। তবুও এই সাহিত্যিক সাফল্যের মূল্য সেদিন অনেক এবং আমার জীবনে অমূল্য। বুঝতে পারি নি—অদৃষ্ট বা ভাগ্যদেবতা যদি থাকেন—তবে সেইদিনই ওই মূল্যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাওনা নির্ধারণ করেছিলেন। থাক, সে পরের কথা।

'হারানো সুরে'র পর নানা নূতন পত্রিকা থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম। 'কালিকলম,' 'উপাসনা,' 'ধূপছায়া'—আরও অনেকগুলি। গল্পও পর পর কয়েকটি লিখলাম। 'কল্লোলে' একটি কবিতাও লিখেছিলাম। 'কালিকলমে' 'শ্মশানের পথে' নাম দিয়ে একটি গল্প বের হল। গল্পটি দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল অনেকের। এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথের বোধ হয় প্রথম মাইল-পোস্ট। গল্পটি পরবর্তী কালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

একটু ভুল হল।

প্রথম প্রকাশিত পুস্তক আমার একখানি কবিতার বই। নাম 'ত্রিপত্র'।

মন্দ কবিযশঃপ্রার্থীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাব্য এবং কবির এমন মাঠে মারা যাওয়ার উদাহরণ বোধ করি বিরল। আমার এক শ্যালক—তিনি স্বর্গত, মহা-উৎসাহী যুবক, ঝড়ের মত প্রকৃতি, গানে, বাজনায়, অভিনয়ে, উল্লাসে, হুল্লোড়ে, আমীরিতে সে একেবারে অদ্বিতীয়। ব্যবসা করতে নেমেই প্রচণ্ড ব্যবসা এবং প্রকাণ্ড লোকসান করে বসলেন। কিন্তু তাতেও দমলেন না। আবার লাগলেন; এবার সফলও হলেন। এই ছেলেটি আমার থেকে বয়সে বছর কয়েকের ছোট

ছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসেবে এবং স্বকীয় স্বাভাবিক গুণে আমার পেট্রন হয়ে উঠলেন। এবং জোর করে আমার কবিতার খাতা নিয়ে—কবিতার বই ছেপে বসলেন। লাল কালিতে ছাপা কবিতার বই। ছাপা হল কোন্ প্রেসে মনে নেই, তবে কয়লার ব্যবসায়ী মহলের লেটার-হেড ছাপা হত সেখানে। এবং বইগুলি এসে উঠল শ্যালকের আপিসে। কোণে বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে রইল। অতঃপর শ্যালক কলকাতার ব্যবসায়ের পাট উঠিয়ে গেল রানীগঞ্জ অঞ্চলে; বইগুলি এবার স্থানান্তরিত হল—সালিখার এক লোহার কারখানায়। এ দিকে শ্যালকটি একদিন মোটর সাইকেলে চড়ে রানীগঞ্জ অঞ্চলের পাথুরে ডাঙার উপর পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে বুকে আঘাত পেলেন, তা থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল নিউমোনিয়া এবং তাতেই তাঁর ঝঞ্ঝার মত জীবনের অবসান হল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রিপত্রে'র সর্ব সন্ধান বিলুপ্ত হল। তার পরও আছে—একদা ছাপাখানা থেকে এল বিল। বিল শোধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

এইখানে আমার প্রথম উপন্যাসের কথাও বলে রাখি।

রাজনৈতিক জীবনের ভাঁটার সময় একখানি উপন্যাস রচনা করেছিলাম—'মারাঠাতর্পণে'র সঙ্গেই। বা কিছু আগেই। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল—শিশির বসু সম্পাদিত 'একপয়সার শিশিরে'। তখন—'সচিত্র শিশির' এবং 'একপয়সার শিশির' বলে দুখানি কাগজ চলত। বইখানির নামও মনে নেই, তার কোন চিহ্নও নেই। শিশির বসুর কাছেও নেই। কারণ তখনও নূতন যুগের রচনা পড়ে পথ পাই নি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষম ভাবে অনুকরণ করেছিলাম।

১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে আমার মেজভাইয়ের বিয়ের বাজার করতে কলকাতায় এসে একদিন পটুয়াটোলায় বহুখ্যাত 'কল্লোল' আপিসে গেলাম। সঙ্গে আমার ছোট ভাইও ছিল। বৈশাখের বেলা তখন প্রায় চারটে। বাইরে উত্তাপ অনেক। ছোট ঘরখানায় ঢুকবার সময় একটুখানি স্নায়ুচাঞ্চল্য অনুভব করলাম। কি বলব? কি বলব? কাকে দেখব। ঢুকে আশ্বাস পেলাম, দেখলাম শৈলজানন্দকে।

শৈলজানন্দের সঙ্গে 'পূর্ণিমা'র কল্যাণে তখন পরিচয় হয়েছে। 'পূর্ণিমা'র লেখার জন্য সত্যাদিত্যের অর্থাৎ সত্যনারায়ণের সঙ্গে কয়েকজন সাহিত্যিকের দরবারে উঁকি মেরেছিলাম। বোলপুরে শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের ওখানে গিয়েছিলাম। গুপ্ত কোন কারণে 'পূর্ণিমা'র উপর বিরূপ ছিলেন; তাঁর সঙ্গে আদৌ জমে নি; সে প্রায় ধাক্কা খেয়ে চলে এসেছিলাম। তারপর অবশ্য যখন বোলপুরে ছাপাখানা করেছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এ কথা আমিও তুলি নি, তিনিও তোলেন নি। আর গিয়েছিলাম কালিদাস দাদার কাছে। কালিঘাটের ট্রাম ডিপোর কাছে বাসা, সন্ধ্যেবেলা দাদার ওখানে গিয়ে এক নজরেই হৃদয়বান মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলাম। দাদার তখনও ভাই হতে পারি নি, ভাই না হলে দাদার রসের উৎসমুখ খোলে না। কিন্তু দাদার মনের দরজাটি স্ফটিকের—ভিতরটা দেখা যায়। সেদিন আনন্দে কৌতুকে মন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটা বাড়ির ভিতরের অংশে থাকতেন, গলিপথে গিয়ে উঠলাম। দাদা দরজা খুলে দুটি তরুণকে দেখে প্রথমটায় বোধ হয় পরীক্ষার নম্বর জানতে এসেছে ভেবে ভুরু কুঁচকে বললেন—কি চাই?

পরিচয় দিলেন সত্যনারায়ণ, বললেন—আমরা আসছি নাট্যকার নির্মলশিব বাবুর ওখান থেকে। আমাদের 'পূর্ণিমা' কাগজ বোধ হয় আপনি দেখেছেন। পাঠানো হয় আপনাকে।

—ও হ্যাঁ। আসুন। দাদা দরজা ছেড়ে নিজে ভিতরে ঢুকলেন। বসুন। —বলে নিজে কিন্তু ঘুরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই রইলেন। মনে হল একটু যেন চঞ্চল হয়ে গেছেন। একটু কেন, বেশ। যতক্ষণ কথা বললাম, প্রয়োজনের একটু বেশীক্ষণই বলেছিলাম, কেন না, এমন একজন মোলায়েম প্রকৃতির লাজুক কবিকে পাওয়া তো সহজ নয়! কালিদাস রায়ের মত খ্যাতনামা কবি, মেজাজ নাই, যা বলছি—উত্তর দিচ্ছেন। তবে পিছন ফিরে। মধ্যে মধ্যে সামনে ফিরছেন—কি—আমরাই ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তিনি কয়েক মিনিট মুখোমুখি কথা বলে—আবার পিছন ফিরছেন। ভারী ভালো লেগেছিল।

তবে আজ মনে কখনও কখনও সন্দেহ হয়। দাদার স্বীকারোক্তির মধ্যে পাই মধ্যে মধ্যে তিনি কৌতুকে মনে মনে অট্টহাস্য করে থাকেন! কথা বলবার সময়

মধ্যে মধ্যে দোখ হাসি বেরুতে বেরুতে চাপা পড়ে; বুঝি, দাদা অন্তরে অন্তরে হাসছেন। ভেতরটা হাসিতে কাঁপছে বুঝতে পারি। রোহিত মৎস্য যতই গভীর জলে চলুক—জলের উপরে একটি দাগ পড়ে; যাদের দৃষ্টি প্রখর তাদের চোখ এড়ায় না। তাই আজ ভাবি—সেদিন রসিকপ্রবর রসশেখর সাহিত্য-বিলাসের নমুনা দেখে অট্টহাস্য চাপতেই এমন ভাবে ফিরে ফিরে দাঁড়ান নি তো? তবে লেখা দিতে তিনি বিমুখ হন নি।

শৈলজানন্দ আলাপী মানুষ। তাঁর মাতামহের মৃত্যুকালে তখন তিনি তাঁর কলকাতার বাড়িতেই। সেইখানে হৈ হৈ করে আলাপ। প্রথমটাতে সত্যনারায়ণের সঙ্গে। বীরভূমের লোক, রানীগঞ্জে অনেক কাল কাটিয়েছেন, কয়লার ব্যবসায়েও কিছুদিন শিক্ষানবীশ ছিলেন, প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী লাভপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশকে ভালো করেই জানতেন। তার উপর নাটকার নির্মলশিব নূতন খ্যাতি বংশ সম্পদ যোগ করেছেন সোনার গহনায় জহরতের মত। প্রাণ খুলে হাসতে পারেন শৈলজানন্দ। আরও একটি মহৎ গুণ সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম, নূতনকে—ভালোকে তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন, স্বীকার করেন অতি সহজে। 'পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' গল্পের উল্লেখ করে বারবার বললেন—ভালো হয়েছে। বেশ গল্প। চমৎকার।

মনে মনে তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলাম। তখন তাঁর লেখা এবং প্রেমেন্দ্রের লেখা পড়ে 'রসকলি' লিখেছি, লেখাটি তখনও বিখ্যাত কাগজে সম্পাদকের বিবেচনাধীন রয়েছে। কিন্তু সে কথা সেদিন বলা হয় নি। অবকাশও পাই নি, এ কথা বলতেও সংকোচ হয়েছিল যে, আপনাদের মতই একটি গল্প আমি লিখেছি।

শৈলজানন্দকে সেইদিন চিনে রেখেছিলাম।

'কল্লোল' আপিসে সেদিন শৈলজানন্দকে দেখে তাই আশ্বস্ত হলাম।

ছোট ঘর, একদিকের এক কোণ ঘেঁষে টেবিলের সামনে বসে আছেন স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক। তাঁর টেবিলের সামনেই তক্তপোশে গেঞ্জি গায়ে বসে আছেন শৈলজানন্দ। ওদিকে এক কোণ ঘেঁসে চেয়ার-টেবিলে বসে এব

ভদ্রলোক—চোখে চশমা ; তিনি তখন কাগজপত্র গুটিয়ে কাঁচা তামাকের পাতা মুখে পুরছেন।

শৈলজানন্দ কিছু নিয়ে এপাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে দর-কষাকষির মত আলাপ চালাচ্ছিলেন। সাহিত্যিকের দর-কষাকষি—তাই হাসি রসিকতার অভাব হয় নি। যখন ঢুকলাম তখন শৈলজানন্দ স্বভাবসিদ্ধ-হা-হা হাসি হেসে বলেছিলেন—আর চালাকি কোরো না, ধরা পড়ে গেছ। দাও, দিয়ে ফেল। তারপরই একটু বিনয়সহকারে কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব আরোপ করে বললেন—সত্যি বলছি, বিশেষ দরকার আমার।

এই সময়েই আমি ঢুকলাম।

শৈলজা দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন—আরে, তারাশঙ্করবাবু—আসুন, আসুন। দীনেশ! তারাশঙ্করবাবু। ইনি দীনেশবাবু, উনি পবিত্র।

পবিত্র তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি উঠছি, আপনি এলেন! তা বেশ, হবে এর পর আলাপ। কেমন?

চলে গেলেন। দীনেশবাবু বললেন, বসুন, বসুন।

বসলাম। তারপর সব চুপ। আমিও চুপ। তাঁরাও চুপ। ভাবছি কেমন করে জমানো যায়। কী বলি! কড়িকাঠের দিকে চাইলাম, মেঝের দিকে চাইলাম, হঠাৎ একটা কথা খুঁজে পেলাম, ভাবলাম বলি, আমার ভাইয়ের বিয়ে, চলুন না আমাদের দেশে। কথাটা আমাদের গ্রাম্যসমাজ অনুযায়ী চমৎকার। এই সূত্র ধরে অনেক কথা বলা যেতে পারবে। অন্তত আমি বলবার সুযোগ পাব আমাদের গ্রামের অনেক কথা। মুখ তুললাম বলবার জন্য, তুলেই একটু অপ্রস্তুত হলাম, দেখলাম—দীনেশবাবু মুখ টিপে ও চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দের দিকে চেয়ে না-এর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়ছেন। মুখ আপনিই চকিতে ফিরল শৈলজার দিকে। দেখলাম—শৈলজা দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন—দু হাতের দশটি আঙুল মেলে দেখাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন। তারপরই হাত জোড় করলেন।

দীনেশবাবুকে চতুর লোক মনে হল। চতুর বলে ধূর্ত বলছি না আমি।

আমি বলছি, নাগরিক যে হিসাবে গ্রামীনের কাছে চতুর সেই হিসাবে চতুর তিনি। মুহূর্তে তিনি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন, বললেন, তারপর তারাশঙ্করবাবু, আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে না? ছিপে ধরা যায়?

এর উত্তর আমি দেবার আগেই ঘরে প্রবেশ করলেন একজন বিচিত্র তরুণ। লম্বা চুল, চমৎকার মুখশ্রী, বগলে কোন বইয়ের ফাইল, এক হাতে দইয়ের ভাঁড়, অন্য হাতে একটা ঠোঙা এবং পাকা কলা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে প্রবেশ করলেন। এবং প্রবেশ করেই আবৃত্তি বন্ধ করে বললেন, ভাই দীনেশ—

ভাই দীনেশ, কি ভাই দীনেশবাবু—ঠিক মনে নেই।

দীনেশবাবু মুহূর্তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—নৃপেন, ইনি তারাশঙ্করবাবু।

ঘাড় বেঁকিয়ে আমায় দেখে নৃপেন বললেন, 'রসকলি'।

দীনেশবাবু আমায় বললেন—আর উনি হলেন 'শতাব্দীর সূর্য'—নৃপেন চট্টোপাধ্যায়।

নৃপেন এবার দইয়ের ভাঁড়, ঠোঙার চিঁড়ে, কলার ছড়া, 'শতাব্দীর সূর্যে'র ফাইল নামিয়ে বললেন, ওঁর সঙ্গে আলাপের আগে একটা সকরুণ দৃশ্যের কথা

—বল।

—আজ দেখলাম, বউ বিয়ের বেনারসী শাড়ি পরে ভাত রাঁধছে। দেখে আর অন্ন আমার মুখে রোচে নি। সারা দিন পর এই দই-চিঁড়ে খাব। নৃপেন চলে গেলেন বাড়ির ভিতরের দিকে চিঁড়েতে জল দিতে। দীনেশবাবু একবার শৈলজার মুখের দিকে তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, শৈলজা ভুরু দুটো উঁচু করে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন নৃপেন্দ্র যে দরজার ভিতরে অন্তর্হিত হলেন সেই দরজার দিকে।

আমি প্রায় হতভম্ব হয়ে দিয়েছিলাম। অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমাকে আড়াল দিয়ে ওই ইঙ্গিত-আলাপনটা আলপিনের খোঁচার মতই

বাঁধছিল। এবং নৃপেন্দ্রের ওই বেনারসী শাড়ি পরে ভাত রান্নার কথাটির ব্যঞ্জনায় নিজেকে এমনই গ্রামীন মনে হল যে চলে আসবার জন্য অছিলা খুঁজতে লাগলাম।

এরপপর নৃপেন্দ্র প্রবেশ করে বললেন—একজোড়া শাড়ি আজ আমার না কিনলেই নয়।

এরই মধ্যে আমি বিদায় নিযে বেরিয়ে এলাম। আর 'কল্লোল' আপিসে যাওযা আমার ভাগ্যে ঘ'ট ওঠে নি।

(৬)

এই বারেই চাক্ষুষ পরিচয় হল মুরলীধর বসু—মুরলীদাদার সঙ্গে। মুরলীবাবুকে দাদা বলে ধন্য হয় মানুষ। এমন মানুষ—সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে এমন প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসা সচরাচর দেখা যায় না—পাওয়া যায় না। মুরলীদাদার প্রাণের পরিচয় সোজাপথে বেরিয়ে আসে, একেবারে খাঁটি মধুর মত তার স্বাদ, আধুনিক যুগেব আলাপের টোস্টের সঙ্গে মাখিয়ে দেবতাকেও ভোগ দেওয়া চলে। সাহিত্য-জগতে বুদ্ধির কড়াপাকে প্রাণের পরিচয় প্রায় লজেঞ্চস্ হয়ে দাঁড়িয়েছে, চিনিই মূল উপাদান—তবে কিছুটা অম্লাস্বাদদায়ক—কথা, বাকভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনার কড়া ভিয়েনে এমন জমাট হয়ে উঠেছে যে সোজাসুজি মুখে ফেলে গলাধঃকরণ করা চলে না, দস্তবমত শক্ত দাঁতে কড়মড় করে ভাঙতে হয়, নয় তো চুযে চুযে শেষ করতে হয়। আবেগকে বর্জন করে কড়া বুদ্ধিবাদ এ যুগের ফ্যাশন, আমার ধাতে ওটা সয় না; আমি মোটেই ফ্যাশনেবল নই, সে আমি জানি। তাই মুরলীদাদাকে আমার এত ভালো লেগেছিল। একদণ্ডের আলাপে মনে হল কতকালের জানাশোনা। পরদিন নিমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে। প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও আমি তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ। খেতেও পারি না, হজম-শক্তিও দুর্বল। তা হলেও ভোজের চেয়ে প্রীতি পেলাম ভূরি পরিমাণে। সুখের কথা দুঃখের কথা, ঘরের কথা হলই। তারপর বললেন শৈলজার কথা। শৈলজানন্দের প্রতি ভালোবাসায়

পরিমাণ দেখে বিস্মিত হলাম। সে যে কী ভালোবাসা তা বলবার নয়। তারপর প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের কথা বললেন। এদের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করলেন। প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল অনেক। কালিঘাটে মনোহর পুকুর রোডে এক আত্মীয়-বাড়িতে একটি ছেলের কাছে এদের কথা শুনেছিলাম। শৈলজানন্দের কাছেও শুনেছিলাম। শৈলজানন্দ বলেছিলেন—প্রেমেনকে ধরা মুশকিল। আমি বরং তাকে বলব 'পূর্ণিমা'য় লিখবার জন্য। তার সঙ্গে আমাব খুব সম্প্রীতি আছে। অচিন্ত্যকে আপনারা ধরবেন। এম. সি. সরকারের দোকানে পাবেন। বসে থাকে। তবে সে কি কান দেবে?

আত্মীয় ছেলেটি বলেছিল—অচিন্ত্যবাবু আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন কিছুদিন। এখন আর পড়ান না। না হলে এখানেই দেখতে পেতেন। তবে ভবানীপুরের পথে মোটা লেন্সের শেলের চশমা চোখে—সামনে ঝুঁকে শিকলিতে বাঁধা চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে যদি কোন কালো, লম্বা তরুণকে যেতে দেখেন তবে বুঝবেন সেই হল অচিন্ত্যবাবু। আর তার পাশে চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলের মত মাথায়, চুল কোঁকড়া, চশমা চোখে কাউকে দেখেন, তবে জানবেন সে হল প্রেমেন মিত্তির। বলেছিল—এক-একটি বিত্তের জাহাজ।

ছেলেটিই অবশ্য কথার দিক দিয়ে তুবড়ি।

থাক। মুরলীদাদা এদের কথা অনেকই বললেন, প্রথম বৎসর থেকে বাঁধানো 'কালিকলম' আমায় উপহার দিলেন। পরিশেষে বললেন, আসছে বৃহস্পতিবারে বারবেলার আসরে আসুন। সকলকে দেখতে পাবেন।

অচিন্ত্যবাবু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে এই বারবেলার বৈঠকে দেখলাম।

বৃহস্পতিবারের অপরাহ্নে এই বৈঠক বসত—এই কারণেই এর নাম ছিল বারবেলার আসর। আসর বসত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপরতলার প্রশস্ত বারান্দায়, বরদা এজেন্সির বইয়ের দোকানের সামনে; বরদা এজেন্সির ঘরেই ছিল 'কালিকলমে'র আপিস। পাশেই ছিল আর্য পাবলিশিং হাউস। বরদা এজেন্সির মালিক ছিলেন শিশিরবাবু। আর্য পাবলিশিং হাউস চালাতেন শশাঙ্ক চৌধুরী। 'কালিকলমে'র সম্পাদক কর্ণধার তখন একা মুরলীধর বসু। এঁরা তিন জনেই বারবেলার অতিথি-সমাগমে গৃহস্থ। শিশিরবাবু চুপচাপ থাকতেন—একটু

অভিজাত শ্রেণীর গম্ভীর লোক বলে মনে হয়েছিল, শশাঙ্ক চৌধুরী আমারই মত শীর্ণকায়—তখনই মাথার চুলে টাক উঁকি মারতে শুরু করেছিল; শশাঙ্কবাবু সদানন্দ পুরুষ, মুখে আগে হাসি পরে কথা, দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষটির ভিতরের জনটি কাচের ঘরে বাস করেন। ভারী ভালো মানুষ। হৃদয় নামক যে বস্তুটি কয়লার খনিতে হীরকখণ্ডের মত, কোথায় লুকিয়ে থাকে—খুঁজে বের করতে হয়, যে বস্তুটি বিগলিত হয়ে বড় হয়ে গেলে ডাক্তারেরা চিন্তিত হন, সেই বস্তুটি শশাঙ্কবাবুর যেন দেহের কয়লা খনি থেকে বেরিয়ে এসে—ঝলমল করছে এবং উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে বিগলিত হচ্ছে তবু শশাঙ্কবাবুর জীবন সম্পর্কে কোন চিন্তার হেতু নাই। 'কালিকলম' 'কল্লোলে'র যুগের এই দুটি মানুষ শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসু এবং শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক চৌধুরী সুদুর্লভ মানুষ। আর একজন—কবি শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়। সুবোধবাবু এখন হৃদরোগে প্রায় অক্ষম জীবন যাপন করছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর পত্র যখন পাই তখন মনে হয় অমৃতের স্পর্শ পেলাম। সুবোধবাবুর জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমার জীবন-দর্শনের কোথায় একটি সমধর্মের সূত্র আছে।

বারবেলার কথা বলি।

এই আসরটির নাম এবং ব্যবস্থায় যে তত্ত্বটি পরিস্ফুট তখনকার সাহিত্যের তত্ত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রচলিত বারবেলা সংস্কারকে নামানা এবং তার ভয়কে উপেক্ষা বা চ্যালেঞ্জ করা। আমার অবশ্য এই নামটা ভালো লাগে নি। বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। বারবেলা তখন কেই বা মানত? ও সংস্কার তখন প্রায় উঠেই গেছে। আমাদের দেশে একবার একটা বাঘ এসেছিল; বেচারা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গঙ্গাতীরের জঙ্গল বেড়ে কোপাই নদীর ধার ধরে বায়ু পরিবর্তনের জন্যই হোক বা খাদ্যসংগ্রহের সুবিধার জন্যই হোক এসে পড়েছিল এই এলাকায়। এসে আর নড়তে চড়তে পারে নি; একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত আর লেজটা নাড়ত। সেই দীর্ঘনিশ্বাস শুনে রাখালেরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে লাঙুল আন্দোলন। তারপর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বাঘ! দেশের বাবুরা বন্দুক নিয়ে গেলেন। গুলি ছুঁড়লেন। এমন সময় একজন সাহসী ব্যক্তি মুমূর্ষু বাঘটার উপর লাফিয়ে পড়ে

দা দিয়ে কোপালেন তাকে। সে সময় বারবেলা না মানার বা মানার ভানে দুঃসাহসিকতা পথে যাত্রা ঘোষণার ইঙ্গিতটা বাড়াবাড়ি মানে হয়েছিল।

বারবেলা আমিও মানতাম না।

বোধ করি বারবেলা আসরে যোগ দেবার খুব অল্পদিন আগেই আমি এক বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়ে পথে ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলাম। অল্পের জন্যই বেঁচেছিলাম। বাইসিক্ল ছিল—সেই যান্ত্রিক বাহনটির গতিই আমাকে রক্ষা করেছিল; বাইসিক্লের পিছনের টায়ারে দুটি বংশখণ্ডও এসে লেগেছিল। লোকে বলেছিল—ঠ্যাঙাড়েদের দোষ তত নয়—যত দোষ আমার ওই বারবেলায় রওনা হওয়ার ধৃষ্টতার—ঔদ্ধত্যের। তবুও মানতাম না বারবেলা। এই কারণেই ভালো লাগে নি। যেমন আমার ভালো লাগে নি—শনিবারের চিঠির প্রচ্ছদপটে শনিগ্রহের ছবি। মোরগ লড়াইয়ের ছবিটি ভাল।

বারবেলার আসরে সেদিন অনেককে দেখলাম। তার মধ্যে শশাঙ্কবাবু, মুরলীদা, শিশিরবাবু ছাড়া পেলাম সরোজ রায়চৌধুরীকে, সুবোধ রায়কে আর কিরণকে—কিরণকুমার রায়কে। আরও অনেকে ছিলেন। সর্বশুদ্ধ পনেরো-ষোলো জন। বোধহয় ফণীন্দ্র পাল—যিনি এখন সিনেমা-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—তিনিও ছিলেন। সরোজ-সুবোধ-কিরণ পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আবার কিরণ আমার ঘনিষ্ঠতম আপনার জন হয়েছেন। আমার সাহিত্যিক জীবনে—যাঁদের কাছে শিখেছি—যাঁরা আমার সাধনার পথে উত্তর-সাধকের মত সহায়তা করেছেন, দ্বিধায় সংশয় মোচন করেছেন, হতাশায় আশা জুগিয়েছেন—কিরণকুমার তাঁদেরই একজন। দুজনের একজন। অন্যজন সজনীকান্ত দাস। তাঁর সঙ্গে আলাপ অনেকদিন পর।

অল্প সময়ের মধ্যেই আসর জমে উঠল। প্রত্যাশা করেছিলাম—রচনা পাঠ হবে, আলোচনা হবে, শুনব। কিন্তু সে সব কিছু হল না। নিতান্তই আসর, এবং সে আসরে নবযুগের বক্রভাবভঙ্গিতে পরস্পরকে সকৌতুক আক্রমণ এবং আক্রমণ খণ্ডন উপভোগ্য।

প্রথম আলাপেই কিরণ আমাকে এমনি আক্রমণ করলেন। আমার একটি গল্প বের হয়েছিল—তার মধ্যে অন্ধকার গলিপথে একজন চলেছেন তাঁর হারানো

প্রিয়তমার সন্ধানে: রাত্রির পর রাত্রি তিনি এইভাবে খোঁজেন—মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনলে বা কোনো মানুষের অস্তিত্বের আভাস পেলে দেশলাই জ্বেলে দেখেন। কাঠিটা নিভে যায়—আবার জ্বালেন। এই সূত্র ধরে কিরণ প্রথমেই বললেন—আপনি তো দেশলাই কোম্পানির এজেন্ট।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—না তো! কে বললে?

—তবে? ওই গল্পটায় এত দেশলাই খরচ করেছেন কেন? একটা টর্চ হাতে দিলেই তো হত।

আসরে বেশ খানিকটা হাস্যরোল উঠল।

কিছুক্ষণ পর আসরে আবির্ভূত হলেন—প্রেমেন্দ্র এবং অচিন্ত্য। ওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট কয়েক বাক্যবাণ প্রয়োগে আসর-নাট্যটির সংলাপকে সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল করে দিয়ে চলে গেলেন। মুরলীদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

শুধু নমস্কার বিনিময় হল। আর ছোট একাক্ষর একটি বাক্য—ও!

চলে গেলেন দু-জনে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ—জাত-বাঙালী—প্রথম আলাপেই নাম ধাম ঠাকুরের নাম (বাবার নাম)—গাই-গোত্র—কোন বেদ—কোন শাক এ সবের খোঁজ নিই; কি করেন—কতটাকা মাইনে জিজ্ঞাসা তখন সভ্যতাবিরুদ্ধ বলে জিজ্ঞাসা করি না বটে তবে মনের মধ্যে ঔৎসুক্য অনুভব করি। এ আসরে একটু দমে গেলাম বই কি! রাঢ় দেশের পুকুরের মাছ কলকাতার জোয়ার-ভাঁটা-খেলা গাঙে এসে পড়লে যা হয় সেই অবস্থা।

এই সময় হঠাৎ একজন এলেন, একজন নয়—তাঁর সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন—কিন্তু একটা নামই সমস্বরে উচ্চারিত হল বলেই একজন বলছি।

সমস্বরে উচ্চারিত হল—সুধাদা!

সুধাদার পুরো নাম জানি না—জানবার দরকারও নাই; লোকটি আজও কলকাতা শহরে রঙ্গমঞ্চে, রঙ্গরসিক মহলে, সাহিত্যিক মহলে সর্বজনবিদিত ব্যক্তি রসিক ব্যক্তিটি দুর্ভাগ্যক্রমে জন্ম নিয়েছিলেন ধনী কয়লা ব্যবসায়ীর ঘরে। তাঁ নাট্যপ্রিয়তার জন্য রসিক মানুষটি ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দুঃখ পেয়েছে জীবনে। আবার নাট্যমন্দিরেও পুরো নামতে পারেন নি।

সংসারটাই রঙ্গমঞ্চ—আমরা সবাই অভিনেতা—এটা অবশ্য একটা দর্শনতত্ত্ব বটে। কিন্তু অভিনয়ের মেক-আপ আর বাকভঙ্গি এ দুটো যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেখানেই অভিনয়টা মেকি হয়ে যায়—অভিনয় বলে ধরা পড়ে। কিন্তু ও দুটোর সঙ্গে যখন প্রাণ সাড়া দেয়, যোগ দেয় সমানে—তখন অভিনয়কে আর অভিনয় বলে ধরা যায় না। সেইখানেই মহানাটক হয় সার্থক। এমনকি প্রাণ যখন মেক-আপ বাকভঙ্গিকে ছাপিয়ে যায়—তখনই দর্শকেরা কাঁদে—হাসে। সুধাদা তেমনি প্রাণবান অভিনেতা। তাঁর প্রাণের সাড়ায় ওই বৈঠকী অভিনয় প্রাণ পেলে। সকলে মেক-আপ খসিয়ে সোজা কথায় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি সেদিন সঙ্গে এনেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়কে। তাঁর কতকগুলি একাঙ্কিকা তখন প্রকাশিত হয়েছে। নাটকও বোধ হয় অভিনীত হচ্ছে আর্ট থিয়েটারে কি কোথাও।

মন্মথ রায় লাজুক মানুষ—আমারই মত চুপ করে রইলেন।

সুধাদা আলোচনা শুরু করে দিলেন। আসর পালটে গেল। সে দিন যা পেলাম, তা ওই সুধাদার কল্যাণেই এবং তাঁর কাছ থেকেই বেশী।

আসর ভাঙল। বাসায় ফিরলাম। যাবার বেলা অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে ভুললাম না। তিরিশ-গিরীশ। ভবানীপুরে গিরীশ মুখার্জী লেনের কাছাকাছি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে—আত্মীয়ের বাসাতে উঠেছিলাম।

পরদিন গেলাম তাঁর বাসায়। ঢুকেই বোধ হয় বাঁদিকের ঘরে—অচিন্ত্যবাবুর লেখাপড়ার ঘর। অনেক বই। তার মধ্যে বসে আছেন। ডেকে বসালেন। কিছু কিছু আলাপ হল। উৎসাহ দিলেন। আমি অনেক চেষ্টা করলাম স্বচ্ছন্দ হতে। কিন্তু স্বভাবদোষে পারলাম না। পরিশেষে—তাঁর কাছে পড়বার জন্য তাঁর 'বেদে' বইখানি চাইলাম। পড়ে কাল ফেরত দিয়ে যাব।

অচিন্ত্যবাবু একখানি নতুন বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—নিয়ে যান। ফেরত দিতে হবে না।

আমি একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যসত্যই বইখানি আমি পড়বার জন্যই চেয়েছিলাম। আমার নিজের দাবি কতখানি সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন

ছিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য আগত আমি, অচিন্ত্যকুমার নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বই উপহার পেতে যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল—সে তো আমার ছিল না। যে অন্তরঙ্গতার দাবিতে সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যিক বন্ধুর কাছ থেকে বই উপহার পায়—তাই বা কোথায় তখন? এবং আমাদের লাভপুরের সাহিত্যিক জীবনে এবিষয়ে আমার যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সে-ও এর বিপরীত। আমাদের ওখানে তখন আমার অগ্রজতুল্য তিন জন সাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের নাটক গল্পের বই তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ করেছেন। স্বর্গীয় নির্মলশিব, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়; এঁরা আমাকে কোন বই দেন নি। সে নিয়ে মনে বেদনা বা ক্ষোভ হয়ত প্রথম প্রথম হয়েছিল কিন্তু পরে ওইটেই হয়ে গিয়েছিল সহজ অবস্থা। অচিন্ত্যকুমারের কাছে 'বেদে' বইখানি পেয়ে তাই আনন্দের পরিবর্তে লজ্জাই বেশী অনুভব করলাম। কি বলব কয়েক মিনিট বসে ভাবলাম। বলব, না না, আমি ফেরত দিয়ে যাব। কিন্তু অচিন্ত্যবাবু তার পূর্বেই আবার বললেন, আপনাকে দিলাম।

উঠলাম, উঠেও দু মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। ইচ্ছে ছিল অচিন্ত্যবাবু বইখানায় প্রথামত লিখে দেন। কিন্তু বলতে পারলাম না। প্রীতি যদি নাই পেয়ে থাকি, তবে প্রীতিভাজনেষু বা সুহৃদ্বরেষু লিখে মিথ্যাচরণ করবেন কেন? কিন্তু অকপট ভাবেই বলব কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল গ্লানি আমার কেটে গেল। অক্ষয় হয়ে রইল আমার মনে এই কথাটি যে, সাহিত্যিক হিসাবেই গণনা করে অচিন্ত্যবাবুই তাঁর বই উপহার দিয়ে আমাকে প্রথম সম্মানিত করলেন।

আমার সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে ['কথাসাহিত্য' শ্রাবণ—১৩৫৭] অচিন্ত্যকুমার এই কথাটিই লিখেছেন। এবং এই লিখে না দেওয়ার কথাটি স্মরণ করেই লিখেছেন, "আমার প্রথম বই 'বেদে' সদ্য সদ্য বেরিয়েছে, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব অতিথিকে, একখানা বেদে তাকে উপহার দিলাম।

"সেইটের মধ্যে যেন নিরবিচ্ছিন্ন প্রীতি ছিল না, ছিল বা প্রচ্ছন্ন স্পর্ধা। ভাবখানা এমনি, একটা প্রকাণ্ড কর্ম করেছি, তুমি দেখ, তুমি সাক্ষী হও। তাই সে কথাটি পরবর্তীকালে আমার আর মনেই ছিল না। যে ভাবটি প্রীতির রসে সঞ্চিত থাকে না, তা স্বল্পজীবী।"

আমিই তাঁকে একদিন এই কথাটি পত্রালাপের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে অচিন্ত্যবাবু একটু আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু অনুভব করা তো উচিত ছিল না। প্রথম যৌবনে একদিনের আলাপে বই দিয়ে যদি না লিখেই দিয়ে থাকেন, যদি প্রীতি দিতে নাই পেরে থাকেন, তবু তো স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। স্পর্ধা খানিকটা থাকেই। যেখানে নেই সেখানে সে স্তিমিত। আজ অচিন্ত্যবাবু প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন,—স্পর্ধা শক্তি সব পরিণত হয়েছে মহৎ মাধুর্যে। তাই তিনি বিষণ্নতা অনুভব করেছেন। আমার জীবনে কিন্তু এইটুকুই প্রথম স্বীকৃতির সম্পদ। এমনভাবে কেউ আমাকে সম্মানিত করেন নি। বই পরবর্তীকালে অনেকের কাছেই পেয়েছি কিন্তু এমন প্রথম আলাপেই কেউ দেয় নি। তাই পরম প্রীতিভরে যদি নাও হয়, পরম শ্রদ্ধাভরে এ কথাটি স্মরণ করি। সময়ে সময়ে মনে হয় হয়তো বা আমার চিঠিতেই অভিযোগ ছিল। তা যদি থেকে থাকে তবে সে আমারই অপরাধ। অহং-কে গড়ে তোলে মানুষ; মানুষ তা থেকে আত্মাকে পাবার জন্য। অহং হল প্রতিমা, তার মধ্যেই দেবতার মত আত্মা যখন আবির্ভূত হন তখন প্রতিমা মাটিত্ব থেকে মুক্তি পায়। তার রঙ এবং রাঙতার গৌরব ধুলোয় মেশে। অচিন্ত্যবাবু আত্মাকে অনুভব করেছেন।

তিনি ১৩৩৬ সালে 'কল্লোলের' ভার নিয়েছিলেন। দীনেশবাবু ছায়াছবির জগতে চলে গেলেন। অচিন্ত্যবাবু আমাকে গল্পের জন্য লিখলেন। আমি 'স্বৈরিণী' নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠালাম। অচিন্ত্যবাবু গল্পটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে' ছাপতে দিয়ে লিখলেন, 'স্বৈরিণী' নামটি বদলে দিলাম। নামকরণ করলাম 'রাইকমল'। নায়িকা রাইকমল।

আমার ইচ্ছা ছিল আমার প্রথম বই উৎসর্গ করব অচিন্ত্যবাবুকে। 'বেদে' পেয়ে এতখানি অভিভূত হয়েছিলাম আমি। কিন্তু তা হয় নি। রাজনীতির নেশা আমাকে তখন আরও বেশী আচ্ছন্ন করেছিল। তা ছাড়া আকস্মিক ভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে সে বই তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী'।

'রাইকমলে'র আগে ১৩৩৫ সালের 'কালিকলমে' 'শ্মশানের পথে' নামে একটি গল্প বেরিয়েছিল। এই গল্পটির মধ্যেই আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত ছিল। পল্লী-জীবন, পল্লী-সমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোন ক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না ; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ; ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।

এক অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ। ছোট জমিদার বংশে-আমার জন্ম—আবার কংগ্রেসকর্মী এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায় অন্যায় বোধের ধারণা ; তাই গ্রামে গ্রামে কখনও খাজনা আদায় উপলক্ষ্যে কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষ্যে ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লী-জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু—শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে ; ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।

প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছি—সুদ নিয়েছি খাজনা বৃদ্ধি করেছি ; কাছারিতে মহাজনকে বসিয়ে রেখেছি, যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য করেছি—সেই টাকা খাজনা হিসেবে জমা

করেছি। আমার তখন বয়স অল্প, আমাদের প্রবীণ নায়েব করেছেন—আমি অবাক হয়ে দেখেছি। শরিক জমিদারের কাছারিতে গিয়েছি—সেখানেও দেখেছি তাই। আরও বেশী দেখেছি—দেখেছি সেখানে তাঁরা নিজেরাই মহাজনি করেন, ধান টাকা সুদে ধার দেন। দেখেছি এক ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল, অবীরা বিধবাটির হিতার্থী সেজে তার হাতে একশো টাকা দিয়ে হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি লিখে নিলেন। কথা থাকল সম্পত্তি দখল পেলে তাকে আরও টাকা দেবেন, কিছু জমিও দেবেন। জমিদারের সম্পত্তি দখল করতে কতক্ষণ লাগে সে আমলে? দখল হল। বিধবা এল। রিক্ত হস্তে ফিরে গেল।

এর সঙ্গে মানুষের জীবন-বেদনা এমনি ভাবে জড়িয়ে গেছে, এমনি ভাবে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে একে বাদ দিয়ে মানুষের জীবনরূপ অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। নিয়তি—ভাগ্যফল—অদৃষ্টবাদের পটভূমির রঙ মুছে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

জেলখানায় বসে এই ভাবনাকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আরও অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা কলিয়ারির। শ্বশুর-কুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার-ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।

দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র সৃষ্টি।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। 'উপাসনা'র সম্পাদক কবি সাবিত্রী-প্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল, এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর 'উপাসনা'তেই 'চৈতালী ঘূর্ণী' বের হল। 'কল্লোল', 'কালিকলম' তখন নাই।

বইয়ের আকারে 'চৈতালী ঘূর্ণী' ছাপা হল 'উপাসনা' প্রেসেই। বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙলার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়, আগেই বলেছি এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

সে কথাটি এখানেই বলব।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর সরকারের সঙ্গে আপোস-কথাবার্তার সূত্রপাত হল। এদিকে বাংলা দেশে লাগল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধ। একদিকে সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দুজনকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। আমি তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সভ্য। জমিদারির সঙ্গে সংশ্রব কাটাবার অভিপ্রায়ে বোলপুরে একটি প্রেস করেছি। কলকাতা যাই আসি। বীরভূমেও এই বিরোধ বাধল। সেখানে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে সিউড়ীর গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত, সুরেন সরকার প্রভৃতি। স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎ মুখোপাধ্যায় মশায় নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেছেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী। তিনি লাভপুরে ডেটিন্যু হিসেবে কিছুদিন ছিলেন, তারপর আমার বাগানেই খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছিলেন একখানি। চতুর ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমাকে মানুষ করছেন এবং আমি তাঁরই একান্ত অনুগত। এই বিরোধে সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং অনাচার করেছিলেন তিনি। এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিশ্বস্ত আনুগত্য অনুমান করে সব অনিয়মেই আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। যে সভা হয় নি সে সভা কাগজে কলমে খাড়া করে আমাকেই তার সভাপতি হিসেবে জড়িয়েছিলেন। কালে মহারাষ্ট্র ভবনে আনে মহোদয়ের আদালতে যখন বিচার শুরু হল তখন বীরভূমের মূল সাক্ষী হলাম আমি। আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।

ওয়েলিংটন লেনে সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রেস, কাগজের আপিস এবং বাসা। আমি ওখানেই তখন অতিথি হিসেবে রয়েছি। কিরণ রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠছে। এমনি সময় একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণের বি-পি-সি-সি থেকে স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর সাবিত্রীপ্রসন্নকে অনুরোধ জানালেন যেন তারাশঙ্করকে নিয়ে একবার তিনি আসেন।

আমি বললাম, না। তিনি যা বলবেন সে আমি পারব না। মিথ্যা বলব না।

কয়েকদিন পর আবার অনুরোধ এল। বললাম, না।

বার বার তিনবার।

এর পর একদিন সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, চল, এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় ?

—চল না। বললে চিনবে না হয় তো।

তিনজনে বের হলাম। আমি, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ রায়। ভবানীপুরে এলগিন রোড়ের মোড়ে নেমে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে এনে তুললেন স্বর্গীয় শরৎবাবুর বাড়িতে। সামনের ঘরে আট-দশ জন দর্শনার্থী। ভিতরে বোধ হয় দশ-পনেরোটা কি তার বেশী টাইপরাইটার খটখট শব্দে অবিরাম চলেছে। ডানদিকের ঘরে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। একটি অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিমান কিশোর ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। কে ঠিক বলতে পারি না। সাবিত্রীপ্রসন্ন সংবাদ পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলেন। আলাপ করলেন কয়েকটি কথায় কিন্তু তাতেই পেলাম প্রাণের স্পর্শ।

আপনিই তারাশঙ্করবাবু! আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার যে কি প্রয়োজন! আমি আসছি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

ভাইপোকে ডেকে বললেন, চা দাও।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। একজন কংগ্রেসকর্মী—মাথায় চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—একটু যেন ব্যঙ্গ করেই বলে উঠলেন, ওই! হল—। সাহিত্যিক নিয়ে এইবার জল-খাওয়ানো মজলিস—।

বাকি কথা মুখেই রইল তাঁর। সুভাষচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন বাঘের মতো এবং বাঘের মতোই গর্জন করে উঠলেন, হোয়াট!

এক বিন্দু অতিরঞ্জন করি নি, বক্তা ভদ্রলোক মুহূর্তে ধপ করে বসে গেলেন চেয়ারে।—আমার অতিথি! বলে সুভাষচন্দ্র ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভীত হয়েছিলাম খানিকটা। শক্ত করে মনকে বাঁধলাম। সাবিত্রীকে শুধু বললাম, তুমি অন্যায় করেছ। আমাকে এমনভাবে এখানে আনা তোমার উচিত হয় নি।

বেরিয়ে এলেন স্বভাষবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাষবাবু তাঁকে বললেন, না। আপনি যান। তিনি চলে গেলেন।

স্বভাষবাবুই প্রথমে কথা আরম্ভ করলেন, আপনি কেন সাক্ষী দেবেন?

আমি খুব সংযত করলাম নিজেকে। বললাম, আমি তো মিথ্যা বলব না! একটা কথা—। বলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

তিনি প্রসন্ন মুখেই বললেন, বলুন।

বললাম, দেখুন, আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো স্বভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না! আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—তাই সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।

মুহূর্তে দুই পাশ থেকে দুটি আঙুলের টিপুনি খেলাম। একদিক থেকে কিরণ অন্যদিক থেকে সাবিত্রী আমাকে টিপলেন। আমি এর অর্থ ঠিক বুঝলাম না বুঝতে চাইলামও না! আমি তখন কঠোর সত্য বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রী, কিরণ আশঙ্কা করেছিলেন, স্বভাষচন্দ্র উষ্ণ হয়ে উঠবেন। আবার হয়তো গর্জন করবেন।

আমি স্বভাষবাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর স্বন্দর মুখখান কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য, টকটকে রঙ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি হাসলেন, প্রসন্ন হাসি। বললেন, নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেব করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই। বলু আপনি। সত্য কি ঘটেছিল?

পিছনে ঘরের ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি, একান্তে আলাপের স্থা খুঁজলেন। দেখলেন স্থান নাই। বললেন, চলুন, লনে বেড়াতে বেড়াতে কথ বলি।

চারজনেই লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বললাম। আমি বিবরণ বলে গেলাম তিনি মধ্যে মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, আপনার কথা আ অকপটে বিশ্বাস করলাম! আপনি সত্য বলেছেন। আমি দুঃখিত, লজ্জিত—

নরেনবাবু এই সব করেছেন—আমাকে ছোট করেছেন, কলঙ্কভাগী করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন, এ আমি চাই নি। এ আমি চাই না।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি শরৎবাবুকে (বীরভূমের) নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দিন।

আমি পারি নি। শরৎবাবুরা রাজী হন নি।

আমি তখন এই মানুষটির কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছি মনে-মনে।

'চৈতালী ঘূর্ণী' তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

(৮)

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর-একবার আমার দেখা হয়েছিল। কালানুক্রমেও এই ঘটনার খুব অল্পদিন পর। এবং আমার সাহিত্য-জীবনের উপক্রমণিকা পর্বে এর কিছুদিন পর নেমে এল নাটকের যবনিকার মতো একটি সংঘাতময় ছেদ। তিনিই আমাকে পথ নির্বাচনে কিছুটা সাহায্য করলেন—এই সাক্ষাতে।

তার আগে আমার তখনকার জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে—জেলখানার সংকল্প মনে রেখে—বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটভাইকে সব ভার অর্পণ করে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করলাম। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল একখানা কাগজ বের করব। সাপ্তাহিক কাগজ, নীলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব নয়, রীতিমত দেশপ্রেম-প্রচার-পত্রিকা। আমার মেজভাই তখন বেকার এবং বিপত্নীক হয়ে আধা-সন্ন্যাসী। গজভুক্ত কপিত্থের মতো অর্থনৈতিক অবস্থা! যাঁদের কাছে অর্থ পাই—তাঁরা দেন না, উপরন্তু চেষ্টা করেন যে সম্পত্তি আছে সে সব যাতে নিলাম হয়, তা হলে তাঁরা তা কেনেন! এ গ্রাস আত্মীয়ের। থাক সে সব কথা। বিষয়বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন—তাঁদের চরণে ক্ষোভহীন অন্তরে প্রণাম নিবেদনই করব।

বাড়ির বধূদের কিছু অলঙ্কার বিক্রি করা হল। মেজভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছেন, তিনি আর বিবাহ করবেন না সংকল্প করেছেন, সুতরাং বড়-বউ, ছোট-

বউয়ের দু-একখানা নিয়ে—বাকিটা মেজ-বউয়ের অলঙ্কার থেকে সংগ্রহ করা হল তখন সাবিত্রীপ্রসন্নের 'উপাসনায়' আমার ভাঙা নৌকার বন্দর। সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে প্রেস ও সরঞ্জামপাতি কিনে দিলেন। ওই ওয়েলিংটন লেনেই বাস নিয়েছি। এই সময় 'শনিবারের চিঠির' দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিস বসলেই 'শনিবারের চিঠি'র কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না; যাঁরা গাল খেয়েছেন তাঁরা জ্বলেন, যাঁরা খান নি, তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করেন। আমি অবশ্য একবার গাল তখন খেয়েছি। কিন্তু তবুও দুর্ভাগার দলেই আছি। একদা ইচ্ছা হল 'শনিবারের চিঠির' দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা! রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে শনিবারের চিঠির আপিস। সাবিত্রী এবং কিরণকে কিছু না বলেই একদিন বেরিয়ে গেলাম। মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ করে দাঁড়ালাম। চক-মিলানো বাড়ি, উঠানের চারি পাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ, চেয়ারে বসে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হল এই সজনীকান্ত, 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদকের মতো জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হল! এ কি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার! যাক গে! আমাকে দেখেই চোখ দুটো আরো খানিকটা বড় করে ভরাট গলায় প্রশ্ন করলেন—কি চাই?

পাতলা রোগা মানুষ—সদ্য জেল থেকে ফিরেছি—আরও রোগা হয়ে। ওজন তখন ১০২ পাউণ্ডে নেমেছে। সর্বাঙ্গে একটা কালো ছোপ পড়েছে। মনে হল লোকটি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। সভয়ে উত্তর দিলাম—আমি শ্রীযুক্ত সজনীকান্তবাবুকে খুঁজছি।

নাকের ডগাটা ফুলে উঠল—বললেন—আমিই সজনীকান্তবাবু! কি দরকার আপনার?

লেখক বলে পরিচয় দেবার মতো যোগ্যতা ছিল না, ভরসা পেলাম না; চট করে বললাম—আমার বাড়ি বীরভূম, আপনার দেশের লোক—একটু সাহায্যের জন্য এসেছি।

—কি সাহায্য—?

—আমি একটি প্রেস কিনব। ছোটখাটো—মফঃস্বলে কাজ করবার মতো প্রেস; আপনি নিজে প্রেস করেছেন, যদি এই কেনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন।

আরও কয়েকটা কথা বলে আমি চলে এলাম। দেখে এলাম সজনীকান্তকে। সেদিন যদি আমি সাহিত্যের কথার অবতারণা করতাম তবে নিশ্চয় সজনীকান্ত উত্তরে সেদিন বীরভূমের ধান-চালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন বলেই আমার ধারণা।

সজনীকান্তকে দেখে—প্রেস কিনে বোলপুরে প্রেস করলাম। বোলপুব কোর্টের পাশেই ছাপাখানা। চেক, রসিদ, আদালতের ফর্ম, ক্যাশ-মেমো, প্রীতি-উপহার ছাপি, একসারসাইজ বুকে কপিং-পেন্সিলে গল্প লিখি। 'উপাসনা'য় পাঠাই। ও দিকে সরোজ রায়চৌধুরী জেল থেকে ফিরে 'নবশক্তির' সম্পাদক পদ না পেয়ে, 'অভ্যুদয়' নামে সাপ্তাহিক পত্র বের করলেন, তাতে আমি আরম্ভ করলাম আমার দ্বিতীয় উপন্যাস—'পাষাণপুরী'। বোলপুরের ছাপাখানায় গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত আসতেন মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ বিপত্তি উপস্থিত হল ছাপাখানা নিয়ে।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত। রায়বেঁশে নিয়ে বীরভূমকে মাতিয়ে তুলেছেন। তিনি স্বর্গীয়—তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা না করাই ভালো। রায়বেঁশে নৃত্য, ব্রতচারী দল বাংলার সংস্কৃতিকে যেটুকু সমৃদ্ধ করেছে—তা স্বীকার করেও বলব যে সে দিন এই মাতনটি যাঁরা দেশকর্মী তাঁদের চোখে ভালো ঠেকে নি। এই মাতনটি সেদিন দেশের মানুষের দৃষ্টিকে কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এবং এই রায়বেঁশে বা ব্রতচারী আন্দোলন প্রচার করতে তিনি যে শাসকের প্রতাপ প্রয়োগ করেছিলেন—তাতেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে। হয়তো কোন একটি বা দুটি গ্রামে সংগৃহীত তহবিলের জোরে আজ কাজ চলছে —তবু মোটামুটি যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের হৃদয় হরণ করার মতো বস্তুরও অভাব ছিল। দত্তসাহেব বলেই তিনি খ্যাত ছিলেন, তাঁর

প্রতাপে ইস্কুলে-ইস্কুলে, গ্রামে-গ্রামে তখন রায়বেঁশে নৃত্যের ঢোল বাজতে লেগেছে—উকিল নাচছে, মোক্তার নাচছে, ডেপুটি নাচছে, সাব-ডেপুটি নাচছে, দারোগা নাচছে, চৌকিদার নাচছে, হাকিম নাচছে, আসামী নাচছে, রায়বাহাদুর নাচছে, রায়সাহেব নাচছে, জমিদার নাচছে, ধনী নাচছে, হেডমাস্টার নাচছে, সেকেণ্ডমাস্টার নাচছে, ছাত্র নাচছে—সে এক অত্যদ্ভুদ কাণ্ড। না নেচে পরিত্রাণ নাই। হাত ধরে টেনে এনে বলেন—নাচুন রায়বাহাদুর! তেমনি ছিল তাঁর অসহিষ্ণুতা। আই-সি-এস-সুলভ অসহিষ্ণুতা কি বস্তু যাঁরা জানেন—তাঁরাই বুঝবেন সে কথা।

রায়পুরের কংগ্রেসকর্মী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বা চট্টোপাধ্যায় দত্তসাহেবের একটি আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দত্তসাহেব বীরভূমে যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি পেয়েছিলেন সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মূর্তি, পট, দারুশিল্প; সে বোধ হয় ওয়াগন-ভর্তি জিনিস। রায়পুরে ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূর্তি, তিনি সেটিও সংগ্রহ করে আনেন। গ্রামের লোকে ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় নি। ব্যোমকেশ আনন্দবাজারে এই সম্পর্কে একটি নামহীন পত্র লেখে, পত্রখানি প্রকাশিত হয়। তাতে দত্তসাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম সন্দেহ করেন—পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নকে। তাঁকে বোধ হয় কিঞ্চিৎ শাসনও করেছিলেন। এবং নিজের প্রতাপে গ্রামের প্রসাদভিক্ষুকদের দিয়ে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদপত্র আনন্দবাজারে প্রকাশিত করালেন। ব্যোমকেশ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং রায়বেঁশে নিয়ে এক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আমাদের প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলে। তখন আমরা অর্থাৎ আমি বা আমার মেজভাই—কেউই বোলপুরে ছিলাম না। কম্পোজিটরদের দিয়ে ব্যোমকেশ ছাপিয়ে নিয়ে জেলাময় দিলে ছড়িয়ে। কবিতাটির প্রথম দু লাইন ছিল আমাদের জিলায় প্রচলিত একটি ছড়া—

আমার বিয়েয় যেমন তেমন
দাদার বিয়েয় রায়বেঁশে
আয় ঢকাঢক মদ খে-সে।

ব্যোমকেশ একটু বুদ্ধিহীনের কাজ করেছিল। আমার অনুপস্থিতিতে ছাপানো

তার অন্যায়ও হয়েছিল এবং নির্বুদ্ধিতার কাজও হয়েছিল। আমি থাকলে ছেপে দিতাম, দাম নিতাম না এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানিতে ছাপাখানার নামও দিতাম না। কম্পোজিটর কোন সন্দেহ করে নি; ছেপে প্রেসের নাম দিয়েছিল এবং ফাইলে তার কপিও রেখেছিল। ওদিকে দত্তসাহেবের হাতে কাগজখানা পড়তে দেরি হল না। দত্তসাহেব জ্বলে উঠলেন। বিশেষ পুলিশ-কর্মচারী এল বোলপুর, প্রেস খানাতল্লাস হল, কাগজখানাও বের হল। কম্পোজিটরসমেত থানায় গেলাম। বললাম এ কবিতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কম্পোজিটর বেচারী বিনা ধমকেই বলে দিলে রায়পুরের ব্যোমকেশবাবু ছেপে নিয়ে গিয়েছেন, বিয়ের প্রীতি-উপহার বলে। এখন ওই কাগজখানার বলে কিন্তু কোন রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করা যায় না। এবং আমাদেরও গ্রেপ্তার করা যায় না। থানা থেকে ফিরে এলাম। বিশেষ পুলিশ-কর্মচারীটি চলে গেলেন—দত্তসাহেবকে বিবরণ নিবেদন করতে। কয়েকদিন পরেই এল নোটিশ। আমাদের উপর নোটিশ এল দুহাজার টাকা জামানত দিতে হবে। এবং ব্যোমকেশের উপর নোটিশ এল ১৪৪ ধারার। কোন সভায় সমিতিতে বক্তৃতা দিতে পারবে না, এক সঙ্গে চারজনের বেশী পাঁচজনের অর্থাৎ পঞ্চায়েত বৈঠকে যোগদান করতে পারবে না—কারণ তাতে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। এর ফল, আগে ব্যোমকেশের কথা বলব যদিও ব্যোমকেশের ঘটনাটা আমাদের পরিণতির অনেক পরে ঘটেছিল। ব্যোমকেশ সতর্ক হল। ঘরের ভিতর সে আশ্রয় নিলে। এই কারণে সে জেলে যেতে চায় না। এমন সতর্ক হল যে দারোগা কোনক্রমে ব্যোমকেশের নাগাল পায় না। ওদিকে দত্তসাহেবের হুমকি আসে, কি হল? কোথায় ব্যোমকেশ?

দারোগা বলে, হুজুর তাকে কোন রকমেই পাচ্ছি না।

দত্তসাহেব বলেন, তাকে আমার চাই-ই!

দারোগা ব্যোমকেশকে বুঝিয়ে বলে, একবার চলুন, কোন রকমে মার্জনাভিক্ষা করে আমায় বাঁচান, আপনিও বাঁচুন।

ব্যোমকেশ আগে জেল খেটে এসেছে, সে পাকা কাঠের মতো শক্ত। স্বল্পভাষী, মৃদু হাস্যময়, ব্যোমকেশ কথা বলে না, শুধু হাসে। চাপাচাপি করলে

শুধু হাত জোড় করে। শেষ পর্যন্ত বললে, আপনি বাঁচুন কোন রকমে। যে রকমে পারেন। এতে আমার ফাঁসি হবে না, স্থতরাং আমি মরব না। জেলখাটা আমার অভ্যাস আছে।

তাই হল। পুরানো অভ্যাসটা শেষ পর্যন্ত ঝালিয়ে নিতেই হল ব্যোমকেশকে। দত্তসাহেবের চাপে দারোগা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে একদিন পাঁচ-সাত জন লোক আড়ালে আবডালে রেখে একজনকে পাঠালেন তাকে ডাকতে। সে বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ!

—কে?

—শোন হে একবার।

সাবধানী ব্যোমকেশও এতখানি সন্দেহ করে নি। সে উঁকি মেরে দেখল, একজনই রয়েছে রাস্তায় এবং সে লোকটি বিশেষ পরিচিত। কোন সন্দেহ না করেই সে পথে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে অলিগলি থেকে বেড়িয়ে এল আট-দশ জন। ঘিরে ফেললে তাকে। পুলিশও এল সঙ্গে সঙ্গে! আর কি? আইনের ধারায় আছে জনতা চারজনের বেশী হলেই অপরাধী হবে ব্যোমকেশ। অপরাধী ব্যোমকেশ চালান গেল। ছমাস জেল হয়ে গেল। তবু তো দত্ত-সাহেব তাকে আনন্দবাজারের পত্রলেখক বলে জানতেন না। জানলে কি হত বলতে পারি না।

আমাদের ব্যাপারটা আগেই ঘটেছিল।

মামলা কিছু হয় নি। তলব হল। তিরস্কৃত হলাম। কিন্তু জামিন বা বণ্ড কি দেব স্থির করতে পারলাম না। সময় নিলাম।

ঠিক এই সময় একদিন শুনলাম, নেতাজী স্থভাষচন্দ্র এসেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে। যতদূর মনে পড়ছে, সংকট-ত্রাণ সমিতি নাম নিয়ে যে একটা অপ্রিয় আলোচনা হয়েছিল, সেই নিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন। বেলা তিনটেয় তখন বোলপুর স্টেশনে আপ-ডাউন দুখানি ট্রেনের ক্রসিং হয়। তিনটেয় বোলপুরে চাপলে সাড়ে সাতটা আটটায় হাওড়া পৌছানো যায়। আমাদের বাড়ি লাভপুরে যেতেও আপ ট্রেন-খানি সবচেয়ে স্থবিধের। আমি বোলপুর থেকে বাড়ি ফিরছি। আপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একখানি গাড়ি এসে থামল স্টেশনের বাইরে।

সুভাষচন্দ্র দীপ্তিমান তারুণ্যের জীবন্ত মূর্তি—চারিদিক যেন উদ্ভাসিত করে নেমেই ওভারব্রিজ পার হয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার ইচ্ছা হল, দেখা করি। কিন্তু সন্দেহ হল, চিনতে পারবেন কি? কি বলব? কি পরিচয় দেব?

হঠাৎ চোখে পড়ল, সুভাষচন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম, চিনেছেন—স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করেছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে মানুষ বিচরণ করেন, সমগ্র দেশ যাঁর চিন্তার ক্ষেত্র, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, স্বপ্নে যিনি বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করেন, তাঁর পক্ষে আমার মতো অতি সাধারণ চেহারার একজনকে একবার পনের-বিশ মিনিট দেখেই কি মনে রাখা—চেনা সম্ভবপর? দেখলাম, সম্ভবপর। প্রতিভা—অতিমানবের শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান তাঁরা তা পারেন। এই শক্তি দেখেছি রবীন্দ্রনাথের। সে কথা যথাস্থানে বলব। আর আমি বিলম্ব করলাম না। ডাউন প্ল্যাটফর্মে গেলাম, নমস্কার করে দাঁড়ালাম।

তিনি তখন স্মৃতি মন্থন করে আমার নাম ঠিক ধরেছেন। বললেন, আপনি তারাশঙ্করবাবু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে? কি করেন এখানে?

বললাম সংক্ষেপে—প্রেস করেছি এখানে। তিনি বললেন, ভালো। প্রেস চলছে কেমন?

এবার বললাম, চলছিল কোন রকমে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, বন্ধ করব কি চালাব।

—কেন?

বিবরণ বললাম। তাঁর আশ্চর্য শুভ্র চোখ দুটি দপ করে যেন জ্বলে উঠল। সে সত্যিই জ্বলে ওঠা। এমন ভাবে চোখ জ্বলে ওঠা আমি আর কারও দেখি নি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, না। বন্ধ করে দিন। বণ্ডও দেবেন না, জামিনও দেবেন না।

স্থির হয়ে গেল পথ।

প্রেস বন্ধ হল। গোরুর গাড়ি করে লাভপুরে এনে ফেললাম।

এদিকে হঠাৎ আমার প্রিয়তমা কন্যা বুলু মারা গেল। আমার জীবনে নেমে এল প্রথম অঙ্কের যবনিকা।

(৯)

হঠাৎ আমার ছ-বছর বয়সের কন্যা বুলু মারা গেল।

আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবন-প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা—তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধ হয় তা হত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না পড়তাম, তবে বেদনা-রসকে উপলব্ধিই করতে পারতাম না।

আমার গল্প-উপন্যাসের কয়েক ক্ষেত্রেই বুলুকে হারানোর বেদনার কথা আছে। 'বেদেনী' গল্প সংগ্রহে 'রাণী মা' গল্পের মধ্যে স্পষ্ট করেই বলেছি। "রাণীর আগে একটি মেয়ে ছিল। কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম বুলবুল। বুলবুল সংক্ষিপ্ত হইয়া শেষে বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি, অদ্ভুত অপূর্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালোবাসিতে পারে, শোকের নির্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি মানুষ করিতে পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মতো হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তঃস্থলের শস্য-পানীয়ের অমৃত স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

"কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, বোধ করি, যে সুখকে মানুষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আক্ষেপ করে, তার চেয়েও স্বল্পক্ষণস্থায়ী। শোক আস্বাদে

অতি তীব্র অপূর্ব, তাব প্রভাব অতি-অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার কবে, পঙ্কিল হীনতাব উর্ধ্বলোকে লইযা যায, তাই শোক অল্পক্ষণস্থায়ী।"

এ গল্প বুলুব মৃত্যুব ছ-সাত-মাস পবেব লেখা। বুলুব মৃত্যুব অব্যবহিত পবে আমাব সত্যকাব সাহিত্য-জীবনেব শুরু যে গল্পে সেটিব নাম—'শ্মশান ঘাট।' বিসয়বস্তুতে ভাববনে 'ই বেদনা এই কথাই মাখামাখি হয়ে গল্পটি গডে উঠেছে। তাব মধ্যে কন্যাহাবা উদাসী নায়কেব যে অন্তব-বেদনা ফুটে উঠেছে সে আমাবই বেদনা। সংসাবেব সঙ্গে সকল বন্ধন আমাব কেটে গেল ছিঁডে গেল—এই আঘাতে।

'শ্মশান ঘাট' গল্পটিব সূচনা কিন্তু বুলুব মৃত্যুব আগেই হয়েছিল। তখন আমি পিঠে বোঁচকা বেঁধে গ্রামে-গ্রামে ঘুবি। কংগ্রেস ছেডেছি, দেশোদ্ধাব নয, তবু ঘুবে বেডাই। মেলা দেখি, গ্রাম দেখি, ঘুবি। পূব-জীবনেব অভ্যাসটা নেশায দাঁডিযে গেছে। এই নেশাতেই বুলুব মৃত্যুব দিন পনেবো আগে গিযেছিলাম উদ্ধাবণপুব।

সেখানেই সেই বিচিত্র পবিবেশ দেখে ওই পটভূমিতে গল্প শুরু কবেছিলাম। শুধু শুরুই অবশ্য। উদ্ধাবণপুব বাজাবেব কুম্ভকাব পাল কর্তা, মাদুর-বুনিয়ে শ্রীমতী মেযে কুসুম, তাদেব সন্ধ্যাব রূপকথাব আসরে কুকুর ছানাটির আবির্ভাব, কেনাবাম নামক উদাসী ব্যক্তিটিব বক্তৃতা, ওই কুকুব ছানা দিতে যাওয়া, দ্বিজদাসেব কানা টাকা পাওয়া, শ্মশান ঘাটেব পৈরু—তার ছোটমেযে, চিতায় সেই ছোটমেযেটিব শবদাহ, সবই সত্য। প্রথম অংশটি সেখানেই লিখে-ছিলাম। এই পটভূমিতে কোন গল্প গডে উঠবে, সে কল্পনা দানা বাঁধে নি। বুলু চলে যাওযাব আঘাত না পেলে অন্য বকম কিছু হত। পথে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। বামজীবনপুবে একখানি গোয়ালঘবেব কোঠায আশ্রয় পেয়েছিলাম, সমস্ত রাত্রি মশার কামডে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছিল; সেখানে এক বাবাজী সমস্ত রাত্রি গান শুনিয়েছিল, পথে তুটো মহিষের প্রচণ্ড যুদ্ধে আটক পডেছিলাম, ছুটে পালাতে গিয়ে এক পাটি জুতো হারিয়েছিল; উদ্ধারণপুরেই জেলে ডিঙিতে জেলেদের সঙ্গে গল্প করেছিলাম; তারা নিজেদের মধ্যেই মাছ চুরি করে ঝগড়া করেছিল। স্নানঘাটে এক পিতৃহারা শৌখীনবাবু পুত্র দেখেছিলাম, তার সে কি

অপূর্ব কান্না দেখেছিলাম ; পিতার শেষ কৃত্য করে গঙ্গার ঘাটে এসে প্রচুর মদ্য পান করে কাঁদছে আর খেদ করছে, এমন বাবা আর হয় না। আমার জন্যে জমি জমিদারি পুকুর বাগান টাকা তেজারতি রেখে আমাকে অনাথ করে চলে গেল। এমন বাবা কারোও হয়? না হয়েছে? না হবে? টেরি না কাটলে আমার খাওয়া রোচে না, ঘুম আসে না, সেই জন্যে বাবা আমার শেষ সময়ে অনুমতি করে গেল—বাবা তুই যেন মাথা কামাস নে! মাথা কামালে স্বর্গে গিয়েও আমার চোখে জল আসবে। এমনকি পুরুতকে ডেকে বলে গিয়েছেন সে কথা!

এরপরই গঙ্গার ঘাটে শুয়ে বাবাগো বলে আকাশ ফাটিয়ে কান্না। ঘণ্টখানেক পরে দেখা যায অচেতন হয়ে পড়ে আছে মুদীর দোকানের পাশে ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায়। হয়তো এই সমস্ত কিছুর একটা নিয়ে গল্প শেষ হত, তখনকার দিনের সাহিত্যের প্রচলিত ভাবধারায় সমাজ ও মানুষের বিকৃত রূপকে ফুটিয়ে তুলে তার উপর কশাঘাত বা খড়্গাঘাত যে কোন আঘাত দিয়েই গল্পটি শেষ হত। কিন্তু আমার হৃদয়ের সেদিন অবস্থা অন্যরূপ; বেদনায় ক্ষত বিক্ষত। তাই বেদনাই উঠল বড় হয়ে। এবং সেই সময়েই একটা উপলব্ধি আমার হয়েছিল। বিকৃত মানুষ বিকৃত সমাজ ওই বিকৃতির পীড়ায় কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করে। বাল্যকালে পাটনার পাগলখানায় এক বালক উন্মাদকে দেখেছিলাম, সে নর্দমার পাঁক গায়ে মাখত এবং সেই জল সে আঁজলা ভরে ভরে পান করত; কিন্তু ওই জল পান করবার সময় তার সে কি মুখবিকৃতি; কত কষ্টে সে যে সেই জল খেত তা দেখলেই বুঝতে পারা যেত। এই বেদনায় হৃদয় ভরে উঠেছিল বলেই কবি বলতে পেরেছেন—

'কার নিন্দা কর তুমি? এ তোমার এ আমাব পাপ!'

বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ, রাত্রে। রাত্রি দশটায়।

শেষ সময়টা এল অতি আকস্মিক ভাবে। ডাক্তার সকাল বেলা বলে গেলেন, কাল অন্নপথ্য দেব। বিকেল বেলা সাড়ে চারটের সময় ডাক্তার আমাদের পাড়

এসেছিলেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে আমি বললাল, যখন পাড়ায় এসেছেন একবার দেখে যান। তিনি হেসে বললেন, না। দরকার নেই। অকারণ দুটো টাকা দণ্ড করাব না আপনার।

তখন আর্থিক অবস্থা আমার অত্যন্ত অসচ্ছল। ১লা অগ্রহায়ণ অষ্টম পর্ব গেছে। জমিদারির সঙ্গে কিছু পত্তনি সম্পত্তি ছিল, তার দরুন খাজনা জমা দিতে হয়েছে। কার্তিক মাসে খাজনা আদায় হয় না। সুতরাং দিয়ে থুয়ে হাত রিক্ত। ডাক্তার এসব বুঝতেন। আমাদের অবস্থাও জানতেন। বললেন, কাল ভাত দেব। ভালো আছে। এই কথা বলতে বলতেই ডাক্তারের সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। তারপর বাড়ি ফিরলাম; ভাবলাম, কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হই নি, বেড়ানো হয় নি, আজ একবার বেড়াতে যাব। গায়ে জামা দিয়ে বের হব, হঠাৎ ইচ্ছে হল, বুলুকে একটু আদর করে যাই। পাশে বসে কপালে হাত দিয়েই কেমন মনে হল। যেন বড্ড ঠাণ্ডা মনে হল; এবং অত্যন্ত স্তিমিত মনে হল। হাতখানা ধরেই চমকে উঠলাম। আঙুলগুলি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে যেন কেটে যাচ্ছে। অস্থির চঞ্চল—যেন ইতস্তত ধাবমান। কাউকে কিছু না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। তারপর মৃত্যুতে মানুষে টানাটানি। মানুষ বলে যেতে নাহি দিব! কিন্তু 'তবু হায়, যেতে দিতে হয়!'

চলে গেল বুলু।

শেষ মুহূর্তের কিছু আগে টাকার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কোন অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে পাওনা টাকা চেয়ে পাঠালাম। কিন্তু সে তিনি দিলেন না।

সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল এ রাত্রি কোনকালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি। শুধু ঘরের মধ্যে থেকে মধ্যে মধ্যে

সাড়া পাচ্ছিলাম একটি আর্ত নারীকণ্ঠের। তখন মনে হচ্ছিল আর-একজন আছে। এর মধ্যে সে আর আমি।

পরের দিন সূর্য উঠল। আলো হল। কিন্তু আমার তখন অধীর অস্থির অবস্থা। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই! কোথায় যাই! বাল্যকালে আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। তখন কি আঘাত পেয়েছিলাম সে আঘাত অনুভব করার মতো স্পর্শশক্তি হয় নি আমার মনের। তারপর এই প্রথম আঘাত, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। অসহ্য তীব্র বেদনায় ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে। দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই কাজ আছে বলে কলকাতা চলে এলাম। হাওড়ায় যখন পৌঁছুলাম তখন যেন জ্বর আসছে মনে হল। স্টেশন থেকে এসে উঠলাম 'উপাসনা' আপিসে, ধর্মতলা স্ট্রীট। এসে দেখি অভাবনীয় ব্যাপার। 'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিচ্ছেন। 'উপাসনা'র স্থানে 'বঙ্গশ্রী'র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সজনীকান্ত দাস আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। চারিপাশে অনেক লোকের ভিড়। কিরণ রায় পুরাতন এবং নতুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন সজনীকান্তের কাছে। স্বল্প দুটি কথা বলেই সজনীকান্ত ভিড়ের মধ্যে মধ্যমণির মতো জেঁকে বসলেন। আমি পাশের ঘরে সাবিত্রীপ্রসন্নের কাছে গিয়ে বসলাম। তারপর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে বের হলাম, যাব বালীগঞ্জে, আত্মীয়ের বাড়ি। ট্রামে বা বাসে ছোট বিছানা এবং টিনের স্যুটকেস নিয়ে উঠে বসলাম। এর পর কি মনে করে কখন কি করেছি খেয়াল নেই; যখন খেয়াল হল তখন আবার আমি ট্রেনে। লাভপুর ফিরছি। সেদিন কলকাতা থেকে পালিয়েছিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই, সংসারের প্রতি স্নেহ-মমতার থেকেই মানুষ সন্ধান করে সান্ত্বনার। প্রীতির মানুষ, স্নেহের মানুষ, মমতার মানুষ দুঃখের ভাগ নিলে মনে হয় একজনের অতীতেই দেউলে হয়ে যাই নি, ফকির হয়ে যাই নি! সেদিন 'বঙ্গশ্রী'র আসরে তরুণ নবীনদের উল্লাস সমারোহের মধ্যে সে তো আমার পাবার কথা নয়! তখন আমি তাঁদের অধিকাংশের কাছেই অপরিচিত; এবং সাহিত্যসেবী হিসেবেও অখ্যাত। একমাত্র সাবিত্রীপ্রসন্ন সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন সেদিন মুহ্যমান। তাঁর রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে গড়া 'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে। গোটা প্রতিষ্ঠানটা থেকেই তাঁকে পরের

মতো সরে যেতে হচ্ছে। সেদিন দেশে ফিরে যে বৈরাগ্য অনুভব করেছিলাম তাতে সাহিত্যসাধনার সংকল্পও কাটাঘুড়ির মতো যেন ভেসে যেতে চেয়েছিল।

ঠিক এর কয়েকদিন পরেই আমার ভাগ্যে ঘটল কবি-সন্দর্শন।

শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে হল পল্লী-কর্মী সম্মেলন। স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ ছিলেন এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী। জীবনের প্রথম থেকেই স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটি যোগসূত্র ছিল। কলেরায় সেবাকর্মের কারণেই এ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের সেবা-সংঘের কাজ তিনি অনেকবার দেখে গেছেন। খুশী হয়েছেন। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। তিনি বিশেষ করে লিখলেন আমি যেন আসি। সে সস্নেহ আহ্বান ঠেলতে পারলাম না। শোকের তীব্রতা তখন কমেছে, সে তখন গভীর এবং সুপ্রসারিত প্রসারে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বেদনাহত মন নিয়েই গেলাম শান্তিনিকেতন। সেখানে সম্মেলনশেষে শুনলাম, কবি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সন্ধ্যার সময়; উদয়নের একটি ঘরে মেঝের উপর বিছানো সতরঞ্চির উপর আমরা বসলাম, বসেছিলাম পূর্বমুখী হয়ে; সামনেই ছোট চৌকির উপর কবির আসন। বড় বড় দুটি দীপদানে আলো জ্বলছিল। আমাদের দলের সকলে আমাকেই দিলেন সামনে; কথা বলবার ভার আমার উপরেই পড়ল। স্পন্দিত বক্ষে বসে রইলাম। কবি তখন একটি কোন বক্তৃতা রচনা করছিলেন। বোধ হয় কমলা লেকচার। যাই হোক, কবি এলেন, এসে আসন গ্রহণ করলেন।

কালীমোহনবাবু পরিচয় দিলেন আমার। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, সাহিত্যিকও বটেন।

কবি স্মিতহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, লাভপুরে সাহিত্যের চর্চা আছে। ভালো অভিনয়ও হয় সেখানে।

এরপর আমি অপর সকলের পরিচয় দিলাম।

কবি আমাদের আশীর্বাদ করলেন, পল্লীর পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে বললেন, গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।

মহাকবির উপদেশ কালে পরিণত করব বলেই ঠিক করেছিলাম সেদিন; রাজনীতির পথে নয়, সেবার পথে। কিন্তু তাও পারলাম না। তখন যেন আমার জীবন কোন কিছুতেই বাঁধা পড়তে চাইছিল না। বুলুর মৃত্যুর আঘাত জীবনে যেন সমস্ত বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়েছিল। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো আমার জীবন ছুটে চলতে চাইছিল। লাভপুর থেকে পালিয়ে এলাম কলকাতায়—আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা দুয়েক পরে ট্রেনে চেপে বসলাম; সেদিন আমার জ্বর ছিল, জ্বরের ঘোরের মধ্যেও এই বাঁধন-ছেঁড়া মনের গতিটি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু জ্বরজর্জর মনের অবস্থাটি অস্পষ্ট;—ঠিক মনে পড়ছে না। তবে অনুমান করতে পারি যে, আমার তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসরের জীবনে যে পথের সন্ধান আমি করেছি সেই পথের জন্য মন আমার সেদিন হাহাকার করে উঠেছিল, যেটা চাপা ছিল, বাঁধা ছিল—সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধের পাথরে মায়া-মমতার দড়িতে, সন্তানশোকের ঝড়ে-তুফানে সে সব ছিঁড়ে গিয়েছিল।

আজ পরিণত বয়সে হিসাব-নিকাশ করতে বসে এর মূল্য এবং স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়েও গোল বাধে। প্রশ্ন জাগে—সত্য করে কি চেয়েছিলাম! এর উত্তর সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই; এখানে আমি চিরকালের উত্তরকে মানি;—চেয়েছিলাম যা আদিকাল থেকে—যে কাল থেকে মানুষ জন্তুজীবনের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মন পেয়েছে—সেই মনে মনে যা চেয়ে এসেছে মানুষ—তাই চেয়েছিলাম; এবং সে হল পরম তৃপ্তি, যার অপর নাম শান্তি। কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন আসে—তা হলে শান্তি কি—প্রতিষ্ঠা, যশ খ্যাতি? আমার সেই তেত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজনীতির পথে, সাহিত্যের পথে, সেবার পথে, খেলার পথে, অভিনয়ের পথে—ধনসম্পদের পথে—ওই প্রতিষ্ঠাকেই কি কামনা করি নি! সুখ—যে সুখ অর্থমূল্যে পাওয়া যায় সংসারে, ভোগ্য বস্তু যা এনে দেয়—তা আমি চাই নি। এ বিষয়ে আমার মন পরিচ্ছন্ন, সংশয়হীন—কারণ তখনও পর্যন্ত

লিখে পারিশ্রমিক একটি কপর্দকও পাই নি। এবং অশ্বিনী দত্ত রোডের উপর শরৎচন্দ্রের বাড়ি তখনও হয় নি। শরৎচন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠাবান হয়ে উঠব এমন কল্পনাও কোন দিন মনে উঁকি মারে নি এ কথা শপথ করেই বলতে পারি। এ ছাড়াও একটা জোরালো, প্রায় অকাট্য প্রমাণ আছে এ বিষয়ে। আমাদের গ্রামের স্বর্গীয় যাদবলালবাবু সম্পদ অর্জনের একটা রাজপথ তৈরী করে গিয়েছিলেন; কয়লার ব্যবসার পথ: এ পথে যাত্রা শুরু করলে অর্থাগম ছিল সুনিশ্চিত। আমাদের গ্রামের এবং আশেপাশের বহুজনই এ পথের পথিক হয়ে মহাজনত্ব অর্জন করে গেছেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে যতীনদাস রোডে আমাদের ও অঞ্চলের কৃতী কয়লা-ব্যবসায়ীদের তিনতলা বাড়ি উঠছে এবং উঠেছে সারি সারি। আমার প্রথম জীবন থেকে আমার শ্বশুরদের আমাকে এই পথে টানাটানির বিরাম ছিল না। কিন্তু কিছুতেই এ পথে চলতে আমি কোনো আকর্ষণ বোধ করি নি, কোন তৃপ্তি পাই নি, বারবার পালিয়ে গিয়েছি।

অর্থ, ভোগ, সম্পদ কামনা করি নি—এ পথে। আমি কেন—বাংলা সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টায় যাত্রা শুরু করেছিলেন—তাঁরা কেউই করেন নি—এ কথা সুনিশ্চিত। যাঁরা বেঁচে থাকবার মতো উপকরণ সংগ্রহের জন্য মাসিক যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দাবি মনে মনে পোষণ করতেন—তাঁদের সম্পদলোভী যে বলবে সে নিতান্তই নিন্দুক, ইতর। সম্পদের কথা ওঠেই না। কিন্তু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কামনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। শান্তি কি তার মধ্যেই আছে? এত কালের জীবনে শান্তি পাই নি—তবে আভাসে অনুভব করেছি—আছে। রচনাকালে তন্ময়তার মধ্যে তাকে বোধ করি সকল লেখকই পান। তন্ময়তা ভঙ্গ হলেই চকিতে গাঢ়তম অন্ধকার গুহায় আলোর আবির্ভাবে বহির্জগতের আবির্ভাবের মতো দ্বন্দ্বময় জগৎ প্রকট হয়ে ওঠে। রচনাকাল ছাড়াও এক-এক সময়ে তাকে পাওয়া যায়। কেউ পান নির্জন প্রকৃতির বিচিত্র আয়োজনময় পরিবেশের মধ্যে। আমি অনেক সময় পেয়েছি মানুষের বহু সমাবেশের মধ্যে। কি ভাবে কেমন করে এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছি জানি না—তবে এ কথা সত্য যে, বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে—আমি মহা অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি; সবল পুরুষকে মনে হয়েছে

আকাশ-অভিসারী বনস্পতি, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে বেড়ে উঠবার চেষ্টা করছে ; নারীকে মনে হয়েছে পুষ্পিতা লতা। উদ্ভিদ-লোক থেকে মানবজন্মে জীবনের অভিসারের কথা ভাবি, ভাবি বলেই মনে হয় উদ্ভিদময় জগৎ থেকেও মানুষের সমাবেশের মধ্যে সুন্দরের অধিষ্ঠান অধিকতর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

মানুষের জীবনে চরম কাম্য শান্তি—সে শান্তি মেলে বোধ করি এই বনস্পতির আলোকাভিসারে—ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলার পথের মতো বেড়ে ওঠার পথেই। অকস্মাৎ একদিন আসে যে দিনকার বেড়ে ওঠার কামনা তৃপ্ত হয়ে যায়—শান্ত হয়ে যায় ; সে দিন সে ফুল ফোটানো পর্যন্ত শেষ করে দিয়ে আলোকস্নান করে যায় পরমানন্দে। এই ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলাটাই বনস্পতির যেমন পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ, মানুষেরও তেমনি প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেড়ে ওঠাই পূর্ণ আত্মবিকাশ। সেদিন এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের মূলকে প্রসারিত করে দিয়ে এই ক্ষেত্রের যে সামান্য রসটুকু আহরণ করতে পেরেছিলাম—স্বাদে তাকেই মনে হয়েছিল অমৃত—পুষ্টিশক্তিতে তাকেই অনুভব করেছিলাম প্রাণদা।

বুলুর মৃত্যু ছাড়া আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে লাভপুরের সমাজ-জীবন আঘাতে আঘাতে আমাকে জর্জর করে তুলেছিল ; প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে উঠল—ওখানকার ধনসম্পদে-রাজসম্মানে শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী বাড়ির সঙ্গে। তাঁরা আবার আমার নিকট সম্পর্কে আত্মীয়, আমার মামাশ্বশুর। যাঁরা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতিকথা—'আমার কালের কথা' পড়েছেন—তাঁরা এই ঘটনাটির মধ্যে অনেক কিছু খুঁজে পাবেন। আমাদের গ্রামের কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় জীবনে কৃতী ব্যক্তি। ওই শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী বাড়ির নিকট জ্ঞাতি-বাড়ির ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী। সেই হিসাবে তাঁদের আত্মীয়ও বটেন। অন্যদিকে ওই বাড়ির কর্তাদের মাসতুত ভাই স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাইও বটেন কালীকিঙ্করবাবু। সে হিসাবেও নিকট আত্মীয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা জীবনের প্রথম থেকেই একটি যেন বিষ সম্পর্কের সূত্র ছিল উপরের পুষ্পশোভার মর্মস্থলে। ক্রমে ক্রমে জীবনের অগ্রগতি

সঙ্গে মালার ফুল বাসি হয়ে যত শুকিয়ে এল ততই প্রকট হল এই প্রচ্ছন্ন বিষম সূত্র। নানা ছুতায় এই সূত্রটি জীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে হল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। বাদে-প্রতিবাদে বিশেষ করে সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রে সমালোচনায় নিন্দায় প্রতিবাদে, সরকারীভাবে প্রতিবাদমূলক দরখাস্তের পথ ধরে বেড়েই চলেছিল। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। কালীকিঙ্করবাবু মেয়ের বিয়ে দিলেন—এক বিলেতফেরত ছেলের সঙ্গে। বিবাহটি হল কলকাতায়। লাভপুরে ঘটলে ওই বিবাহের দিনেই যে কি ঘটত জানি না।

কলকাতায় বিবাহ হল। লাভপুরে তার প্রতিক্রিয়া হল। আমি নিজে লাভপুর সম্পর্কে যতটা জানি তাতে এই ঘটনায় লাভপুরে কোন আবর্ত সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। লাভপুরের সমাজ সে কাল পার হয়ে গিয়েছিল তখন। ওই প্রতিপত্তিশালী বাড়িতে তো কোন প্রতিবাদ ওঠার কথাই নয়। জাতিতে ইংরেজ থেকে শুরু করে বিলেতফেরত রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁদের নিত্য মেলামেশা, এক টেবিলে এক আহার্য খাওয়া, হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে কঠিন থেকে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করা তাঁদের নিত্যকর্মপদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত। সভায় সমিতিতে সকল প্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযান চালিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁরা বেঁকে বসলেন। সুর উঠল প্রথম অন্তঃপুরে। সেই সুরে ভাষা যখন ফুটল তখন শুনলাম বিলাতফেরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া সমাজবিরোধী কর্ম। এই বিবাহ দেওয়ার দরুন সমাজে অপাংক্তেয় হয়েছেন তিনি।

আমি আশ্চর্য ভাবে প্রথম থেকেই এতে জড়িয়ে গেলাম। নাটকীয়ভাবে ঘটল ঘটনাটি। একদিন বিকেলবেলা বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আমাদেরই চণ্ডীমণ্ডপ পার হয়ে যাচ্ছি। দেখলাম এক বিচার-সভা বসেছে। বিচারকেরা সকলেই মাতৃস্থানীয়া, তাঁদের মধ্যে প্রধানা ওই প্রতিপত্তিশালী প্রগতিশীল বাড়ির একজন। যিনি অভিযুক্ত তিনি আমাদের অতি নিরীহ পুরোহিত। তিনি নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবশ্য প্রথমটা ওদিকে লক্ষ্য না করেই চলে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম তিথি-নির্ণয় বা পূজাপার্বণ সম্পর্কীয় কোন আলোচনা চলছে পুরোহিতের সঙ্গে। হঠাৎ প্রধানা আমাকে ডাকলেন। বললেন, তারাশঙ্কর, তোমাদের পুরোহিত যে ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করলেন

তার প্রতিবিধান কর। পুরোহিতই যদি ধর্মহীন হন তবে সমাজে ধর্ম থাকে কি করে?

বিস্মিত হলাম। আমাদের এই পুরোহিতটি সত্য সত্যই ভালো মানুষ ছিলেন। এবং মূর্খ ছিলেন না; আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি কি করলেন?

বললেন—বিলাতফেরতের সঙ্গে বিবাহে কন্যাদানে পৌরোহিত্যের কথা তুমি শোন নি? ওঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বল, নইলে ওঁকে পরিত্যাগ কর।

কথা শুনে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

পুরোহিত বেচারী এতগুলি সম্পন্ন অবস্থার যজমান চলে যাওয়ার ভয়ে বিকৃত হয়ে নির্বাক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনারা যদি বিলাত যান, বিলাতফেরতের সঙ্গে করণ-কারণ করেন তবে আমরা ক্রিয়াকর্ম আপনাদের ছাড়ব কি করে? আপনাদের নিয়েই আমরা। যদি সকলে বলেন তবে করব প্রায়শ্চিত্ত। আপনাদের তো ছাড়তে পারব না।

এবার আমি বললাম—ভটচাজ মশায়, আপনি যদি প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে আমি আপনাকে পুরোহিত হিসাবে ত্যাগ করব। পতিত করার কথা আমি ভাবতেই পারি না, কিন্তু পুরোহিত হবার মতো দৃঢ়তা আপনার নেই বলে পুরোহিত হিসাবে আপনাকে আর নেব না।

সকলে চমকে উঠলেন। একজন দেশসেবক সদ্য জেলফেরত ব্যক্তির মুখে এ কি কথা!

আমি বললাম—বিলাত যাওয়ায় পাতিত্য ঘটে জাতিচ্যুতি ঘটে এ সংস্কারকে আমি মানি না। সুতরাং পুরোহিত মশায় কোন অন্যায় কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি না। অন্যায় না করে যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি দুর্বল। তাঁর দ্বারা পৌরোহিত্য হয় না। এই শুরু হল।

সমাজের মধ্যে সম্পদশালী যাঁরা, রাজশক্তি যাঁদের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা কি এত সহজে দমিত হন? তাঁদের বাসনা কি এক কথায় সংযত হয়? এরপর সত্যকারের কাজ শুরু করলেন এই দিকে। ওঁদেরই বাড়ির কর্মচারী এবং বেশ সম্পন্ন একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের পৌত্র এবং দৌহিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে দুইপক্ষে পরামর্শ

করে স্থির করলেন এই ক্রিয়ায় পুরোহিতকে বর্জন করবেন এবং কালীকিঙ্করবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাদ দেবেন।

পুরোহিত এসে আমাকে সংবাদ দিলেন। কালীকিঙ্করবাবু কলকাতায় থাকেন, বাড়িতে থাকত তাঁর ভাগিনেয়। সে কিন্তু এল না, আসতে তার দ্বিধা হল। এ সময় পর্যন্ত কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটুকু নিতান্তই সামাজিক; তাঁর সঙ্গে অন্তরের কোন যোগ ছিল না বললেই সত্য বলা হবে। আমার কাছে আদর্শবাদই বড়। কালীকিঙ্করবাবু গৌণ। সুতরাং কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় আমার কাছে না আসা আমার চোখেই পড়ল না। আমি প্রবীণ ভদ্রলোকটির কাছে গেলাম। পাত্রবিধি আলোচনা করলাম না, তর্ক করলাম না, সোজা বললাম পুরোহিত এবং কালীকিঙ্করবাবুদের বর্জন কবলে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না, বর্জন করব এবং আমার যাঁরা অনুগামী তাঁদেরও বলব আপনার বাড়ির নিমন্ত্রণ বর্জন করতে।

ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। ১৯৩২।৩৩ সালে আমার অনুগামী অনেক। তিনি স্বীকার করলেন, তিনি মনে মনে বিলাতফেরতের সঙ্গে করণ-কারণ অনুমোদন না করলেও কালের গতিকে বড় বলে মেনে এ নিয়ে কোন বাদ প্রতিবাদ তুলতেন না। কিন্তু—।

এবার সংবাদ পেলাম ওই শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী ঘরের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে ওই শ্রেষ্ঠ বাড়িটির চিরকালের বিরোধী বাড়িটিও নাকি হাত মিলিয়েছেন। তাঁদের পরামর্শেই এবং সাহসে এটি তিনি করতে উদ্যত হয়েছেন।

একটু ভেবে তিনি বললেন, আমি একটু ভেবে দেখি।

ভেবে দেখে অপরাহ্ণে আমাকে বললেন, আমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম তারাশঙ্কর। আমাকে ধন্যবাদও দিলেন, আশীর্বাদ করলেন।

এবার কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় এল। সে ছিল আমার সমবয়সী, বন্ধু; আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

এতেও কিন্তু মিটল না। এবার এল শেষ এবং কঠিন পরীক্ষা। ওই প্রতিপত্তিশালী বাড়ির গৃহিণী—যিনি প্রথম সুর তুলেছেন তিনি তুলাট ব্রত করবেন। অর্থাৎ যজ্ঞ করে যজ্ঞশেষে নিজের সঙ্গে ওজন করে স্বর্ণ রৌপ্য থেকে

ধাতুতে, বস্ত্রে, নানা পার্থিব সামগ্রী দান করবেন। নানাস্থান থেকে পণ্ডিত আসছে, কাশী থেকে আসছেন পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বিরাট আয়োজন নবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভোজন। তিনি এই যজ্ঞে পুরোহিত এবং ওই কালীকিঙ্করবাবুর বাড়িকে পাতিত্য দোষে বর্জন করতে কৃতসংকল্প হলেন। আমার কাছে তাঁদের দূত এল।

আমাদের গ্রামের অবিনাশ মুখোপাধ্যায় ('আমার কালের কথা'র 'অবিনাশ দাদা') তাঁদের কর্মচারী, কালীকিঙ্করবাবুর বন্ধু, আমার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, তিনি এলেন আমার কাছে। আমাকে এবার সোজা বললেন, দেখ, তুমি কেন এতে বিরোধিতা করছ ? সম্পর্ক বিচারে, প্রীতি অন্তরঙ্গতা বিচারে, কালীকিঙ্কর কি এঁদেব চেয়ে তোমার আপন ? তুমি সরে দাঁড়াও।

আমি বললাম, একটু ভুল করছ। আমি কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির বিরোধিতা করছি না। কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিচার আমি করেছি। ওদের সঙ্গেও করেছি। আমি জানি কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে এই দিক দিয়ে ওদের যে বিরোধিতা আজ মাথা ঠেলে উঠেছে সে বিরোধিতা অগস্ত্যের আবির্ভাবে বিন্ধ্যের মতো প্রণত হয়ে মিলিয়ে যাবে। সে অগস্ত্য হলেন রায়বাহাদুর অবিনাশবাবু। যে বিলাতফেরত ছেলেটির হাতে কন্যা সমর্পণের জন্য এত বিরোধ, রায়বাহাদুর সেই নাতজামাইকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবেন এমনি তুলাট ধরনের আর-এক আয়োজনে। সে আয়োজনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বদলে আসবেন সাহেবসুবার দল। জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেব ডেপুটি প্রভৃতি নবীন যুগের মহামহোপাধ্যায়ের দল। তাঁদের মধ্যে এই নবীন বিলাত-প্রত্যাগত জামাতাটি নবগ্রহের সভায় কিশোর-গ্রহ বুধের মতো বসে ওঁদের কাছ থেকেই প্রশংসা বাক্যে তুষ্ট হবেন। হয়তো এই ঝগড়াটা সেইখানেই মিটবে। সে সভায় এঁদের বাড়ির অকৃতী এই জামাতাটির কোন স্থান হবে না। এ সবই আমি জানি। কিন্তু তবু আমি সরে দাঁড়াতে পারব না। প্রথমেই বলেছি এ দাঁড়ানো আমার কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। আমি দাঁড়িয়েছি আমার আদর্শের জন্য। আমি কোনমতেই সরে দাঁড়াব না।

অবিনাশ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, ভুল করলে

তারাশঙ্কর। কাশী থেকে পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর আসছেন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ আসছেন —তাঁরা যখন এই কথা বলবেন তখন?

বললাম, সে কথাও মানব না।

—কিন্তু সমাজ মানবে।

—মানে আমি পতিত হয়ে থাকব।

এবারও তিনি আর তিনি দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আর এক দরজা দিয়ে ঢুকলেন কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় এবং তাঁর এক আত্মীয়। বুঝতে আমার বাকি রইল না যে তাঁরা অবিনাশ মুখোপাধ্যায়ের পিছনে পিছনেই এসেছেন এবং সকল কথাই শুনেছেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে।

বংশী সজল চোখে আমার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর আত্মীয় আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন সকল কথাই লিখবেন তাঁরা কালীকিঙ্করবাবুকে।

আমি হাসলাম। এবং আমার এই দাঁড়াবার কারণ আবারও একবার তাঁদের বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু তাঁরা মানবেন কেন? তাঁদের কৃতজ্ঞতা যাবে কোথায়?

থাক ও কথা। এখন তারপর যা ঘটল তাই বলি।

পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ সমস্ত শুনে এক কথায় সমর্থন করলেন আমাকে। তাঁদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন, কাল পরিবর্তন হয়েছে, কর্ম-ব্রতের কাল আর নেই। কালভেদে উপলব্ধির পরিবর্তন হয়। হিন্দু সমাজেরও হয়েছে। ও বিধান আজ অচল। শুধু তাই নয়, সেই রাত্রেই আমাদের পুরোহিতকে ডেকে ঐ যজ্ঞে শাস্ত্রপাঠ কর্মের জন্য বরণ করালেন।

লাভপুরের সমাজে সেই রাত্রে সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে নববিধান প্রবর্তিত হল। যজ্ঞ মিটে গেল। পণ্ডিতেরা চলে গেলেন, আমি রইলাম, কয়েকদিনের মধ্যেই অনুভব করলাম এর প্রতিক্রিয়ায় আর-এক বিরোধের সম্মুখীন হতে হবে আমাকে।

এই বিরোধ আমাকে পীড়িত করে তুলেছিল। বিরোধে ভয় আমি পাই নি। কোনদিন পাই নি। কিন্তু এই অশান্তি, বিশেষ করে বৈষয়িক পথ ধরে বিরোধ এসে যখন অশান্তির সৃষ্টি করে তখনই এইটে আমার অসহ্য হয়ে উঠে।

একটা দৃষ্টান্ত দেব।

তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটি এজমালী সম্পত্তি। তাঁরা সেই সম্পত্তির সরকারী রাজস্ব দাখিল করলেন না। এর ফলে সম্পত্তি উঠল নীলামে। এর প্রতিকার করতে হলে, নীলামের মুখে তাঁদের দেয় টাকা আমাকে দাখিল করতে হবে এবং পরে তাঁদের উপর মোকর্দমা করে সেই টাকা আদায় করতে হবে। অথবা নীলামে ওই সম্পত্তি ডাকতে হবে। কোনটার সামর্থ্য আমার নেই। আমি নীলামের পূর্বে আর-একজন সম্পদশালীকে সম্পত্তিতে আমার অংশটুকু বিক্রি করে দিয়ে নিষ্কৃতি নিলাম! শুধু এইটুকু প্রতিহিংসা আমার চরিতার্থ হল যে, সম্পত্তিটা তাঁদের ষোল আনা হল না।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে ঘটনাচক্র আমাকে আবার গ্রামের প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলে। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিরোধ। সে কথা এখানে থাক। শুধু এইটুকু বলি যে এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসার ফলটুকু আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। তার কথা আমার 'বিচিত্র' বইয়ে বলেছি।

আমার সাহিত্যিক-জীবনের ভূমিকা-পর্ব শেষ হল। বলতে গেলে এইখানে যাত্রা শুরু হল 'বঙ্গশ্রী'তে। তার আগে কেমন করে আবার সাহিত্যসাধনায় মন ফিরল সেই কথাই বলব।

'উপাসনা' উঠে গেল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে গেলেন, এলেন সজনীকান্ত দাস। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের নূতন মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গশ্রী' শুরু করলেন। নাম কার দেওয়া সঠিক জানি না, তবে তিনিই সম্পাদনা শুরু করলেন সমারোহের সঙ্গে। ওই পর্বের সঙ্গে আমারও নূতন পর্ব আরম্ভ হল।

'উপাসনা'য় তখন 'যোগ-বিয়োগ' নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল। এবং 'সর্বনাশী-এলোকেশী' নামে একটি গল্পও দেওয়া ছিল 'উপাসনা'র দপ্তরে। 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যায় আকণ্ঠ ঠেসে সাবিত্রীপ্রসন্ন সব শেষ করে ছিলেন। এবং 'উপাসনা'র হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেবার সময় উপন্যাস ও গল্পের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করে দিয়েছিলেন ষাট এবং দশ। উপন্যাসের দরুন বারো মাসে পাঁচ টাকা হিসেবে ষাট টাকা। এই আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম

উপার্জন। এই কারণেই 'উপাসনা' 'বঙ্গশ্রী'র কথার পুনরাবৃত্তি। টাকাটা বোধ করি বুলুর মৃত্যুর পরেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় কলকাতায় গিয়ে 'উপাসনা' আপিস থেকেই আবার যে রাত্রেই জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সেই দিন পেয়েছিলাম। বাড়িতে দিন কয়েক জ্বরে ভুগে আবার এবার এলাম কলকাতায়। এবার সপরিবারে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নিয়ে এলাম আমার স্ত্রীর মাসীমার বাড়ি। তিনি ছিলেন আমার স্ত্রীর মায়ের মতো। উমার (আমার স্ত্রীর) বাল্যকালে মাতৃ-বিয়োগ হয়েছিল, তিনিই তাকে মাতৃস্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁরই আহ্বানে এলাম কলকাতায়; বালীগঞ্জ যতীন দাস রোডে। কাছাকাছি সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং কিরণ রায়ও থাকেন। ওদিকে ধর্মতলা স্ট্রীটে 'বঙ্গশ্রী' আপিস জমে উঠেছে। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হয় নিত্য-নিয়মিত। গল্পে-গুজবে, হাস্যে-কৌতুকে, আলাপে-আলোচনায়, চায়ে-পানে, সিগারেটে-বিড়িতে, মধ্যে মধ্যে মুড়ি-বোঁদেতে, ভাজা চিনেবাদাম-ছোলাতে মিশিয়ে সরগরম মজলিস। অধ্যাপক সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত সরোজ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দত্ত, স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক উকিল দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক উকিল জ্ঞান রায় এঁরা প্রায় এ আসরের নিত্যকার যাত্রী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি শ্রীঅজিত দত্ত, বিখ্যাত চিকিৎসক উদার আত্মভোলা শ্রীরাম অধিকারী; কখনও কখনও আসতেন শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। মধ্যে মধ্যে খাওয়াতেন। সে যাকে বলে—সমারোহের কাণ্ড তাই। আড্ডার সভ্যেরা তিনি এলেই ধরতেন কিছু খাওয়ান খুতুদা (অশোকবাবুর সমাদরের নাম)। তিনি পকেট থেকে হাত বের করলেন, হাতে উঠল হয়তো একশো টাকার নোট। সেটি টেবিলের উপর রেখে বলতেন, খুচরো তো নেই। যা আছে এই।

সভ্যেরা চুপ করে যেত। একশো টাকার নোটখানাকে খুচরো করে নিয়ে

খাবার আবদার জানাতে তাদের দ্বিধা হত ; খুড়ুদা তখন বলতেন, তা হলে ওখানা নিয়েই যা হয় কর। এর পর উঠত খুড়ুদা-র জয়ধ্বনি। এই মানুষটির মতো দরাজ-মন আমীব মানুষ সত্যিই দেখি নি। একটু ভুল হল ; পরে অবশ্য দেখেছি, শিল্পী দেবীপ্রসাদকে দেখেছি। তিনি যাঁদের ভালবাসেন তাঁদের বিন্দু-প্রমাণ অভাবের কথা জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ থেকে একটি T. M. O. পাঠাতেন তিনি। দেবীপ্রসাদ এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেই শালপ্রাংশু মহাভুজ পালোয়ান বক্সার এবং যুযুৎসুবিদ্। এঁরা দুজনে মুখোমুখি হলে যা ঘটে সে এক দেখার মতো দৃশ্য। বিশেষ করে যখন দুজনে দুজনের পাঞ্জা ধরে শক্তির পরীক্ষা করেন।

যাক ; ও কথা এখন থাক। 'বঙ্গশ্রী'র আসরের কথা বলি। এই আসরে আর একজন আসতেন। সজনীকান্তের বন্ধু, স্টাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির এজেন্ট নিখিল দাস। হাসাতে জানেন না, হাসতে জানেন এবং হাসির বেগ সম্বরণ করতে অপরকে মেরে ধরে কামড়ে আঁচড়ে কাঁদাতে জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখেও জল পড়ে!

এই আসরের আকর্ষণে ধর্মতলা স্ট্রীটে নিত্য বিকেল বেলা আসি। দূরে একান্তে বসে শুনি, দেখি, উপভোগ করি। এর আগেই বোধ হয় বলেছি যে, 'বঙ্গশ্রী'র আসরে সজনীকান্তের মহল ছিল তিনটে। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নূতন আগন্তুকদের ; তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর ; এখানেই বসত এই বিখ্যাত মজলিস। এর পর ছিল তাঁর খাস মহল, এখানে চারিদিকে ঠাসা ছিল হাজার পাঁচেক বই, এরই মধ্যে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন।

কিরণ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের হলেও সজনীকান্তের আসরে এবং অপর সকলের কাছেই আমি ছিলাম নূতন আগন্তুক। আমার সীমানা আমি নিজেই নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম। আমি এসে বসতাম ওই কিরণ রায়ের মহলে। ভিতরে যখন মজলিস পুরোদস্তুর জমে উঠত তখন কিরণই নিয়ে যেত, এক পাশে চেয়ারে বসে শুনতাম। আড্ডা শেষ হলে সন্ধ্যার সময় ফিরে

যেতাম বালীগঞ্জে। সেখানে যখন পৌছুই তখন এ আড্ডার আনন্দের রেশ আর থাকত না, মনে জেগে উঠত বুলুর স্মৃতি। মনে মনে সংশয় জাগত এ কেমন আনন্দ, এ কোন আনন্দ যা আকণ্ঠ পান করে এসেও বেদনার তৃষ্ণা শোকের শুষ্কতা এক বিন্দু অপনোদিত হল না?

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কল্লোল যুগে' লিখেছেন—"তারাশঙ্কর যে মিশতে পারে নি ('কল্লোল' দলের সঙ্গে) তার কারণ আহ্বানের অনান্তরিকতা নয়, তারই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের। উত্তাল উর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।" কথাগুলির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। তবুও বিদ্রোহ কথাটি স্পষ্ট। বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল উর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্ত পাবার মতো মনের গঠন আমার ছিল না। ওই উর্মিলতার নিচে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরনের। ঠিক এই কারণেই 'বঙ্গশ্রী'র আসরেও প্রথম যখন এই উর্মিলতা এবং কল-কল্লোলের সমারোহ দেখলাম তখন একটু দূরে ওখানকার তটভূমিতেই আশ্রয় নিয়ে নিতান্ত দর্শকের মতোই বসে রইলাম। ঢেউগুলিকে গুনেই গেলাম, দেখেই গেলাম, শৌখীন সমুদ্র-স্নানার্থীর মতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম না। বন্ধু কিরণ রায় মধ্যে মাঝে সমুদ্রতটের ব্যবসায়ী নুলিয়ার মতো হাত ধরে টানাটানি করতেন; বলতেন,, আরে নেমেই দেখ না কেন। দু-চারটে ঢেউ নিলে, দু-চারদিন এই তরঙ্গস্নান করলে তোর স্নায়বিক দুর্বলতা কেটে যাবে। কিন্তু তাতেও আমি নড়ি নি। প্রাণ সাড়া দিত না। বহুর মধ্যে এই ভাবে এই ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেওয়াটা আসল ছড়িয়ে দেওয়া নয়। এটা যেন আমি অনুভব করি গোড়া থেকেই। অচিন্ত্যবাবু একে বহির্মুখিতা বলেছেন। কিন্তু আমার

ধারণা এটা ঠিক তার বিপরীত। অন্তর্মুখিতা। অন্তরের আত্মাকে অনুভব করে তারই সহধর্মী অন্তরঙ্গ জনটিকে খুঁজেছি। খুঁজতাম তটভূমিতে বসে। তটভূমিতে বসে দেখতে পেতাম তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে শুধু সমুদ্রের জলই আসছে না, বালির রাশিও উঠে আসছে ; আবার বিচিত্রগঠন বিচিত্রবর্ণ ঝিনুক আসছে তারই সঙ্গে। অনেক অনেক কিছু শিখেছি এই আসরে। আবার অনেক বেদনাও পেয়েছি। পরনিন্দা পরচর্চা মুখরোচক সামগ্রী; কিন্তু গুণীজনের আসরে চলার বস্তু নয়। রসিকজনের ভিয়েনের গুণে সে সামগ্রী যখন খোলস পাল্‌টে রসবস্তুতে পরিণত হয় তখন আসল খাদ্যগুণের বিচার খাটো হয়ে রসের বিচারে অবাধে চলে যায় বড় বড় আসরে। এটাও সহ্য করা যায়। কিন্তু যখন আত্ম-কলুষকে রসিকতার রাংতায় মুড়ে-মাদক মেশানো পানের খিলির মতো আসরে বিলি করে তখন সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের সরস আত্মকলুষ বর্ণনা করে বাহাদুরি অর্জন করতেও দেখছি এই আসরে। এবং অল্পবিস্তর সাহিত্যিক ঢঙও আমার কাছে অসহনীয় মনে হত। প্রাণের মহল বন্ধ রেখে বুদ্ধির মহলের পোশাকী চলাফেরা কথাবার্তাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠত অধিকাংশ আসরে। দু-চারদিন সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে তত্ত্বের পথে জ্ঞানের তোষাখানার দরজা খুলে যেত।

'শ্মশান ঘাট' গল্পটির মধ্যে এমন একটি শোকার্ত হৃদয়ের অনুচ্ছ্বসিত অথচ গাঢ় প্রকাশ আছে যে সেদিন 'বঙ্গশ্রী'র সেই পরিহাস-রস-রসিকতা-মুখর মজলিসটি তার প্রভাবে কয়েক মিনিটের জন্য সকরুণ মৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। স্মৃতিটুকু মনের মধ্যে অম্লান হয়ে আছে। বোধ করি আমরণ থাকবে। থাকারই কথা। ওই শান্ত মৌনতার মধ্যেই আমি বোধ করি সার্থকতার প্রসাদ আস্বাদন করেছিলাম। সাধনায় সিদ্ধিলাভের মধ্যে থাকে যে অমৃত এমন আস্বাদনের মধ্যে থাকে তারই আভাস। অন্ন গ্রহণের পূর্বে জলগণ্ডুষ গ্রহণের মতো। মনে করিয়ে দেয়—প্রাণ মন দেহকে প্রস্তুত করে তোলে অন্নাস্বাদনের জন্য।

আরও একটা বিচার আছে। লৌকিক হিসাবের বিচার। অর্থাৎ যেটা নাকি মনোবিজ্ঞানের অঙ্কসম্মত। এতবড় মজলিসে এতগুলি গুণীজন-সমক্ষে রচনা পাঠের সৌভাগ্য আমার সেই প্রথম। পড়বার আগে ভয় ছিল, পড়ার সময়েই ফিসফাস এবং একান্তে আলোচনা শুরু হবে ; পড়ার শেষে দুহাত উপরে

তুলে আড়মোড়া ছেড়ে হাই তুলে কয়েকজন উঠে পড়ে বলবেন, উঠলাম তা হলে। যাঁরা থাকবেন তাঁরা বলে উঠবেন, এবার চা আনতে বল। অথবা কোন একটা তুচ্ছ পরিহাস উপলক্ষ্য করে মুখরিত হয়ে উঠবে সভাগৃহ। সেই আশঙ্কা মিথ্যা হয়ে গেল। একজন বললেন, শেষটা—শ্মশানে ছোট মেয়েটির শবদাহের জায়গাটা আর একবার পড়ুন তো।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সজনীকান্ত বলে উঠলেন, অপূর্ব! অদ্ভুত হয়েছে! এই শব্দ দুটি সজনীকান্তের জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ভালো লাগলেই বেরিয়ে আসবে। উনিশ-বিশ দূরের কথা, দশ-বিশ এমনকি পাঁচ-বিশেও ওই দক্ষিণা দানের এক ব্যবস্থা, কাঞ্চন মূল্য। তফাত থাকে কণ্ঠস্বরে। তাকে মার-প্যাঁচ বলব না, কারণ প্যাঁচের মারটা স্বেচ্ছাকৃত নয়; স্বাভাবিক ভাবেই ভালোত্বের পরিমাণ ভেদে কণ্ঠস্বরের গাঢ়তার তারতম্য ঘটে। সে বুঝতে কিছু সময় লাগে। এদিক দিয়ে সজনীকান্ত একেবারে পাকা সম্পাদক। সব লেখককেই সমান তুষ্ট রাখতে পারেন। এক হাতে রাম অন্য হাতে রাবণ নিয়ে কারবার করতে পারেন। আর-এক দিক দিয়ে সজনীকান্ত সাধকের চেয়েও শক্তিশালী উত্তরসাধক। তন্ত্রমতে সাধক যখন শ্মশানে শবসাধনায় বা এমনি কোনো পদ্ধতির সাধনায় আসন গ্রহণ করেন তখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় একজন উত্তরসাধকের। উত্তরসাধক বিনিদ্র চোখে সাধনস্থানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকেন সদাজাগ্রত নন্দীকেশ্বরের মতো। এবং অহরহ উচ্চারণ করেন মা-ভৈ বাণী। সেই মা-ভৈ বাণী ভয়ঙ্কর শ্মশানেও সৃষ্টি করে এক অভয় পরিমণ্ডলের। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রশান্ত অনুদ্বিগ্ন সাধক সাধনা করে যান। সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে এইযুগে সজনীকান্তের মতো এতবড় উত্তরসাধক আমি আর দেখি নি। বর্তমান কালের যাঁরা সাহিত্যিক দিকপাল তাঁদের মধ্যে যিনি তাঁর কাছে এসেছেন প্রত্যেকেই এই উত্তরসাধকের বলে বলীয়ান হয়েছেন। বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমৃদ্ধ প্রভৃতি রথীরা আমার কথা অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এযুগে সজনীকান্তের এই গুণ একজন পেয়েছেন। তিনি অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। কোন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের পদে তিনি যদি অধিষ্ঠিত থাকতেন তবে তিনি এদিক দিয়ে সার্থক হতে পারতেন।

গল্পটি সজনীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে দিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই যাবে। কথা ছিল শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের গল্প প্রকাশিত হবে। সে ব্যবস্থা আংশিক বদল হয়ে স্থির হল, ৺রবীন্দ্র মৈত্রের গল্প যাবে দ্বিতীয় সংখ্যায়। ৺মৈত্র নিজে খুশী হয়েই মত দিয়েছিলেন। তিনি তখন প্রভাতের কুয়াশামুক্ত সূর্যের মতো স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন জীবনক্ষেত্রে। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটক প্রকাশিত হচ্ছিল। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিষ্ঠান আর্ট থিয়েটারের 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সেই নাটক অভিনীত হচ্ছে। আর্ট থিয়েটারে ৺অপরেশচন্দ্রের নাটক ছাড়া অন্য কারও নাটক বড় একটা স্থান পেত না। পেলেও খুব সার্থক হত না। এই সময়ে ৺অপরেশচন্দ্র ছিলেন বাতে শয্যাশায়ী। প্রায় পঙ্গু অবস্থা। এদিকে সামনে এসেছে বড়দিন। সেকালে কলকাতায় বড়দিনের একটা বাজার ছিল। বোধ করি কলকাতার সারা বছরের সেরা বাজার। চৌরিঙ্গীর হল্ এণ্ডারসন, হোইটওয়ে লেড্‌ল থেকে হাতীবাগানের ফুটপাতের ফেরিওয়ালাদের দোকান পর্যন্ত পণ্যসম্ভারে ঝলমল করত। হগ মার্কেট থেকে টালার চুনীবাবুর বাজার পর্যন্ত কপি, কড়াইশুটি, গল্‌দা চিংড়ি, ভেটকি, তপসে, মাটনমুর্গীতে বোঝাই হয়ে যেত। চিড়িয়াখানা থেকে থিয়েটার, সিনেমা, ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পর্যন্ত লোকের সারি লাগত। বড়দিনে থিয়েটার সিনেমায় নতুন বই না হলে সেকালে চলত না। বড়দিনে নতুন নাটক চাইই। এবং বড়দিনে লঘুরসের মধুর নাটকেরই চলতি ছিল বেশী। আর্ট থিয়েটারে নাটক চাই, অপরেশচন্দ্র বাতে শয্যাশায়ী। আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর স্বনামধন্য পুস্তকব্যবসায়ী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই বোধ হয় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এই নাটকখানি পছন্দ করে স্বর্গীয় মৈত্রকে ডেকে বইখানি নিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ সৌভাগ্য সেকালে খুব একটা বড় সৌভাগ্য এবং সম্মান। সম্পাদকের দরজা কাঠের হলে নাট্যমঞ্চের দরজাগুলি ছিল লৌহদ্বার। মাথা ঠুকলে মাথাই ভাঙত, দরজা খুলত না। স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিববাবুর কাছে শুনেছি—তিনি যখন প্রথম নাট্যকার হিসেবে 'মিনার্ভা'য় প্রবেশাধিকার পান তখনকার কথা। সে কি দুর্ভোগ। তিনি সম্পদশালী পিতার সন্তান। সে হিসেবে অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ একটু সম্ভ্রমের

চোখেই দেখত। তবুও অনেক দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। একদিন একজন প্রায় গণ্ডমূর্খ অভিনেতা তাঁর রচনায় ভুল ধরেছিল—বলেছিল, মশায় এ আপনি কি লিখেছেন? Sequence of tense জানেন না আপনি? এইখানটা বুঝিয়ে দিন আমাকে।

নির্মলশিববাবু অমর্যাদার ক্ষোভে এবং মূর্খকে বুঝাতে না পারার দুর্ভোগে যখন ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছেন তখন ভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এসে পড়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। মূর্খ অভিনেতাটিকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যাও যাও, ওতে যা আছে তাই মুখস্থ করগে যাও। ছিকোয়েন্স বিচের করতে হবে না। যিনি নাটক লিখেছেন তিনি সিকোয়েন্স অব টেন্স জানেন।

নাট্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তখন; ওই কিছুটা বাদে বেশ কিছুটা তখন বর্তমানও; এই অবস্থায় সসম্মানে আহ্বান করে দক্ষিণা দিয়ে নাটক নেওয়ার মধ্যে স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র যে সম্মান পেয়েছিলেন তার দাম অনেক। নাট্যক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটারে আমার দুর্ভোগের কথা এর আগেই আমি লিখেছি। এই আর্ট থিয়েটারে অপরেশবাবুর হাতেই সেটা ঘটেছিল।

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র সাহিত্যক্ষেত্রে তখনই খ্যাতিমান ছিলেন। 'প্রবাসী'তে তাঁর গল্প প্রকাশিত হত স্বনামে। 'শনিবারের চিঠি'তে দিবাকর শর্মা নামে হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প লিখতেন। 'আনন্দবাজারে' লিখতেন 'দধিকর্দম'। তাঁর তিরোধানের সঙ্গেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'দধিকর্দম' শিরোনামা তুলে দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। 'দধিকর্দম' নামটিও ছিল স্বর্গীয় মৈত্রের দেওয়া। সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক পদ গ্রহণ করায় তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের পদও তখন গ্রহণ করেছেন। তিনি তখন ফলভারঅবনত বৃক্ষের মত পরিপূর্ণচিত্ত। এবং চিত্তের দিক থেকে তিনি ছিলেন মহানুভব। জীবনে দয়া, মানুষের প্রতি প্রেম প্রভৃতি আদর্শের প্রতি অনুরাগে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর তুলনা বিরল। আমার গল্পটি শুনে প্রসন্নচিত্তে বললেন—আমার গল্প থাক। এই গল্পই যাক প্রথম সংখ্যায়।

শুধু তাই নয়, 'মানময়ী গার্লস স্কুল' উদ্বোধনের দিন তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে আমাকেও বন্ধুরূপে গণনা করে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাংলা ১৩৩৯ সালের ১৫ই পৌষ 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র উদ্বোধন হয়েছিল। 'বঙ্গশ্রী'র মজলিশের প্রায় সকলেই ছিলাম। হাস্যরস-প্লাবিত করতালি-মুখরিত প্রেক্ষাগৃহে আমাদের গোটা দলটি সেদিন যে বিজয়োল্লাস অনুভব করেছিল তা যখন আজ স্মরণ করি তখন আনন্দে মন ভরে উঠে। মনে মনে বুঝতে পারি সেই দিনই প্রথম আমি 'বঙ্গশ্রী'র গোষ্ঠীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলাম। গোটা 'বঙ্গশ্রী'র দল সেদিন স্বর্গীয় রবির বিজয়ে দিগ্বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছিল। অনুভব করবারই কথা। 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র অভিনয়ের সে সফলতা মহৎ। আয়োজনে সমারোহ ছিল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে তখনকার দিনের দিকপালেরা কেউ ছিলেন না, এখনকার অন্যতম দিকপাল শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলি তখন নিতান্তই নবীন ও তরুণ; শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'পোষ্য-পুত্রে' ফটিকচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে সবে পরিচিত হয়েছেন। বয়েসে নবীন প্রিয়দর্শন তরুণ—মেদ এবং ভুঁড়ির কোন চিহ্ন ছিল না। মানসের ভূমিকার অভিনয় করে প্রথম রজনীতে তিনি খ্যাতিমান হয়ে গেলেন; দর্শক-মানসের সঙ্গে প্রিয়জন-সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। নায়িকা নীহারিকার ভূমিকায় পদ্মাবতীও খ্যাতিলাভ করলেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেন এক রাত্রে। বিখ্যাত হয়ে গেলেন তিনি। সাহিত্যিক বিচারেও এ খ্যাতির মধ্যে খাদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র পর এমন সুমধুর হাস্যরসের মিলনাত্মক নাটক তখন পর্যন্ত আর অভিনীত হয় নাই। আজ স্মৃতি-কথা লিখবার সময় মনে মনে বিচার করে লিখছি—আজও পর্যন্ত আর হল না।

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার আমার সুযোগ হয় নি। অল্প কয়েকদিনই আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তবে কয়েকদিনেই তিনি যে সাহিত্যিকদের সকল জন থেকে পৃথক তা বুঝেছিলাম। তাঁর পদক্ষেপ থেকে আরম্ভ করে আলাপ-আলোচনার ধারা কিছুর সঙ্গেই অন্য কারুর মিল ছিল না, সবেই ছিলেন তিনি পৃথক। সহজ স্পষ্ট সোজা এবং আশ্চর্য রকমের শক্ত। মনের

কথা উচ্চকণ্ঠে বলতেন, কোন সঙ্কোচ করতেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের প্রত্যয়কে প্রচার করতে দ্বিধা ছিল না। যা অন্যায় মনে হত তার প্রতিবাদ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। অপবে কে কি ভাবতে পারে সে ভাবনা তাঁর ছিল না, তিনি নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতেন অসংকোচে এবং সে ভাবনায় কোনোদিন কারুর অনিষ্ট কামনা থাকত না। নিজের কথা—সে যে কথাই হোক, প্রশংসার বা নিন্দার সব কথাতেই তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। 'বঙ্গশ্রী' আপিসের প্রথম মহলে আমি একা বসে আছি। কিরণ নেই, সজনীকান্তও অনুপস্থিত। দুজনেই বোধ হয় 'বঙ্গশ্রী'র মালিকের কাছে গেছেন। ভিতরের আড্ডা শূন্য। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে 'বঙ্গশ্রী' আপিসের কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ উঠল। রবি মৈত্রের পদধ্বনি চিনতেও ভুল হত না। উপরে উঠতে উঠতেই তাঁর কথা শুরু হয়ে যেত। কথাও শুনতে পেলাম। উপরে উঠে আমাকে দেখে আমার কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কিরণ কই! সঙ্গে সঙ্গে ঘবে উঁকি মেরে বললেন, এত চুপচাপ সব?

বললাম কেউ নেই। এরা দুজন গেছে হেড অফিসে।

বললেন—যাক গে। এখন শুনুন, এরা মশায় অদ্ভুত। অদ্ভুত লোক। আশ্চর্য ভালো লোক। কারা বুঝতে না পেরে আমি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বললেন—থিয়েটারের অভিনেতারা দু-তিন-জন আমার বাড়ি গিয়েছিল। চমৎকার মানুষ। বলে, এমন ভালো বই আমরা আর অভিনয় করি নি। বলে, এবার যে বই লিখবেন তাতে যেন আমার উপযুক্ত একটা ভালো পার্ট থাকে। সুন্দর মানুষ এরা। কিন্তু অনেকের খুব কষ্ট।

বলেই যেতে লাগলেন 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র সার্থকতার কথা। বলতে বলতে হঠাৎ বোধ করি মনে হল যে নিজের অতটা কথা বলার পর আমার সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বললেন, আপনার খবর বলুন। আর কি লিখছেন? আপনার গল্পটি কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমার।

কয়েক মিনিট পরেই বললেন, শুনছি কয়েকজন বিশেষরূপে দগ্ধ অর্থাৎ বিদগ্ধ অর্থাৎ মুখপোড়া বলেছে—মানময়ী খুব সস্তা লেখা—জায়গায় জায়গায় ভালগার।

নীলচে চোখ তাঁর জ্বলে উঠল। বললেন, ও সব নবকাসুরদের আমি গ্রাহ্য করি না।

তিনিই ব্যাখ্যা করলেন নবকাসুর অর্থে বরাহরূপী ভগবানের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভজাত পুত্র। ভগবানের পুত্র হলেও বরাহ-স্বভাবসম্পন্ন সন্তান অসুর-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল। ইংরিজী সভ্যতার ও শিক্ষার দৃপ্ততায় দাম্ভিকতায় যাদের মন শিক্ষিত হল তারাই ঘৃণা করে দেশের আচার-বিচার সব কিছুকে। দাঁত দিয়ে মায়ের বুক চিরে ফেড়েই ওদের আনন্দ। ফরাসী ধরনে তাদের হাসতে লজ্জা হয় না, ইংরিজি ধরনে কাশতে লজ্জা হয় না; শুধু লজ্জা হয় এ দেশের সব কিছুতে। এমন কি এ দেশের সন্তানহারা মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে—ওরে গোপাল রে বলে কাঁদলে গোপাল শব্দের জন্য এই শোক-বিলাপ তাদের কাছে ভালগার হয়ে দাঁড়ায়। ইংরিজী সভ্যতার আমদানির প্রথম আমল থেকে এ আমল পর্যন্ত— এরা কালে কালে পোশাক পালটে আসছে। ধুয়ো পালটে আসছে। বিলিতি ড্রাম বাজলে এরা তালে তালে পা ফেলে কিন্তু ঢাক বাজলে বলে—থামলে বাঁচি। আমি গ্রাহ্য করি না ওদের। এই ধরনের অনেক কথাই তিনি সেদিন বলেছিলেন। সে কথা মিথ্যে নয়।

১লা 'বঙ্গশ্রী' বের হল। তখন বেলা চারটে। মাত্র পঞ্চাশ কপি বই এল. প্রচ্ছদপটে দুটি হাঁসের ছবি ছিল। পল্লীর জলায় হাঁস দুটি সত্য সত্যই শ্রীর দ্যোতনার সৃষ্টি করেছিল। 'বঙ্গশ্রী'র প্রবন্ধগৌরব বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু প্রথম সংখ্যাই নয়, দু বৎসর 'বঙ্গশ্রী' সজনীকান্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল—দু বছরের কাগজই রচনাগৌরবে স্মরণীয়।

কিরণ গাড়ি নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কাগজ দিতে বের হল। সঙ্গে আমিও গেলাম।

বাড়ি ফিরলাম। ফিরে আবার বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। লিখলাম 'ডাইনীর বাঁশী' বলে একটি গল্প। এ গল্পটি সত্যকার একটি ভালো গল্প। আমাদের গ্রামে ছিল গন্ধবণিকদের মেয়ে—নিঃসন্তান বিধবা—স্বর্ণ; লোকে বলত সে ডাইনী। সনা ডাইনী। আমাদেরই বৈঠকখানা বাড়ির সংলগ্ন শাল-পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অশ্বত্থতলায় ছিল তার বাড়ি। গল্প শেষ করে

কিরণকে শোনালাম। কিরণ লাফ দিয়ে উঠল। নিয়ে গেল 'বঙ্গশ্রী' অ'পিসে। সজনীকান্তকে শোনালে। সজনীকান্ত কিন্তু গল্পটি নিলেন না। বললেন, ওঁর লেখা মাঘ মাসে বের হয়েছে, এখন অন্তত পাঁচমাস আগে ওর লেখা যাবে না।

(১১)

সাবিত্রীপ্রসন্ন গল্পটি নিয়ে 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবুর হাতে দিয়ে এলেন। এরই বোধ হয় দু-তিন দিন পর অকস্মাৎ সংবাদ এল রবীন্দ্র মৈত্র দেহ ত্যাগ করেছেন। গিয়েছিলেন তিনি রংপুর। রংপুরেই ছিল তাঁদের বাস। সেখানে গিয়ে ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন-চার দিনের অসুখেই তিনি মারা গেছেন। সংবাদটা 'বঙ্গশ্রী'র আসরে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই এসে পড়ল। রবীন্দ্র মৈত্র পনের কুড়ি দিন আগে অকস্মাৎ বিখ্যাত হয়েছেন। লাল কাঞ্চনের গাছের পুষ্পশোভার মত সে খ্যাতি। বসন্তারম্ভে গাছটি হয় পত্রিক্ত, সেই রিক্তগাছটি অকস্মাৎ একদা রক্তাভ কোমল পুষ্পশোভায় ঝলমল করে ওঠে। সপ্তাহ দুয়েক পর গাছ ভরে যায় নব পত্রপল্লবের শ্যামশোভায়; পুষ্পশোভা হয় অন্তর্হিত!

রবীন্দ্র মৈত্র সপ্তাহ তিনেকের জন্য তাঁর সেই বিপুল খ্যাতিকে ভোগ করে চলে গেলেন পরলোকে। যেন একরাত্রির বাদশাগিরি এ সব, এইটেই প্রমাণ করে গেলেন তিনি।

এর কয়েকদিন পর আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরলাম। সামনে মাঘ মাসের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে আমার বড় ছেলে সনতের উপনয়ন। যাবার আগে কিরণ এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, 'চৈতালী ঘূর্ণী'র হিসেব নিয়েছ প্রকাশকের কাছে?

নিই নি। ভয়ে সেদিকে যাই নি। মনে হয়েছে যদি তাঁরা বলেন, একখানার বেশী বই বিক্রি হয় নি। নিয়ে যান বই। গুদামের ভাড়া দিয়ে যান। একখানা বই কিছুদিন আগে আমি নিজেই খরিদ্দার সেজে কিনেছিলাম। কাজেই একখানা বই বিক্রি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

সাবিত্রী এবং কিরণের তাগিদে যেতে হল। ওরা দুজনে নিত্যই জিজ্ঞাসা করতেন, গিয়েছিলে? কত বিক্রি হয়েছে?

বলতাম যাই নি। আজ যাব।

অবশেষে একদিন গেলাম প্রকাশকেব দোকানে। বই জমা দেও‍ার রসিদ দেখালাম, পরিচয় দিলাম, সবিনয়ে হিসেব চাইলাম।

দোকানের মালিক ভদ্র মানুষ, বাংলা দেশে সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বসতে বললেন; একজন কর্মচারী‌কে বললেন—দেখ তো 'চৈতালী ঘূর্ণী' কতগুলি আছে?

কর্মচারীটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার বই?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। গলা আমার তখন শুকিয়ে গিয়েছে।

কর্মচারীটি বললেন, বইগুলো নিয়ে যান আপনি। ঝাঁকামুটে ডেকে আনুন। বিক্রি হয় না। ও দিয়ে জায়গা জুড়ে রাখতে পারব না আমরা।

মালিক অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন, প্রথমটা বোধ হয় খেয়াল করেন নি। শেষটা তাঁর কানে গিয়েছিল। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। তোমাকে যা বললাম তাই কর। যাও!

তিনি লজ্জিত হলেন আমার কাছে।

কর্মচারী হিসেব নিয়ে এল কয়েক মিনিট পরে। সংখ্যাটা ঠিক মনে নেই, তবে দেড় বছরে পঞ্চাশ থেকে ষাটখানির মধ্যে বই বিক্রি হয়েছে। তাঁদের কমিশন বাদে আমার পাওনা হয়েছে চল্লিশ টাকা কয়েক আনা। আসবার সময় কর্মচারীটি আবার স্মরণ করিয়ে দিলে, এবার ভদ্রভাবেই বললে, বইগুলি নিয়ে যান।

আমি বললাম—কাল বা পরশু এসে নিয়ে যাব।

টাকাটা নিয়ে বাড়ি এলাম। দু দিন কি তিন দিন পর বাড়ি চলে গেলাম। এর মধ্যে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটি নি। কি জানি—সেই লোকটি দেখে যদি হাঁকে বা পিছনে এসে জামা চেপে বলে, বই নিয়ে যান মশায়।

মাঝখানে একখানি বইয়ের কথা বলতে ভুলেছি। 'পাষাণপুরীর' কথা। জেলখানার মধ্যে বইখানির পত্তন করেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে 'চৈতালী

ঘূর্ণী' যখন 'উপাসনা'য় বের হয়, সেই সময় জেলখানার পটভূমিকায় 'পাষাণপুরী' আরম্ভ করি। 'পাষাণপুরী'র অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ। আমি যেদিন সিউড়ী আদালতে সমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল। আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলিধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষতচিহ্ন, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমাদপুরে বসে ছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারা দুটিও পিঙ্গল, বিড়ালের চোখের তারার মত। সেই-খানেই শুনলাম কালীর কাহিনী। নিজের বন্ধুর মাথা হাতুড়ি মেরে ডিমের খোলার মত ভেঙে দিয়েছে। গোটা গাঁ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কালী অস্থির দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে দেখছিল এবং তারই মধ্যে শুনছিল তার কাহিনী বর্ণনা। মধ্যে মধ্যে সে প্রশ্ন করে উঠছিল।

—বাসিনীকে বেটা বামনা দিনরাত জ্বালাত কেন ?

—আমাকে পতিত করতে গেল কেন ?

—আমার ঘর আগে পুড়িয়ে দিলে কেন ? কখনোও বা ভুল সংশোধন করে নিচ্ছিল।—

—না না, গাঁ পুড়িয়ে দিতে চাই নি আমি। ওই বেটা কৃপণ বামুনের ঘরে আগুন দিয়ে ওকেই পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কি করব। আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কি করব ?

কালীর কাহিনী, কালীর মূর্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এর-পর জেলখানায় কালীকে তার বিচার ও দণ্ডকাল পর্যন্ত প্রায় নিত্যই দেখেছি। মস্তিষ্ক তার বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তবে উন্মাদ পাগল নয়। তাকে কিছুদিন রাখা হয়েছিল হাসপাতালে, তারপর কিছুদিন সেলে। নিত্যই তার কাছে যেতাম, কথা বলতাম। জেল হাসপাতালে চিকিৎসায় এবং সেবায় অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। সুস্থ হয়ে সাধারণ বিচারাধীন কয়েদীর ওয়ার্ডে সকলের সঙ্গেও কিছুদিন ছিল। তবে রাত্রে ওই ওয়ার্ডের মধ্যেই একটা শিকে ঘেরা খাঁচার মধ্যে তাকে রাখা হত। কালীর সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েই সাধারণ কয়েদীর

অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। বিচিত্র এই কয়েদীজীবনের যে পরিচয় পেলাম তাতে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। ক্রমে দেখতে পেলাম কয়েদখানায় অবরুদ্ধ মানুষগুলির নিরুদ্ধ কামনার বিচিত্র কুটিল এবং অসহায় প্রকাশ! জেলখানাতেই আরম্ভ করেছিলাম 'পাষাণপুরী'। মুক্তির পর নূতন করে যখন সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করবার অভিপ্রায়ে আত্মনিয়োগ করলাম তখন প্রথম লিখলাম 'চৈতালী ঘূর্ণী' তারপর লিখলাম 'পাষাণপুরী'। 'চৈতালীঘূর্ণী' প্রকাশিত হল 'উপাসনা'য়। ইচ্ছা ছিল 'চৈতালীঘূর্ণী শেষ হলেই সাবিত্রীপ্রসন্নের হাতে 'পাষাণপুরী' দেব। 'উপাসনা' ছাড়া নবীন লেখকদের অন্য কাগজগুলি তখন উঠে গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। এ যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী পত্রিকা বের করলেন, নাম 'অভ্যুদয়'। সরোজকুমার জেলে যাবার পূর্বে ছিলেন 'নবশক্তির' সম্পাদক। 'নবশক্তি'তে প্রকাশিত কোন রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্যই তিনি সম্পাদক হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অথচ দণ্ডভোগান্তে মুক্তি পেলেন যখন তখন 'নবশক্তি'র সম্পাদক পদে তাঁকে আর নিযুক্ত করা হল না। বোধ করি দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদকের পদ দিতে চেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। সরোজকুমার নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সসম্ভ্রমেই সে পদ গ্রহণ করেন নি। এবং স্বাধীন ভাবে 'অভ্যুদয়' বের করলেন। যতদূর জানি স্বর্গীয় কিরণশঙ্করবাবু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই স্বাধীন চেষ্টায় তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন, নানাভাবে সাহায্যও করেছিলেন। এই 'অভ্যুদয়ে' প্রকাশের জন্য সরোজকুমার আমার 'পাষাণপুরী' সাদরে গ্রহণ করলেন।

কয়েক সংখ্যা পরেই কিন্তু 'অভ্যুদয়' বন্ধ হয়ে গেল অর্থাভাবে। 'পাষাণপুরী' উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে রইল। সেকালে নূতন লেখকদের বই কেউ প্রকাশ করতে চাইতেন না। দোষ দিতে পারি না। সেকালে প্রকাশিত বইয়ের সংস্করণ হত কদাচিৎ এবং তাও বারো-চৌদ্দ বছরের আগে নয়। তবে মাসিকপত্র প্রকাশিত উপন্যাসের তবু একটা কদর ছিল। মাসিকপত্রে যখন বেরিয়েছে তখন অবশ্যই একটা সাহিত্যিক মূল্য আছে এবং মাসে মাসে বের হয়েছে যখন তখন একটি ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিতও হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রকাশকেরা অন্তত বলতেন, আচ্ছা রেখে যান, দেখি ভেবে। 'অভ্যুদয়ে'র অকাল মৃত্যুতে

'পাষাণপুরী'র ভবিষ্যৎ হল অন্ধকার। বেশ একটু দুঃখ পেলাম। কিন্তু সরোজ-কুমার আবার অধিষ্ঠিত হলেন 'নবশক্তি'র সম্পাদনের আসনে এবং আমার উচ্ছিষ্ট 'পাষাণপুরী'কে নূতনের মর্যাদা দিয়ে প্রকাশিত করলেন 'নবশক্তি'তে। বইখানি শেষ না হতেই বর্মণ পাবলিশিং হাউস আমার ঠিকানা সন্ধান করে বইখানি প্রকাশ করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। একখানা চুক্তিপত্রও হয়ে গেল। টাকা দেবেন কিস্তিবন্দীতে। প্রথম কিস্তিতে কুড়ি টাকা নগদ এবং বর্মণ পাবলিশিং হাউসের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে পছন্দমত তিরিশ টাকার বই। দ্বিতীয় কিস্তি আর আদায় হয় নি। বই প্রকাশিত হল, কাগজে কাগজে সমালোচনা হল। 'বঙ্গশ্রী'তেও সমালোচনা বের হল। তার শেষ লাইনটি আমার মনে আছে। "বই শেষ করিয়া মনে হয়—হায় কালীর ফাঁসি হইয়া গেল?" সত্য বলতে, সমালোচনা পড়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। বুঝতে আমি ভুল করি নি বইখানি সমালোচকের ভালো লাগে নি। ও ছত্রটি নিতান্তই স্কুলের নিরীহ ছাত্রদের জন্য কনসোলেশন প্রাইজের মত। অথচ পরবর্তী কালে অনেকেই বইখানির প্রশংসা করেছেন। প্রবাসীতে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র এক সমালোচনা করেছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন; লিখেছিলেন—কলের শ্রমিক-ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে, নায়ক গোষ্ঠ পুলিশের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে! চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী অগ্রদূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কি হয়? কালবৈশাখী আসে কি না?

সে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। সেদিক দিকে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়। এ নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়ি নি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কারণ ও কর্মে এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে; রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান। শিখেছিলাম লক্ষ কোটি

বৎসর পূর্বে একটি সংঘটনের প্রতিঘাতে ঘটল এক ঘটনা, এবং সে ঘটনার শেষ সেইখানেই হল না ; তার জের চলল—আর-এক যুগান্তরে। রামায়ণ মহাভারতের মহাবিস্ময়কর রচনা-সার্থকতার মূল তত্ত্বই যেন এইটি। এই মহাসত্যের অমোঘ গতিপথে স্বয়ং ভগবান এসে দাঁড়িয়েও তাকে রোধ করতে পারেন নি ; এমন কি ভগবান বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে এতটুকু বাঁকা পথে যায় নি সে সংঘাত-সমুদ্ভূত শক্তি ; সে চলেছে সোজা পথে। নরসিংহ অবতারে শাপগ্রস্ত ভগবান—যুগান্তরে ত্রেতায় করেছেন সেই শাপের ফলভোগ ; ত্রেতায় যে অন্যায় করলেন তিনি তারই প্রতিঘাতে দ্বাপরে তিনি ব্যাধের শরাঘাতে হলেন নিহত। এই সত্যের অমোঘ নির্দেশে—বন্যপশু বানরকে অন্যায় গুপ্তহত্যার প্রায়শ্চিত্তে তাঁকেও পশুর মতই হত হতে হল। সেই গাছের আড়ালে জরা-ব্যাধ আত্মগোপন করে মৃগভ্রমে তাঁর প্রতি শর নিক্ষেপ করেছিল। এই থেকেই আমার এ উপলব্ধি হয়েছে। কৃষ্ণাবতারে কুরুক্ষেত্রের প্রায়শ্চিত্ত জীবনকালেই হয়েছে গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংসে ; তাই এর আবির্ভাবে দেখতে পাই এক অভিনব রূপান্তর। দেনাপাওনা শোধ যেখানে হয় সেখানেই মানবসাধনায় উত্তরকালে বা জন্মান্তরে কালান্তরে এক উত্তরণ ঘটে। বুদ্ধাবতারে ঘটেছে তাই। হিংসা থেকে অহিংসা ! জ্ঞানযোগ থেকে বোধিতে।

হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝছিলাম। উনিশ শো যোল-সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সে দিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয় নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে

নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফত জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ। যদুবংশের বিপদের মত।

সে কথা থাক। এখন এই দুটি সত্যকে মেনে—দুটিকে মিলিয়ে একটি করে নিয়ে সেদিন যাত্রা শুরুর প্রথম পদে লিখেছিলাম 'চৈতালী ঘূর্ণী'। 'চৈতালী ঘূর্ণী' বৈশাখের অগ্রদূত এবং আমাদের জীবনেই সেদিন চৈত্র দ্বিপ্রহরে ছোট স্বল্পায়ু ঘূর্ণীগুলি অদূরবর্তী কালবৈশাখীরই ইঙ্গিত দিচ্ছে— এটুকু আমার থিসিস ছিল না—ছিল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি; সে উপলব্ধি ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয় নাই। সেই সঙ্গে এটাও যেন উপলব্ধি করি যে আরও আছে—মানুষের বিশেষ করে এই দেশের মানুষের যাদের আমি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছি— আমি নিজেই যাদের একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরম কাম্য; সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থায় উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। 'মনুষ্যত্ব' কোনও মেড-ইজি উপায়ে পাবার নয়। সমাজতান্ত্রিক বায়োলজি বিজ্ঞানের কথা শুনেছি। আমি বৈজ্ঞানিক নই; অভ্যাসে অভ্যাসে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় কি না হয় সে তর্কে না গিয়েও বলব, মানুষ গিনিপিগ নয়; সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিতে সে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী। মানুষকে অ্যাটম বোমার ঘায়ে মেরে ফেলা যায়; তাকে ভীত করে সাময়িকভাবে হার-মানানোও যায় কিন্তু সত্যকথা জয় করা যায় না। হিরোসিমা, নাগাসিকির মানুষদের প্রকৃতি কি পরাজয় মেনে নিয়েছে? তারা কি কখনোও ভুলতে পারবে এ কথা? অ্যামেরিকা

যেদিন অ্যাটম বোমের আঘাত হেনেছিল তাদের উপর সেদিন যারাই ছিল তাদের দলে—রাশিয়া ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি—সবার উপরেই তাদের বিরাগ মহাভারতের অপমানিতা অম্বার মতই তপস্যামগ্ন হয়ে রয়েছে। বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে মুক্তিই শুধু তার কাম্য নয়—সে জন্মান্তরেও এর প্রতিহিংসা চাইবে। যে আজ যত দান নিয়ে আসুক, যত সাহায্যই করুক, তবু সে ভুলবে না। যাতে ভুলানো যায়, যাতে হিংসা-জর্জর প্রকৃতিকে প্রসন্ন করা যায় সে হল প্রেম, সে হল অহিংসার সাধনা। প্রাণহীন বিকৃত ধর্মগত মন্ত্র জপের অহিংসা নয়। সে অহিংসার সাধনা আমার চোখের উপর দেখেছি। সুতরাং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

(১২)

ও সব কথা যাক। এখন যা ঘটেছিল তাই বলি।

'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই রবীন্দ্র মৈত্র মারা গেলেন। তারপরই আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরলাম। হয়তো শ্বশুর-বাড়িতে আরও কিছুদিন থাকা চলত কিন্তু আমার বড়ছেলের উপনয়নের দিন কাছে এসে পড়ায় ফিরতে হল।

দেশে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই অশান্ত। যে জাগলে মানুষের আর নিষ্কৃতি নেই। মানুষ ঘুরে বেড়ায় স্থান হতে স্থানান্তরে, খুঁজে বেড়ায় এমন কাউকে বা এমন কিছুকে যাকে সে জানে না, চেনে না, বোঝে না।

দেশের অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে তখন। পরিচিত রাজনীতি-ক্ষেত্র তখন দলাদলির বিদ্বেষে জর্জর। গ্রামের সমাজে চিরকালের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে না, সেখানেও আমি নিঃসঙ্গ।

এই অবস্থায় মনে পড়ল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের কথা। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেশে কেন? চলে আসুন এখানে! কলকাতায়। শ্মশান না হলে শব-সাধনা

হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগে কলকাতাই হল বাঙলার সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, একবেলা খেয়ে থাকুন—তবে পাবেন।

সেদিন কথাটা আদৌ মনঃপুত হয় নি। ভেবেছিলাম—কেন? দেশে এসে মনের এই অশান্ত অবস্থায় সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। কিন্তু তাই বা যাব কোন্ ভরসায়? আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার লজ্জা যে কত তা বোধ করি আমার থেকে কেউ বেশী বুঝবে না। সেই লজ্জার পীড়নেই কলকাতায় থাকতে পারি না। স্বাধীনভাবে থাকতে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ উপার্জন তখন আমার সাধ্যাতীত। অন্তত সাহিত্য-সেবা করে হত না। কুড়ি-পঁচিশ টাকা না হলে চলে না। কিন্তু মাসে কুড়ি টাকা উপার্জন কি করে হবে? 'বঙ্গশ্রী'তে গল্প প্রকাশিত হলে পনের টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'তে তো ছমাস অন্তর গল্প প্রকাশিত হবে। সম্পাদক সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছেন।

হতাশার মধ্যে স্থির করলাম থাক এইখানে সাহিত্যসাধনা। কিন্তু তাতেও অশান্ত শান্ত হল না। অবশেষে কাঁধে বোঁচকা বেঁধে একদা বেরিয়ে পড়লাম। মাঘমাস শ্রীপঞ্চমীর পরদিন শীতলাষষ্ঠীতে আমাদের ওখান থেকে পনের মাইল দূরে দৈধা বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপাল দাস বাবাজীর আবির্ভাব-তিথিতে মেলা। সেই মেলায় চলে গেলাম। দুরন্ত শীত তখন। আশ্রয় নিলাম এক গাছতলায়। সেইখানেই ইট দিয়ে উনোন তৈরী করে একবেলা খিচুড়ি রান্না করে দুবেলা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম তিনদিন।

বিরাট মেলা। দৈনিক লক্ষ লোকের সমাগম। চারিদিকে অন্নসত্র। দশ-বিশ মাইল দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তেরা চাল দাল কাঠ বয়ে এনে এখানে খোলে অন্নসত্র। দৈনিক তিন হাজার মণ চাল রান্না হয়। অবিরাম হরিধ্বনি ওঠে। দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা।

পল্লীজীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস আসে ভারে ভারে। দুমকা থেকে আসে কাঠের কারবারীরা; বিস্তীর্ণ আমবাগানে কারখানা খুলে বসে, দরজা, জানালা, তক্তপোশ, পিলসুজ, চৌকি, জলচৌকি, গাড়ির চাকা, চাষের সরঞ্জাম

সব তৈরী করে বিক্রি করে। ওদিকে বাবলা কাঠ ঢেলে রেখেছে স্তূপীকৃত করে; লাঙ্গলের মাথা তৈরী হবে। এরা এসেছে গঙ্গাতীর থেকে। বাবুই সাবুই বিক্রি হচ্ছে, শন পাট বিক্রি হচ্ছে। লোহার সামগ্রী তৈরী করছে কর্মকার, বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আছে মনোহারী, মিষ্টি। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দুটো দোকানের ফাঁক থেকে কেউ হেঁকে ওঠে—ও দাদা! একটি পাথর-বসানো গিলটির আংটি নিয়ে যান। শুনছেন? ও দাদা!

সন্ধ্যার সময় থেকে মেলার আর-এক রূপ।

হরিধ্বনি থেমে যায়। অন্নসত্রগুলি স্তব্ধ। সেখানে জ্বলে শুধু টিমটিমে কেরোসিনের ডিবে। কিন্তু দোকানে দোকানে জ্বলে ওঠে আড়াই শো বাতির স্টোভ ল্যাম্প, অ্যাসেটিলেন গ্যাস বাতি, সারি সারি সুদৃশ্য চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোশের উপর পড়ে জুয়ার আসর। পাঞ্জাবী, পাঠান, বাঙালী জুয়াড়ীরা আসে দেশ দেশান্তর থেকে।

তার পাশেই তাঁবুতে তাঁবুতে বাজী, ম্যাজিক, গোলকধাম সার্কাসের খেলা শুরু হয়। বাজনা বাজে।

একেবারে একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লী; সেখানে জ্বলে ওঠে আলো। রাত্রি বাড়ে, তাণ্ডব শুরু হয়।

দেখে শুনে ওই গাছতলায় বসেই আকাঙ্ক্ষা হল এই মেলার রূপটি ধরব। সেখানেই বসলাম লিখতে। লেখা হোক, তারপর যা হয় হবে। ফেলেই দেব বা আগুনে দিয়ে দেব।

মাঘ মাসের শীতের মধ্যে দৈধার মেলার গাছতলায় বসে 'মেলা' গল্পটি রচনা করেছিলাম। রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের—জুয়ায়-উন্মত্ত মানুষদের—লক্ষ্য করেছি, পাপপঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যা-বাজারে মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছি; ক্লান্ত হলে ফিরে এসে গাছতলায় খড়ের বিছানার উপর বসে লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসেছি। মেলায় ছিলাম দুদিন। দুদিনের পর দৈধার মেলায় আর থাকা অসম্ভব। পুকুরের জল কাদা হয়ে ওঠে, মাঠ ঘাট আশপাশ পঙ্কিল হয়ে পড়ে। বাতাস ভারী হয়ে যায়। তবুও এই মেলা থাকে

এক মাস। আমি আরও দু-চার দিন থাকতাম কিন্তু উপায় ছিল না। দু-তিন দিন পরেই আমার বড় ছেলের উপনয়নের দিন; সেই কারণেই ফিরতে হল।

'মেলা' গল্পের প্রথম পাণ্ডুলিপি বোধ করি আজও আছে। তখন লিখতাম একসারসাইজ বুকে, কপিইং পেন্সিলে। একসারসাইজ বইয়ের ৫৬ কি ৬০ পৃষ্ঠা হয়েছিল প্রথম খসড়াটি। বাড়ি ফিরে এলাম। ছেলের পৈতে হয়ে গেল। তারপর খাতাটা নিয়ে আবার বসলাম। এবার হল ৪০ পৃষ্ঠা। সে আমলে আমি প্রতিটি গল্পই অন্তত দুবার করে লিখেছি, প্রয়োজন হলে তিনবার চারবারও লিখেছি। শুধু যে রচনা উন্নত করবার জন্যই লিখেছি তা নয়, কোন পাণ্ডুলিপিতে হাতের লেখা খারাপ হলে বদলেছি, কাটাকুটি হলেও বদলেছি। শৈলজানন্দের হাতের মুক্তার মত হস্তাক্ষরে সুন্দর সাজানো পাণ্ডুলিপি, অচিন্ত্য-কুমারের চোখ-জুড়ানো পাণ্ডুলিপি দেখে এমনি সুন্দর পাণ্ডুলিপি রচনার উপর খুব একটা ঝোঁক ছিল আমার। পেন্সিলে লেখা খাতা থেকে আমার বাল্যকালের সেই পুরানো নিব লাগানো কলমে লিখতাম। রেডইঙ্ক নিব ছিল আমার প্রিয় নিব। কলমটি আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া কলম। কলমটি ফেটে গেল শেষটায়; তাতেও তাকে ছাড়ি নি। এক টুকরো রূপোর পাতের বাঁধন দিয়ে ব্যবহার করেছি। সেটি আজও আছে। প্রথম ফাউন্টেন পেন কিনেছিলাম ১৯৩৮ সালে।

'মেলা' গল্প লেখা হল, পড়ে থাকল! কোথায় পাঠাব? 'ভারতবর্ষে' 'ডাইনীর বাঁশী' রয়েছে। 'বঙ্গশ্রী'-সম্পাদক ছ মাসের আগে লেখা ছাপবেন না। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' উঠে গেছে। 'প্রবাসী'তে পাঠাতে ভরসা নেই, সেখানে লেখা দেড় বছর ধরে সম্পাদকের বিবেচনাধীন থাকে। তার উপর এই গল্পটিতে মেলার পটভূমিতে উল্লাস ও উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত মানুষের অবদমিত প্রবৃত্তি যে নগ্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় এ গল্পের স্থান হতেই পারে না। এর মধ্যে হঠাৎ কাজের ঢেউ এসে টান দিলে। কাছাকাছি কয়েকখানি গ্রামে লাগল মহামারী। গলায় জলের বোতল ওষুধের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফাল্গুন গেল, চৈত্রেরও কয়েকদিন কেটে গেল এরই মধ্যে। তারপর আবার বেকার। আমাদের সম্পত্তিটুকু দেখা-শুনার ভার

তখন ছোট ভাইয়ের উপর দিয়েছি। মেজ ভাই বাড়িতেই প্রেসটা নিয়ে গোছগাছ করছে। আমি নিতান্তই বেকার। মাঠে মাঠে দিনে দুপুরে বেরিয়ে পড়ি, বেকারত্ব অসহ্য হয়ে উঠলে। তখন আরও একটা প্রবল আকর্ষণ আমায় টানছিল। আমার মেয়ে বুলুর স্মৃতি আমাকে পরলোক রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছিল। শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতাম। রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে বুলুর খেলার স্থানগুলির অদূরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে এসে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতাম।

এরই মধ্যে একদা 'বঙ্গশ্রী' আপিস থেকে কিরণের চিঠি এল, কয়েকটা মামুলী কথার পরই সে লিখেছে, 'কই, 'ভারতবর্ষে' তোমার 'ডাইনীর বাঁশী' বের হল কই? এত দেরি করছে কেন? তার চেয়ে যদি হুকুম কর, তবে 'ভারতবর্ষ' আপিস থেকে ওটা ফিরে এনে 'বঙ্গশ্রী'তে বৈশাখেই বের করে দি। সজনীবাবু উৎসুক হয়ে আছেন।'

সেদিন আরও একখানি পত্র ছিল। রিপ্লাই কার্ডে 'ভারতবর্ষে' পত্র লিখেছিলাম, সেই রিপ্লাই কার্ড স্বর্গীয় জলধর দাদার সংবাদ বহন করে এনেছে—'ভায়া, তোমার গল্প বৈশাখেই বের হচ্ছে।'

কিরণকে পত্র লিখে দিলাম—'ডাইনীর বাঁশী' বৈশাখের ভারতবর্ষে' বের হচ্ছে। তোমাদের জন্য নতুন গল্প দিতে পারি।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম—'আজই ডাকে দাও।' ডাকে না দিয়ে নিজেই রওনা হলাম কলকাতা। কলকাতায় পৌঁছে তৃতীয়বার গল্পটি লিখলাম। 'বঙ্গশ্রী' আপিসে যেতেই কিরণ হাত পাতলে আনছুস? দে।

কিরণ নানা জেলার ভাষা জানত।

লেখা দিলাম। কিরণ পড়লে, পড়ে মুখ ভার করে বললে—এ যে ভয়ানক কাণ্ড করেছিস! তোর সাহস তো খুব। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনী দাসের হাতে এই লেখা দিবি?

সম্পাদক নিজেই দেখা দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই মোটা নাকটা ফুলিয়ে বললেন—কই লেখা? এইটে নাকি? বলেই তুলে নিয়ে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। আমি পলায়ন করলাম। সন্ধ্যার পর মাস-শ্বশুরের

বাড়িতে ফিরেই শুনলাম টেলিফোনে কেউ আমাকে ডেকেছিল। কে তা অবশ্য তাঁরা নাম জিজ্ঞাসা করেন নি। তবে সংবাদ আছে, আমি যেন সন্ধ্যার পর থাকি।

সন্ধ্যার পর কিরণ এল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—সজনীকান্ত বললে কি জানিস?

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—আগে বল গল্প ফেরত দিলে কি না।

—ছাপা হচ্ছে। প্রেসে চলে গেছে। কিন্তু এইটে আর কি কথা। আসল কথা শোন! সজনী দাস বললে—এই লোকটি বাঙলা সাহিত্যে অনেক কথা—এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা—বলতে এসেছে। এঁর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।

'মেলা' গল্পের শেষ একটি প্যারা সজনীকান্ত বাদ দিলেন। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু ছাপা হওয়ার পর পড়ে সজনীকান্তের শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বৈশাখেই (১৩৩৮) 'ভারতবর্ষে' এবং 'বঙ্গশ্রী'তে 'ডাইনীর বাঁশী' এবং 'মেলা' একসঙ্গে প্রকাশিত হল। 'মেলা' গল্পের বাস্তব পটভূমির চিত্র সম্পর্কে অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

এর পরই লিখে ফেললাম আর-একটি গল্প। 'রাজা, রাণী ও প্রজা'। গল্পটি একটি মিষ্টি গল্প। সুখপাঠ্যও বটে। কিন্তু 'মেলা' বা 'ডাইনির বাঁশী'র মতো নয়। সজনীকান্ত শুনলেন, প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—এখন আর 'বঙ্গশ্রী'তে পুজোর আগে লেখা নিতে পারব না। দমে গেলাম। তবে আর ভালো লিখেই বা ফল কি? এই সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। গল্পটি পকেটে নিয়ে গেলাম শৈলজানন্দের বাড়ি। অপরাহ্ন বেলা, শৈলজানন্দ বের হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন—একটু কাজে যাচ্ছি ভাই। সেখান থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরছি—হঠাৎ দেখা হল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পবিত্রকে গল্পটি শোনবার জন্যে ধরলাম। পবিত্র বললেন—এখন তো একটি সভায় যাচ্ছি ভাই। বাগবাজারে কর্মযোগী রায়ের বাড়িতে সাহিত্যসেবক সমিতির বৈঠক। সেখান থেকে ফিরে শুনব। চলুন না সেখান সেরে একসঙ্গে ফিরব।

অনিমন্ত্রিত হয়ে যাব? মনটা খুঁতখুঁত করে উঠল। পর মুহূর্তেই সে খুঁতখুঁতুনি ঝেড়ে ফেলে চলে গেলাম। অনেক সাহিত্যিকদের দেখতে পাব এ

সৌভাগ্যের কাছে অনিমন্ত্রণের লজ্জা ছোট হয়ে গেল। কোন পার্থিব বস্তু পাবার লোভে যাচ্ছি না; যেখানে প্রাপ্তি অপার্থিব পুণ্যময়, সেখানে নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা কেন? ওতে নিমন্ত্রণ লাগে না, কোথাও নাম-গান হওয়ার সংবাদ পেলেই ভক্তকে যেতে হবে। না যাওয়াটাই পাপ। চলে গেলাম।

অনেককেই দেখেছিলাম। সকলের নাম মনে নেই। মনে আছে অগ্রজ-তুল্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে, স্বর্গীয় প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে এবং স্বর্গীয় কর্মযোগী রায়কে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই সেদিন সভাপতি। বৈঠকে গল্প পড়বেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। একান্তে পবিত্রের অন্তরালে বসে রইলাম। পবিত্র দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরাও উৎসাহিত হলেন না, আমিও না। সময়টা গরমের সময়। আমি ঘামতে শুরু করলাম। হঠাৎ সভায় অঘটন ঘটল। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু এসে পৌছুলেন না। শেষে কয়েকজন কবিতা পড়ে আসর শুরু করলেন। এমন সময় রমেশবাবু ব্যস্ত হয়ে এসে সভাপতিকে মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা বলেই আবার চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত উপেনদা বললেন—কবিরাজ সাহিত্যিক বিপন্ন, তাঁর একটি রোগীর অবস্থা অকস্মাৎ মন্দ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের দাবি তিনি রাখতে পারছেন না। রসায়নের দাবি রসের দাবিকে আজ ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং—

সভাভঙ্গের কথাই তিনি বলতে চাইলেন; কিন্তু মুখ ফুটে না বলে ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলেন। সকলেই বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হল। তাই তো!

পবিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—আমি কিন্তু আপনাদের অনুমতি হলে রসের দাবি মেটাতে পারি। আমার সঙ্গে তারাশঙ্কর রয়েছে, সে আমাকে তার নতুন লেখা গল্প শোনাতে এসেছিল। বৈঠকের সময় হওযায় শোনা হয় নি। সঙ্গে ধরে এনেছি, বৈঠকের শেষে বাড়ি ফিরে শুনব। গল্প ওর পকেটেই আছে।

সভার অবস্থা তখন অকস্মাৎ জাহাজডুবিতে খাদ্যসম্ভার জলমগ্ন হওয়ায় রেশনিং ফেল করা ফুড ডিপার্টমেণ্টের মতো। এক্ষেত্রে চাল গমের স্থলে রাঙা আলু কি মানকচুই সই। রেশনিং চালু রাখা নিয়ে কথা। সুতরাং কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়ে অভয় দিয়ে বললেন—বের করুন গল্প। ৺কর্মযোগী রায়ের বাড়িতে বৈঠক,

তিনি এসে আমার পাশে বসে সরাসরি পকেটে হাত পুরে দিলেন। আমি কিন্তু খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার সাহিত্যিক হ্যাংলামিটা যেন সকরুণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, শৈলজানন্দের (বোধ হয় শৈলজানন্দেরই) গল্পের নায়কের হ্যাংলামির মতো। "এক দরিদ্র কেরানী কোন নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। সেখানে কারও কিছু মূল্যবান বস্তু হারানোর জন্যে সকলের পকেট তল্লাস করতে গিয়ে কেরানীর পকেটে পেলেন অনেকগুলি মিষ্টান্ন। দরিদ্র কেরানী গোপনে ছেলেদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল।"

যাই হোক, আসরে পড়তে হল গল্পটি। পড়া শেষ হলে সমালোচনা আরম্ভ হল। একজন কঠোর সমালোচনা করলেন। একটি চরিত্রের পরিণতি নিয়ে সমালোচনা। তিনি প্রমাণ করলেন—এই চরিত্রের পরিণতি এই হতেই পারে না। সুতরাং গল্পটি একান্ত ভাবে ব্যর্থ। এই সমালোচনার পর আর কেউ সমালোচনা করতে চাইলেন না। অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত করবার আর স্থান ছিল না। আমি চুপ করেই বসে রইলাম। ভাবছিলাম বাস্তবে এবং সাহিত্যে এত পার্থক্য কেন? যে চরিত্র নিয়ে এত কথা—সে চরিত্র বাস্তব। 'রাজা, রাণী ও প্রজা' গল্পের রাজা আমি, রাণী আমার গৃহিণী, প্রজা যে সে রাধাবল্লভ, সেও আমার মতো বাস্তব সত্য; ঘটনাটিও পনের আনা সত্য। সমালোচক বললেন—গল্পটিকে মিষ্টি মধুর সুখপাঠ্য করে তোলবার জন্যই চরিত্রটিকে নষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং গল্পটি মিষ্টি হয়েছে সুখপাঠ্যও হয়েছে। তবে সাহিত্যে অচল।

এইবার সভাপতি শ্রদ্ধেয় উপেনদা তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। আমার মাথা তখন মাটিতে নুয়ে পড়েছে, বারবার নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি, কেন এলাম? লোককে লেখা শোনাবার জন্য কেন আমার এই ব্যাকুলতা? ঠিক এই মুহূর্তে কানে ঢুকল—'আমার কিন্তু গল্পটি বড় ভালো লেগেছে। গল্পটির সবচেয়ে বড় গুণ, পড়ে বা শুনে সারা অন্তর একটি পবিত্র মাধুর্যে ভরে ওঠে। আর চরিত্রের কথা? মানব চরিত্র আঙ্কিক নিয়মে পরিণতি লাভ করে না। দুই আর দুই চার সব ক্ষেত্রে হয় না। মানুষের চরিত্রে ও যোগফল তিনও হয় পাঁচও হয়। ওতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই। লেখক নূতন কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ আছে। উজ্জল ভবিষ্যৎ বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেন নি। সভার শেষে আলাপ করে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিন সভান্তে নির্বাক হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। পরের দিন গল্পটি দিয়ে এলাম 'ভারতবর্ষে।' 'ডাইনীর বাঁশী' ও 'মেলা'র জন্যে পারিশ্রমিক দশ এবং পনের পঁচিশ টাকা পেলাম। এবং শৈলজানন্দের সাহায্যে 'উপাসনা'য় প্রকাশিত 'যোগবিয়োগ' উপন্যাসখানির সর্বস্বত্ব গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সকে একশো টাকায় বিক্রি করে অনেক আশায় আশান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। মা এবং পিসিমাকে সেই টাকাগুলি দিলাম, বললাম—রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনে যাবার ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। এই টাকায় তোমরা পুরী যাও। রথের দড়ি টেনে কামনা কর যেন আমার যাত্রা কোন দিন না থামে। ওই টাকার সঙ্গে আমার জীবনের দড়ি জড়িয়ে দিয়ে এস।

সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, এইবার যেখানে হোক—মহানগরীর দীন দরিদ্রেরা যেখানে বাস করে সেইখানেই না হয় গিয়ে বাসা নেব। খাওয়ার ভাবনা করি না, তখন পাইস হোটেলের ছড়াছড়ি। দু আনায় রাজভোগ না হলেও কাছা-কাছি রাজভোগ। স্থির করে আবার বসলাম লিখতে। লিখলাম 'খড়্গ'। গল্পটি শুরু করে চলে গেলাম রাজনগর, ওখানেই শেষ করব গল্পটি।

আমাদের জেলার প্রাচীন আমলের রাজধানী রাজনগরের ধ্বংসস্তূপের পটভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দোতলার একটি অংশ কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা একটি হ্যারিকেন নিয়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে কোন মতে গিয়ে বসলাম সেই ভাঙা দোতলার ছাদে। অন্ধকার রাত্রে চারিপাশে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো ভগ্নস্তূপ এবং অরণ্যের মতো ঘন জঙ্গল। মধ্যে বিরাট কালীদহ দীঘি। সেইখানে বসে লিখে চলেছি, হঠাৎ আলোটা গেল উলটে, সেটাকে তুলতে গিয়েই অনুভব করলাম ভাঙা বাড়িটা দুলছে, চারিদিকে শাঁক বেজে উঠল। ছাদের উত্তর প্রান্তে খানিকটা ভাঙন ভাঙল। বুঝলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। কি করব? স্থির হয়েই বসে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে বুঝলাম ভূমিকম্প থেমে গেছে। এবার দেশলাই জেলে আলোটা জাললাম। ওদিকে নিচে তখন ডাকছেন আমার বন্ধু, যাঁর বাড়িতে রাজনগরে অতিথি হয়েছি। তিনি বললেন, নেমে আসুন মশায়! আলো খাতা তুলে নিয়ে উঠলাম। ভাঙা সিঁড়ি,

সন্তর্পণেই নামছিলাম, হঠাৎ একটা সিঁড়ির উপর দেখি এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত জুড়ে শুয়ে আছে এক বিষধর। রঙ দেখে বুঝলাম গোখুরা। স্থির হয়ে শুয়ে আছে, গাঢ় ঘুমে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি ওকে পার হয়ে যাই কি করে? ভূমিকম্পে ভাঙা দোতলাটাকে খাড়া রেখে ধ্বংসস্তূপে সমাহিত না করে নিয়তি কি এই একেই পাঠিয়ে দিল শেষে? সর্পদংশনে মৃত্যু অনেক দেখেছি আমি। এক সময় চিকিৎসকের কাজ করেছি। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়ফুক বিদ্যায় নয়। মিহিজামের পি, ব্যানার্জীর লেকিসিন ওষুধ রাখতাম। এটি ছিল আমার আর-এক বেকারত্ব বিনাশনের নিমিত্ত বেগার খাটার পথ। সর্পদংশনে বড় যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়। কিন্তু কি করব? আলোটা বাড়িয়ে সামনে ধরে রইলাম। আলোকে অর্থাৎ অগ্নিকে ভয় করে সাপ। আলোটা থাকতে ফণা তুলে আক্রমণ করতে পারবে না। পিছন ফিরে ছাদে ওঠাও অসম্ভব। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিচে থেকে তাগিদ এল—কি করছেন মশাই?

চীৎকার করে জবাব দিতে সাহস হল না। স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম। অকস্মাৎ আমার মুখে অদ্ভুত বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। সাপটা জীবন্ত নয়, মৃত। মুখের দিকটা একটা ফাটলের মধ্যে যখন ঢুকেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কেঁপেছিল ধরিত্রী; ভূমিকম্পের নাড়ায় ফাটলটা কমে এসে সাপটার মুণ্ডটাকে নিষ্ঠুর পেষণে পিসে চেপে ধরেছে। তাতেই মরে গেছে সাপটা।

এই বিস্ময়কর পরিত্রাণের মধ্যে আমি যেন রহস্যময়ী নিয়তিকে চকিতে কৌতুকপরায়ণার মতোই মিলিয়ে যেতে দেখলাম—তাকে দেখলাম না, তার আঁচলের খানিকটা যেন দুলে উঠে মিলিয়ে গেল। অনুমান করলাম, তার অধরে বিচিত্র মধুর পরিহাসের হাসি।

নেমে এলাম।

উৎকণ্ঠিত বন্ধু বললেন—আচ্ছা বাতিক, কি করছিলেন এতক্ষণ? সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কি?

হেসে সব ঘটনা বললাম। তিনি শিউরে উঠে বললেন—আমারই ভুল, আমারই ভুল, ওখানে ভয়ঙ্কর সাপ। আপনাকে যেতে দেওয়া উচিত হয় নি।

আমি আবারও হাসলাম।

বন্ধু বললেন—ও যা হবার তো হয়েছে। ওদিকে দারোগা এসে বসে আছে বাসায়। খোঁজ করতে এসেছে এখানে আপনি এসেছেন কি জন্যে ?

দারোগাটি পূর্বপরিচিত এবং লোকটি ভালো। তিনি বললেন—কালই আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি এসেছেন বিকেলে, রাত্রি আটটায় সাইকেলে আই-বি'র এ-এস-আই এসেছে আপনার পিছনে। দোহা অর্থাৎ সামন্তদোহার ভয়ানক নজর আপনার উপর। পারেন তো জেলা ছাড়ুন। নইলে ও আপনাকে রেহাই দেবে না।

দারোগা চলে গেল।

মনে হল এটাও যেন একটা ইঙ্গিত। ওই কাপড়ের আঁচলের খানিকটা যেন এবারও তুলে গেল।

বাড়ি ফিরেই বিছানা-বাক্স বেঁধে রওনা হলাম। একখানি টিন-ছাওয়া কুঠুরি ভাড়া করলাম, অশ্বিনী দত্ত রোড মহানির্বাণ রোড মনোহরপুকুর রোডের সঙ্গম-স্থলের কাছাকাছি। এসে উঠলাম সেখানে।

জগন্নাথের রথের চাকায় বাঁধা জীবন চলতে শুরু হল। পাকা হয়ে শুরু করলাম সাহিত্যিক জীবন। ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল লাভ-পুরের জীবন। তখন হিসেব করে মনে হয়েছে এর পরিণতি ব্যর্থতায়, এর পরিণতি অর্ধাহারে, হয়তো অনশনে, হয়তো বা ক্ষয়রোগাক্রান্ততায়, এবং শেষে মানুষের পরিহাসে ও ব্যঙ্গে। কিন্তু তবু আমি থামতে পারি নি। মনে মনে শুধু এই বলেছি, ধন নয় মান নয়—শুধু এইটুকু, যেন মৃত্যুর পর মানুষ একবার স্মরণ করে। আর-একটি কামনা জানিয়েছিলাম। যেন হীন প্রবৃত্তি আমার না হয়। চরমতম অভাবেও যেন প্রতারণা না করি, চুরি না করি। ভিক্ষা না করি। এ কামনার সময় স্মরণ করেছি ভগবানকে।

সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল ওই টিনের ঘরে।

যে পথে মানুষ অন্তরের প্রেরণায় চলতে চায়, সে পথে চলার মুখে এসে দাঁড়ায় সহস্র বাধা। নিজের কর্মফল—ঘর, সংসার ও সমাজের সহস্র মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নিজের অতীত কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্য ভাবে ওই সহস্র মানুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে টেনে নিয়ে যায় তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে। সে বন্ধন ছিঁড়ে, সেই শক্তির আকর্ষণ কাটিয়ে যে সরে দাঁড়ায়, চলতে চায় নিজের মনের পথে, জীবনে তাকে সহ্য করতে হয় অনেক। আমাকেও সহ্য করতে হয়েছিল। সে নিয়ে বড়াই কিছু নেই। শুধু চলার পথে এই বাধা-বিঘ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মনের উপর যে প্রভাব পড়েছিল, যার চিহ্ন অবশ্যই আছে আমার রচনার মধ্যে, তাই নির্ণয়ের জন্যই সে কথা বলতে হচ্ছে। এবং আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার পায়ের ছাপ আঁকা যে পথ-রেখাটি দেখতে পাচ্ছি, তার বাঁকগুলিও এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সে জন্যও বলতে হচ্ছে।

আজ যখন খতিয়ে দেখি তখন দেখি, সে-দিন আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে গঞ্জনা-বাক্যই আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল এই বাঁকের ওপারে। নিজের সংসারে গঞ্জনা না থাকলেও নীরব হতাশা ছিল। সে দিয়েছিল খানিকটা ঠেলা। দোষ আজ কাউকেই দিতে পারি না। সত্যই তো, যার হাতে মানুষ কন্যা সমর্পণ করে, যে সন্তানকে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পালন করে বড় করে তোলে, তার সাংসারিক প্রতিষ্ঠা (যে প্রতিষ্ঠার অন্তত বারো আনা হল আর্থিক এবং বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা) দেখতে চায় বইকি মানুষ। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্ভর করে এরই উপর। সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠাকামী আমার সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গ তো ভিত্তিহীন ছিল না! যাক ও কথা। সেদিন কিন্তু এ কথা ভেবে দেখবার মতো মন আমার ছিল না—আমি দুঃখ পেয়েছিলাম, বেদনা পেয়েছিলাম, অভিমান করেছিলাম। সে দুরন্ত অভিমান। আজও মনে পড়ে, অভিমানবশে রাত্রে টিনের ঘরের গরমে বিনিদ্র রাত্রে কল্পনা করতাম—লিখে যাব, এমন কিছু লিখে যাব, যার সমাদর আমার জীবনকালে হবে না; অপরিমেয় দুঃখের মধ্যে একদা অকালে জীবন শেষ হয়ে যাবে, অবজ্ঞাত অখ্যাত চলে যাব; তারপর

একদা দেশের দৃষ্টি পড়বে আমার লেখার ওপর। সচকিত হয়ে লোকে সন্ধান করবে, জানবে আমার জীবনের ব্যর্থ ইতিহাস ; মুখর হয়ে উঠবে। সেই দিন আত্মীয়স্বজন সচকিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করবে। যাকে বলে নিতান্ত অপরিণত বয়সের রোমান্টিক কল্পনা, তাই। অভিমান এবং বেদনার আতিশয্যই বোধ করি আমাকে এমনি করে তুলেছিল।

এর সঙ্গে আর-এক কঠিন ধাক্কা আমাকে এই মোড় ফেরায় গতিবেগ জুগিয়েছিল। সেও আমারই কর্মফলের প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা। উনিশ শো তেত্রিশ সাল বীরভূমের রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনে দুর্যোগের কাল। ওখানে তখন পুলিশ সাহেব হয়ে এসেছেন মহাধুরন্ধর সামসুদ্দোহা। সামসুদ্দোহার পরিচয় বঙ্গবিখ্যাত। সুতরাং পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। মেদিনীপুরে কঠোর দমননীতি চালিয়ে বীরভূমে এসে ফাঁক খুঁজছিলেন। হঠাৎ মিলে গেল ফাঁক। এই সময়ে বীরভূমে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল ছেলে গুপ্তসমিতির পত্তন করে কাজ শুরু করেছিল। এর সংবাদ সযত্নে আমার কাছ থেকেও তাঁরা গোপন করে রেখেছিলেন! হঠাৎ লাভপুর ইস্কুলের একটি ছেলের নামে এল একটি প্যাকেট! ঠিক তার দুদিন পরেই তার বাড়ি খানাতল্লাশ হয়ে গেল। বের হল রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার। ঠিক এই সময়ে লাভপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে হল একটি ছোটখাটো ডাকাতি। ডাকাতদল ফেলে গেল একটি হাণ্টার। কলকাতার আই-বি সে হাণ্টার সনাক্ত করলে শ্রদ্ধাভাজন বিপ্লবী শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলীর হাণ্টার বলে। ভুল সনাক্ত করে নি তারা। হাণ্টারটি শ্রীযুক্ত বিপিনদা স্নেহোপহার দিয়েছিলেন জগদীশ বলে একটি ছেলেকে। জগদীশ সেই হাণ্টার অন্য কাউকে দিয়েছিল। এ দিকে যে ছেলেটির বাড়িতে ইস্তাহার বের হল, সে নির্মম অত্যাচারে অভিভূত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে।

আর যায় কোথা! দোহা সাহেব এক বিরাট কনস্পিরেসি কেস ফেঁদে বসলেন। যে সব পুলিস কর্মচারীর বিবেকে বাধল, মৃদু আপত্তি যাঁরা তুললেন, তাঁদের সোজা বলে দিলেন সরে পড়তে হবে এই জেলা থেকে ; এবং যাঁরা অস্থায়ী ভাবে পদোন্নতি পেয়েছেন তাঁদের নিচে নামতে হবে।

যে যেখানে কর্মী ছিল, তাদের জালে ফেলে গুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন

দোহা সাহেব। এবং দোহা সাহেবের কিছু নেকনজর আমার ওপর ছিল। আমার পেছনে স্পাই লাগল। হঠাৎ একজনের বাড়িতে একখানা বাজেয়াপ্ত বই পেলেন, তাতে নাম লেখা ছিল T. C. Banerjee অর্থাৎ তিনকড়ি ব্যানার্জি। দোহা সাহেব C-টাকে উড়িয়ে দিয়ে S বলে চালাতে চাইলেন। কিন্তু যার বাড়ি থেকে বের হল, সে C-কে S বলে চালাতে দিলে না। এর পরই ঘটল এক সাংঘাতিক ঘটনা। আমাদেরই গ্রামে আমাদেরই পাড়াতে ঠিক সন্ধ্যার সময় উঠল আর্ত চিৎকার, ডাকাত! ডাকাত! নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। সকলেই তখন জেগে ছিল, বেরিয়ে পড়ল, ছুটে গেল, আমি গেলাম সকলের আগে। পাড়ার প্রান্তে এক ভদ্রমহিলা চিৎকার করেছিলেন। তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমার শাশুড়ী। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল খুব অসুস্থ। প্রায়ই তিনি চোর-ডাকাত দেখতে পেতেন। চিৎকারও করতেন। আমি জানতাম এঁর একটা মানসিক জটিলতা ছিল, নিজেকে তিনি অনেক টাকার মানুষ বলে মনে করতেন এবং সর্বদাই সেটা প্রচার করে বেড়াতেন। লোকে মুখ টিপে হাসত। রাত্রে ডাকাত দেখা এবং চোর দেখাটা তারই প্রতিবাদ। বাড়িটাকে তিনি শিক দিয়ে খাঁচার মতো করে তুলেছিলেন।

সে দিন কিন্তু গিয়ে দেখলাম ব্যাপার বেশ একটু গুরুতর। ডাকাতে নিতে কিছু পারে নি, তাঁর চিৎকারের ভয়েই পালিয়েছে, কিন্তু তাঁর কপালে দুটি আঘাতচিহ্ন রেখে গেছে। চার আঙুল দূরে দুটি লম্বা ধরনের স্ফীতি। বললেন, ডাকাতটা এসেই বললে—টাকা দে। ভদ্রলোকের ছেলের মতো পোশাক। হাফপ্যান্টপরা, মুখে রুমাল বাঁধা।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

ডাকাতটা বললে—চুপ।

তিনি তবু চুপ করলেন না।

তখন ডাকাতটা একখানা পিঁড়ি তুলে নিয়ে তাঁর কপালে মারলে এবং ছুটে পালিয়ে গেল! ডাকাত একটাই ভিতরে এসেছিল; ত্রিশ-চল্লিশজন ছিল বাইরে।

আমি কিন্তু মুহূর্তে দেখলাম, তিনি মানসিক ব্যাধিতে কল্পনার ডাকাতদের দেখে ভয়ে নিজেই মাথা ঠুকেছেন ওই শিকের ঘেরার গায়ে।

আমি নিজে ওই শিকের ফাঁকও মেপে দেখলাম। মিলেও গেল। তখন আমাদের থানায় সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন কোন এক মান্না উপাধিধারী ভদ্রলোক। এমন শক্ত, সৎ, সাহসী লোক পুলিস বিভাগে কমই দেখা যায়। আমি দাগী রাজনৈতিক কর্মী হলেও তাঁকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করতে দ্বিধা অনুভব করতাম না। মান্না খবর পেয়ে তদন্তে এলেন, তাঁর চোখেও সমস্তটাই কেমন যেন ঠেকল। প্রসঙ্গক্রমে আমাকে তিনি সে কথা বললেন। তখন আমি বললাম, আমার ধারণার কথা। খানিকটা ভেবে দেখলেন তিনি, তারপর আঘাত দুটির ব্যবধান ও শিকের ব্যবধান মেপে মিলিয়ে দেখলেন। এবং আমাকে বললেন, ঠিক ধরেছেন আপনি।

ওদিকে দোহা সাহেব খবর পেয়ে এলেন ছুটে।

মান্নার রিপোর্ট পড়ে চটে উঠে তাঁকে ধমকালেন। বললেন, এটুকু আক্কেল নেই তোমার! এ ডাকাত নিজেই ওই তারাশঙ্কর। সে তোমাকে ইচ্ছে করে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে। এবার ওকে আমি পেয়েছি।

ভদ্রমহিলাটিকে ডেকে তাঁকে বোঝালেন, এ কাজ তারাশঙ্করের। এবং সাড়ম্বরে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন, তাঁকে কেমন ভাবে আমি মিথ্যাবাদিনী প্রমাণ করেছি। পরিশেষে খোলাখুলি বললেন, আপনি বলুন, তারাশঙ্করকে সন্দেহ হয় আমার। তারপর দেখুন, আমরা ঠিক বের করে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলাটি ছিলেন বিচিত্র মানুষ। 'আমি অনেক টাকার মানুষ' এই ধারণার জটিলতা বাদ দিয়ে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের সত্যবাদিনী এবং দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তিনি শুনে তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। বললেন, এত বড় মিথ্যে কথা বলব আমি? বললে যে আমার মুখ খসে যাবে। নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। যে-মানুষ গ্রামে পাড়ায় বিপদে আপদে ভরসা, তার নামে এই কথা বলব আমি? এই মাস পাঁচেক আগে রাত্রি দুটোর সময় আমার নাতনীর প্রসব-বেদনা উঠেছে—প্রথম প্রসব। আমার বাড়িতে কেউ পুরুষ নেই। শীতকাল, কেউ সাড়া দেয় না, আমি কাঁদছি, আমার কান্নার শব্দ পেয়ে উঠে এল, নিজে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলে, দাই ডেকে আনলে। সেই মানুষ এই কাজ করেছে—এই কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবে? কখনোও না।

এ সত্ত্বেও দোহা আমাকে ছাড়তেন না। কিন্তু সে দিক দিয়ে মান্নার দৃঢ়তা আমাকে বাঁচিয়েছিল। রিপোর্ট বদলাতে বা হুকুমে নিজের ধারণাকে পরিবর্তন করতে মান্না রাজী হন নি।

সব কথাই কানে এল।

মান্না ইঙ্গিতে বলেও দিলেন, বীরভূম থেকে সরে যান আপনি।

কলকাতায় যেখানেই থাকি, বাড়ির দরজায় লোক বসে থাকে। সুতরাং আত্মীয়ের বাড়ি ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে বাসা নিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসলাম।

ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা। লাইট-চার্জ এক টাকা। চা জলখাবার সাত-আট টাকা। খাবার খরচ আটটাকা—এ-বেলা দু আনা, ও-বেলা দু আনা। ট্রাম বাস অন্য খরচ আট টাকা। মাসে তিরিশ টাকা।

মাসখানেক পরেই খবর পেলাম, দোহা সাহেব তদন্ত করছেন আমার গ্রামে, কোন আয়ে আমি কলকাতা থাকি। কি আমার জীবিকা ?

শঙ্কিত হলাম। গল্প লিখে মাসে ত্রিশ টাকা উপার্জন করি—এ প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নয় বলেই মনে হল। অনেক ভেবে অবশেষে ছুটে গেলাম সজনীকান্তের কাছে। পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। ওর নীচে সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা দিতে হবে। এবং 'শনিবারের চিঠি'র মাইনের খাতায় আমার নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে। মাইনে অবশ্য আমি নেব না ; এবং কুড়ি টাকার অধিক বলে খরচ দেখানোর বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যে এক আনার টিকিট লাগে সেটাও আমি দেব। সজনীকান্ত হেসে বললেন, তাই হবে।

এইভাবে আমি 'শনিবারের চিঠি'র সহকারী সম্পাদক হলাম।

উনিশ শো তেত্রিশ সালে ওই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একখানি পাকা-দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করলাম। সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকা-পর্ব শেষ করে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল। কল-চৌবাচ্ছা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম, ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি করে রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হত। আসবাব কিছু ছিল না, একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য

জিনিস থাকত; মেঝের উপর শতরঞ্চি পেতে, স্যুটকেস টেনে সেইটিকেই রাইটিং ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করতাম। কিছুদিন পর আলিপুরের আদালতের কাছে পুরানো আসবাবের দোকান থেকে একটা কুশন-মোড়া আধ-সোফা এবং একটা ফোল্ডিং চেয়ার কিনেছিলাম। বিকেলবেলা ফোল্ডিং চেয়ারটা বের করে বাইরে গলি-রাস্তায় পেতে বসে আরাম করতাম। বিড়ি টানতাম। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আরও বিচিত্র। ওখান থেকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে যেতাম চা খেতে। তা সে যতবারই ইচ্ছে হোক না কেন। দুপুর এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা প্রথম মাসটা করেছিলাম—আমাদেরই দেশের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে। মনোরঞ্জন সরকার, বাদল, সুধীর আরও দু-তিনজন ভাগ্যান্বেষণে ওই-খানেই মহানির্বাণ রোড, অশ্বিনী দত্ত রোড এবং মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনের সংযোগস্থলে কয়লার ডিপো খুলেছিল, তার সঙ্গে ছিল দুধের ব্যবসা, মুদিখানা। ওদেরই সঙ্গে মাসখানেক খাওয়াদাওয়া করেছিলাম, তারপর পাইস হোটেলে।

সকালবেলা গৃহকর্ম সেরে লিখতে বসতাম, বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে লেখা বগলে বেরিয়ে যে কোন পাইস হোটেলে খেয়ে নিয়ে কাগজের আপিসে হাজির হতাম। বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ প্রথম দিকে 'বঙ্গশ্রী' আপিসে এবং সজনীকান্তের 'বঙ্গশ্রী'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে এসে খান দুই-তিন চেয়ার জুড়ে তারই উপর আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতাম। বেলা পাঁচটা ছটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরতাম। যেদিন ফিরতে রাত্রি হত, সেদিন পথেই খাওয়া সেরে ফিরতাম।

এই ঘরখানিতেই কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় বছর। এরই মধ্যে অনেকগুলি ভালো গল্প এবং একখানি উপন্যাস লিখেছিলাম। 'শ্মশানবৈরাগ্য,' 'ছলনাময়ী,' 'মধুমাস্টার,' 'ঘাসের ফুল,' 'ব্যাধি,' 'রঙীন চশমা,' 'জলসাঘর,' 'রায়বাড়ি,' 'টহলদার,' 'আখড়াইয়ের দীঘি,' 'ট্যারা,' 'তারিণী মাঝি,' 'প্রতীক্ষা'—আরও দু-চারটি গল্প এখানেই লিখেছিলাম। এই সময় আরও একটি গল্প লিখেছিলাম, 'মুটুমোক্তারের সওয়াল'—'দুই পুরুষের' বীজ। আরেকটি গল্প লাভপুরে লিখেছিলাম—'নারী ও নাগিনী,' পূজাসংখ্যা 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল। 'আগুন' উপন্যাসও এই ঘরে লেখা। তবে 'আগুনে'র খসড়া তৈরি করেছিলাম বেহার

প্রদেশের মগমা নামক স্থানে, বেহার ফায়ার ব্রিক্স কারখানায়—আমার পিসতুত ভাইয়ের বাসায়।

এই সময়টুকুর স্মৃতি আমার পরম রমণীয়। আজ মনে করতে পারি, সে দিন কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। এবং দুঃখ আমার আশ্চর্য করুণায় ঘুচিয়ে দিয়েছেন ভগবান। কি বলব? ভগবান ছাড়া কি বলব? একদিনের কথা বলি। সকালে সেদিন জল ধরা হয় নি। স্নান করে এলাম কালীঘাটের গঙ্গায়। সেখানে ঘাটে দেখা হল আমাদের ওখানকার ষষ্ঠী দাসের সঙ্গে। সেও গেছে গঙ্গাস্নানে, মনিব-বাড়ির জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যাবে। সে আমায় গঙ্গাস্নান করতে দেখে বিস্মিত হল। ষষ্ঠী চাকরের কাজ করত কালীকিঙ্কর-বাবুর বাড়িতে। সেখানে যখন দুমাস একমাস অন্তর এসে দশ-পনেরো দিন কালিকিঙ্করবাবুর বাসায় থাকতাম, তখন সে আমায় দেখেছে। গঙ্গাস্নানে পুণ্য-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই সে তা জানত। তাই আমাকে সেই দুপুররোদে গঙ্গাস্নানে আসতে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সবিস্ময়েই সে প্রশ্ন করেছিল, আজ আপনি গঙ্গাস্নানে?

আমি হেসে কারণ বললাম।

অপরাহ্ণেই ষষ্ঠীচরণ এল আমার ওখানে। সে বললে, আমি দিনান্তে একবার যখন হোক এসে আপনার কাজ করে দিয়ে যাব। মাও আমাকে বার বার বলে দিয়েছেন—ষষ্ঠী, তুই যাস, কদাচ ভুলিস নে।

মা অর্থাৎ কালীকিঙ্করবাবুর স্ত্রী। সত্যকারের মায়ের মতোই সহোদরার মতোই স্নেহে প্রীতিতে তিনি আমাকে ধন্য করেছেন।

ষষ্ঠী এক বেলা নয়, দু বেলাই আসত। কারণ বিকেলবেলা এসে দেখত ঘর-দোর পরিষ্কার হয়েই আছে। সে আমি ফেলে রাখতাম না। কখনও কখনও তিনবেলা অর্থাৎ রাত্রি নটার পরও এসে হাজির হত। বসে সুখদুঃখের গল্প বলত, আমি শুয়ে থাকলে কাছে বসেই হাত একখানি বা পা একখানি টেনে তুলে নিত কোলের ওপর। আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহকে সুস্থ করে দিয়ে যেত।

ষষ্ঠীর এই স্নেহ, কালীকিঙ্করবাবুর স্ত্রীর এই স্নেহ আমার অন্তরে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ দিয়ে গেছে। ওঁদের অন্তরের মধ্যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি।

এই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে ছিলাম প্রায় বছর দেড়েক। এই বছর দেড়েকেই ষষ্ঠীচরণ আমার যে সস্নেহ সেবা করেছে, সে আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। ষষ্ঠীর একটি গুণ ছিল, অবশ্য তার ব্যক্তিগত গুণ, সে বসেই দিব্যি আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমোতে পারত বা পারে। ষষ্ঠী ঘরে ঢুকে ঝাড়ু হাতে বসল আমার লেখবার জায়গার পাশে, বার দুই-তিন গলা ছেড়ে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলে, আমাকে উঠতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই উঠলাম, সে অন্যের বাড়ি চাকরি করে, সুতরাং তার সময়ের মূল্য আমাকে আগে দিতে হবে। উঠে বেরিয়ে যেতাম রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপর দাদার দোকানে, নয়তো মনোরঞ্জনদের কয়লার ডিপোতে। আধ ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে আসতাম, এসে দেখতাম ঘরখানার কিছু অংশ পরিষ্কার করে ষষ্ঠীচরণ এক জায়গায় স্থিরভাবে উবু হয়ে বসে আছে—এক হাতে ঝাড়ু, অন্য হাতখানার কনুই হাঁটুর উপর, এবং হাতের তালুর উপর মাথাটি ধরে রেখেছে, চোখ দুটি বন্ধ; কখনও কখনও নাক ডাকতেও শুনেছি। আমি ডাকলে তবে তার ঘুম ভাঙত। এতে সে অপ্রস্তুত হত না। সজাগ হয়ে চটপট কাজ সেরে সে চলে যেত।

মধ্যে মধ্যে সে দুঃখ করে বলত, এ আপনি কি করছেন বাবু? চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু যদি করতেন, তা হলে—

আমি এসব ক্ষেত্রে কখনও তার সঙ্গে উপহাস করে কথা বলি নি, বা রসিকতা করেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করি নি। সে আমার অকৃত্রিম হিতৈষী। তবে অকপটেই বলতাম, এ ছাড়া অন্য কাজ আমার ভালো লাগে না ষষ্ঠী, মন লাগাতে পারি না।

ষষ্ঠী মধ্যে মধ্যে বলত, আচ্ছা, কি লেখেন আপনি? মা খুব প্রশংসা করে। বাবুও মধ্যে মধ্যে প্রশংসা করে। শোনান দেখি খানিক আমাকে।

আমি শুনিয়েছি তাকে আমার লেখা! 'ছলনাময়ী', 'মধুমাস্টার', 'রায়বাড়ি', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'ট্যারা', 'তারিণী মাঝি' গল্পগুলি তার ভালো লেগেছিল। এই থেকেই আমি বুঝেছিলাম, বাংলার অতি সাধারণ মানুষদের আমরা আধুনিক লেখক-শ্রেণী যে নির্বোধ বা রসবোধহীন মনে করি, এর চেয়ে ভুল আর কিছু হয় না। যারা রামায়ণ মহাভারত বুঝতে পারে—কৃত্তিবাসী কাশীরামদাসীই শুধু নয়,

গদ্য-অনুবাদ—যেগুলির ভাষায় ছাঁকা সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য এবং ভাগবতের কথকতা যারা বুঝতে পারে, তারা একালের লেখাগুলি বুঝতে পারবে না কেন? দেশের ভাষায় লেখা বিষয় যদি দেশের মানুষই বুঝতে না পারে, তবে সে কেমন লেখা? প্রবন্ধ নিবন্ধ বুঝতে না পারে, এ কালের বুদ্ধিবাদী হিসাবে লেখার যে অংশগুলিকে সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল বলে মনে মনে অহঙ্কার বা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, যাকে বলি ফাইন টাচেস্, সেগুলিও তারা হয়তো বুঝবে না; কিন্তু যে অংশটুকু গল্প, যার আরম্ভ আছে, গতি আছে, এক অনিবার্য পরিণতি আছে, সে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং তার প্রভাবও তাদের উপর পড়বে। আমি দেখছি তাতে তারা অভিভূত হয়, গল্পের পাত্রপাত্রীর সুখে দুঃখে তারা হাসে, তারা কাঁদে। বুদ্ধিবাদী সমঝদারেরা হলেন চাখিয়ে রসিক; তাঁরা চেখে চেখে পরখ করেন রস-বস্তুর পাকটি ঘন কি ফিকে; তাঁদের তারিফের দাম অনেক—রসবস্তুর ভিয়েনের কারিগরের পক্ষে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের জন্য এ বস্তুর দরকার যৎসামান্য। এঁরা মনের গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ কাটছাঁট-করা পালিশ-করা কঠিন কষ্টিপাথরের চাকতি, সোনা-রূপার দাগ যাচাই করে মূল্য নির্ণয় করেন, সোনা-রূপার অলঙ্কারে এঁদের দরকার নেই। সাধারণ মানুষ হল নরম কষ্টিপাথর, সে থেকে বিগ্রহ গঠিত হয়, তারাই পরে এই সোনা-রূপার অলঙ্কার।

এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই রসপিপাসা সত্যকারের তৃষ্ণা। রসিক জনের তৃষ্ণা নিজের চিন্তার মধ্যেই খোঁজে পরিতৃপ্তির পানীয়। এদেশের বড় লেখকেরা অন্যের বই কদাচিৎ পড়েন। সাধারণ মানুষেরাই সাহিত্যের সত্যকারের পাঠক।

বাংলা দেশে এই পাঠকদের সঙ্গে লেখকদের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে। আমাদের লেখকেরা ইংরেজীতে ভেবেছেন, তার পর বাংলায় তর্জমা করেছেন। এবং আমরা যখন লিখেছি তখন ইংরাজী-জানা শিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভেবেছি। এদেশের মাটির সঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা যে ভাবে যে ভঙ্গীতে মাটির বুক চিরে বয়ে এসেছে, সেই ধারা বা ভঙ্গীতে ভাবি নি। ইংরাজী বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্রোতোধারা থেকে ড্যাম বেঁধে, সোজালাইন টেনে ক্যানেল কেটে সেই জল ঢেলে দিতে চেয়েছি এ দেশের মাটির উপর। সমতল শহরের বুকে সে জলের

ধারা এসেছে, কিন্তু অসমতল ভূ-প্রকৃতি পল্লীবাংলার মধ্যে তাকে নিয়ে যেতে পারি নি। প্রয়োজনও মনে করি নি।

এ সব মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প। আমরা সর্বাপেক্ষা প্রকট করতে চেয়েছি তথ্য। গল্প যা, তার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতির ছেদ আছে। সেই স্বাভাবিক পরিণতির আগেই অসমাপ্তির মধ্যে ইঙ্গিত টেনে ছেড়ে দেওয়াটাই আমাদের আধুনিক আর্টের বিশিষ্ট লক্ষণ। সঙ্গীতশিল্পেও গায়ক গান শেষ যেখানে করেন, সেখানটা কলির শেষ শব্দ নয়; মধ্যস্থলেই বিরতির ছেদটিতে ছেড়ে দেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গানটি তার পূর্বেই গাওয়া হয়ে যায়। আমার জীবনে যা উপলব্ধি তাতে গল্পের মধ্যেও গল্পটি এমনি সম্পূর্ণভাবে বলার আগেই ইঙ্গিত দিয়ে গল্পকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ তৃপ্তি পায় না। অসাধারণ মানুষ যাঁরা তাঁরা আমার নমস্য, তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলেছি। তবে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি আমাকে যা লিখেছিলেন বা দেখা হলে বলেছিলেন, তাতে আমার ধারণা জোর পেয়েছিল, বেগ পেয়েছিল। সেই কথাই বলছি।

এর কিছুদিন পরই আমার দুখানি বই প্রকাশিত হল। 'রাইকমল' এবং গল্পসংগ্রহ 'ছলনাময়ী'। 'রাইকমল' প্রকাশিত হল রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে, অর্থাৎ সজনীকান্তের প্রকাশভবন থেকে। একটি বিচিত্র ঘটনার মধ্যে সজনীকান্তের সঙ্গে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক স্থাপিত হল। 'বঙ্গশ্রী' আপিসে আমার খোঁজে একদিন হঠাৎ এল এক দপ্তরী; পরিচয় দিলে, "আমি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র দপ্তরী। সাবিত্রীবাবুর 'উপাসনা'র কাজ করতাম। আমি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র ফর্মা আর রাখতে পারব না। এক শো বই বেঁধে দিয়েছি দেড় বছর দু বছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আর বাকি ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এ বই আমি রাখব না। না নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেব ফুটপাথের হকারদের।"

আমার পায়ের তলায় কাঠের মেঝে। ধর্মতলা স্ট্রীটে পুরানো আমলের বাড়ির সিঁড়ি এবং সিঁড়ির পর দরদালানের মতো অংশটির মেঝটিও কাঠের, সেই কাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে কথা মনে রইল না। মনে মনে বললাম, মা

ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাই। মন্দকবিযশপ্রার্থীর সমাধি হয়ে যাক!

'বাবু! কি বলছেন বলুন?'—কণ্ঠস্বর সেই দপ্তরীর।

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে গোটা আট-দশ টাকা সম্বল। কে আমাকে এখানে টাকা ধার দেবে? পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল চোখের উপর।

এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, ভারী পায়ের জুতোর শব্দ। আরও লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল। সজনীকান্তের পায়ের শব্দ অনুমান করতে ভুল হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করলাম, এ ঘটনা জেনে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্তের অধরপ্রান্তে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাস্য খেলে যাবে। তিনি সেই হাসি হেসে একবার বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবেন! সজনীকান্ত দাঁড়ালেন থমকে, জিজ্ঞাসাও করলেন, 'কি হয়েছে? কি?'

এমন প্রশ্ন করবার জন্য সজনীকান্তের একটি রূঢ় কণ্ঠস্বর আছে। এর উত্তরে আমি কিছু বলতে পারি নি; বলেছিল ওই দপ্তরী। সমুদয় কথা বলে সে সজনীবাবুকেই সালিশ মেনেছিল—'আপনিই বলুন বাবু, এই বই রেখে কি করব আমি? দেড় বছরে—'

তাকে কথা শেষ করতে দেন না সজনীবাবু, ওই রূঢ় কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কত? কত টাকা পাবে তুমি?'

'বোধ করি ছাপ্পান্ন টাকা কয়েক আনা'—দাবি জানিয়েছিল দপ্তরী।

সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বুক-পকেট থেকে ব্যাগ বের করে তার হাতে ছখানি দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার টাকা। বই সমস্ত আমার 'শনিবারের চিঠি'র ঠিকানায় তুলে দাও। বাকিটা মুটে ভাড়া রইল। বেশি লাগলে দেব।' বলেই আর দাঁড়ালেন না, ভারী পায়ে শব্দ তুলে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার কিছুক্ষণ পর চোখে জল এল। বিস্ময়েরও অবধি রইল না। সজনীকান্তের মুখের চেহারায়, নাকের গড়নে, বড় চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু আছে, যাতে তাঁকে অত্যন্ত রূঢ় নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হত। তার উপর 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর

কলমের মুখে যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক সমালোচনা বের হয়, তাতে তাঁর প্রকৃতি-নির্ণয়ে মানুষ প্রায় নিঃসন্দেহেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিস্ময় এই কারণেই। যে মানুষকে ভাবলাম পাথর, তার মধ্যে কোথায় ছিল এই উদারতার নির্ঝর! উদারতাই বলব। প্রীতি বলব না। সেদিন তিনি আমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতিবশে এই কাজ করেন নি। ব্যক্তিগত হিসাবে হয়তো অনুগ্রহবশতই করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা রাখবার জন্য এর মধ্যে একটি সুনিশ্চিত সসম্ভ্রম উদারতা ছিল, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। একা আমি নই; আমাদের সময়ের আরও অনেকে এই ভাবে তাঁর উদারতায় উপকৃত হয়েছেন। তার দলিল দেখেছি আমি, থাক এ কথা এইখানেই। সজনীকান্ত এই ভাবেই হয়েছিলেন আমার প্রকাশক।

কিছুদিন পর 'রাইকমল' আমি নিজেই টাকা খরচ করে ছাপলাম। সজনীকান্তই হলেন আমার প্রকাশক। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে নামটি লিখে দিয়েছিলেন শিল্পী অরবিন্দ দত্ত। এর কিছুদিন পর বরেন্দ্র লাইব্রেরির বরেন্দ্র ঘোষ মশায় আমার প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশ করলেন—'ছলনাময়ী', 'মেলা', সন্ধ্যামণি' এমনি করে দশটি গল্পের সংকলন। পাঁচ শোর সংস্করণ।

এমনিই দিতে হল। গল্পের বই, তাও আমার মতো নতুন লেখকের গল্পের বই টাকা দিয়ে কিনে ছাপাবার মতো বইয়ের বাজার তখন ছিল না। যাই হোক, বই দুখানি সমালোচনার জন্য পাঠানো হল কাগজে কাগজে। দু-একটিতে বের হল, অধিকাংশ কাগজে বেরই হল না। চার-পাঁচ লাইনের সমালোচনা—লেখকের সম্ভাবনা আছে, আশা আছে।

কিছু দিন পর হঠাৎ—হঠাৎ নয়, মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সাহস হত না; আকাঙ্ক্ষা হত কবিগুরুর কাছে বই পাঠাই। তিনি কি বলেন, দেখি। কিন্তু সাহস হত না। ইতিমধ্যেই তখন চারিদিকে আধুনিক লেখকমহলে আমার সম্পর্কে আলোচনা হতে শুরু হয়েছে, অবহেলা করবার উপায় ছিল না, কারণ বড় কাগজে তখন আমার গল্প স্থান পাচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু আলোচনা আপনা-আপনি স্বাভাবিকভাবেই আরম্ভ হয়েছে। তাতে এই কথাই উঠেছে যে, গল্প লেখে বটে, জমাটিও বটে, কিন্তু বড় লাউড, অর্থাৎ স্থূল। সূক্ষ্মতার অভাব

আছে। এই সমালোচনা শুনে রবীন্দ্রনাথের দরবারে বই পাঠাতে গিয়েও পিছিয়ে আসতাম। হঠাৎ একদিন এই দুর্বলতা জয় করে ফেললাম। দুখানি বই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। আর পাঠালাম শরৎচন্দ্রের কাছে। বোধ করি এক সপ্তাহ পরেই একদিন একখানি বিচিত্র খামের চিঠি পেলাম। সাদা খামের এক কোণে 'র' অক্ষর লাল কালিতে ছাপা। ঠিকানার লেখাও রবীন্দ্রনাথের হাতের ; বুকটা ধড়াস করে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। তখন আমি লাভপুরে রয়েছি। লাভপুর পোস্টাপিসের পূর্বদিকে কল্কে ফুলের সারিবন্দী গাছ বেশ কুঞ্জবনের মতো ঘন এবং নিরালা। সেই নিরালায় গিয়ে চিঠিখানি খুললাম। পড়লাম, সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত হাতে লেখা—

"কল্যাণীয়েষু

আমার পরিচরবর্গ আমার আশেপাশে উপস্থিত না থাকায় তোমার বই দুখানি আমার হাতেই এসে পৌঁচেছে কিন্তু তাতে পরিতাপের কোন কারণ ঘটে নি। তোমার 'রাইকমল' আমার মনোহরণ করেছে।"

বুকখানা আবার ধড়াস করে উঠল।

'রাইকমল' মনোহরণ করেছে! আনন্দে উল্লাসে আমার চিত্ত যেন আকাশ-লোকে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছিল সেদিন। একটি কথাও ছিল না, যা নাকি নিন্দার ইঙ্গিত বহন করে। পরিশেষে লিখেছিলেন, 'তোমার অপর বইখানি সময়মতো পড়ব।' কবি তখন কোনও বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছেন। বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে অতিথি হয়ে যাচ্ছেন। আমিও এলাম কলকাতায়। কয়েকদিন পরই এলাম। ঠিক মনে পড়ছে না কার কাছে, তবে কারও কাছে শুনলাম, তিনি বিচিত্রা ভবনের আসরে এক নতুন গল্পলেখকের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন নাকি, এর সম্বন্ধে প্রত্যাশা পোষণ করেন তিনি। আমি চঞ্চল হলাম। কিন্তু কারও কাছেই সে কথা প্রকাশ করলাম না। কে জানে, কার কথা বলেছেন।

দিন দশেক পর বাড়ি এলাম, ব্যগ্রভাবে খোঁজ করলাম—চিঠি? আমার চিঠিপত্র আসে নি?

এসেছে কয়েকখানি। কিন্তু তার মধ্যে ঈপ্সিত পত্রখানি ছিল না। এবার পত্র লিখলাম। সেই পত্রের মধ্যে লিখলাম, "রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন—স্থূল।"

ঠিক চারদিন পরই কবির চিঠি পেলাম। এবার পত্রখানি বড়। তার আরম্ভটাই হল—"তোমার কলমের স্থূলতার অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানি না, তবে গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না লেখার ভান করে, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাও নি, এতেই আমি খুশী হয়েছি।"

এরপর 'ছলনাময়ী' সম্পর্কে কথা। গল্পগুলির প্রশংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে।

এর কিছুদিন পরই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সেই কথা এইখানে বলব। এরপরই তাঁর কাছ থেকে আহ্বান এল।—দেখা কর।

মাসটা চৈত্র মাস, সে আমার মনে রয়েছে। 'প্রবাসী'তে 'অগ্রদানী' গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

আমি গেলাম কিন্তু গেঁয়োর মতোই তাঁকে কোনো কথা জানিয়ে গেলাম না। একদা বিকেল পাঁচটায় শান্তিনিকেতনে হাজির হলাম। কোথায় যাব? সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের উঠানে গিয়ে হাজির হব তীর্থযাত্রীর মতো? তাও ভরসা পেলাম না। স্বর্গত কালীমোহনবাবু আমাকে স্নেহ করতেন কিন্তু তিনি শ্রীনিকেতনে থাকেন ধারণায় সে অভিপ্রায় ছেড়ে গেস্ট হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। নূতন তারাশঙ্করের আবির্ভাবে তখনও নামের আগে শ্রী ছাড়ি নাই বটে তবে দেহশ্রী আমাকে জেলের মধ্যেই ছেড়ে পরবর্তীকালের শ্রীহীন নামের ভূমিকা রচনা করে রেখেছে তখন থেকেই। পরিচ্ছদেও মূল্যগৌরব ছিল না। গেস্ট হাউসে থাকবার অভিপ্রায় অধ্যক্ষকে জানাবামাত্র আমাকে প্রশ্ন করলেন কি অভিপ্রায়ে এসেছি।

বললাম—কবির দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ওখানকার অধ্যক্ষ বললেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখা তো হবে না।

—বললাম সে ব্যবস্থা আমি করে নেব।

—কিন্তু গেস্ট হাউসে তো জায়গা হবে না। রাত্রে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট লোকেরা আসবেন।

—তা হলে? প্রশ্নটা করেই ভাবলাম—যাই তা হলে শ্রীনিকেতন অথবা বোলপুর।

এর উত্তরে অধ্যক্ষ আমার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়েই বললেন—তা হলে এক কাজ করতে পারেন। এ বাড়ির ওপাশে পান্থনিবাস নামে একটি থাকবার জায়গা আছে সেখানে থাকতে পারেন।

সেই পান্থনিবাসেই আস্তানা পাতলাম। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। তিনখানা ছোট ঘর নিয়ে পান্থনিবাস। মাঝের ঘরখানা ওরই মধ্যে বড়। বাকি দুখানায় দুজন, খুব জোর তিনজনের ঠাঁই হয়। আমি একখানা ছোট ঘরেই বিছানা রেখে চায়ের দোকানের খোঁজে বের হলাম। দেখা করব কাল সকালে। খানিকটা মুশকিলেও পড়েছি। খবর দিয়ে আসি নি এবং দেখা করবার হুকুম-নামাও আনতে ভুলেছি। ভাবছি কি করে খবর পাঠাই। চা খেয়ে ফিরে এসে দেখি পান্থনিবাস গুলজার। বহরমপুর থেকে বরাবর বাইসিক্লে চারটি দুঃসাহসী ছেলে এসে হাজির হয়েছে। বাসা পেয়েছে বড় ঘরটায়। তারা হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ করলে। বড় ভালো লাগল ছেলে কটিকে। বললে, কবির সঙ্গে দেখা করবে। সে যে করেই হোক! চেঁচামেচি করবে, না খেয়ে পড়ে থাকবে; পরিশেষে বললে—পরিশেষে গাছের ডালে উঠে ঝাঁপ খেয়ে পড়বার ভয় দেখাবে। সন্ধ্যে বেলা থেকে সুরে বেসুরে তালে বেতালে গান করে তারা এমন জমিয়ে ফেললে যে আমিও তাদের ছেড়ে বের হতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়বার সময় কিন্তু চিন্তিত হলাম তাদের জন্যে। বিছানার মধ্যে বেচারাদের চারটি ছোট বালিশ মাত্র সম্বল আর চাদর একখানা করে গায়েই আছে। প্রশ্ন করলাম—রাত কাটবে কি করে? মশারি আনেন নি। তারা হেসেই সারা। বহরমপুরের ছেলেদের মশার ভয়?

মশা? মশাই, সারাদিন বাইসিক্ল ঠেঙিয়েছি। পড়ব আর ঘুমোব।

একজন বললে—নাসিকাগর্জনের শব্দে বেটারা বিশকোশ দূরে পালাবে।

অগত্যা আমি গিয়ে শুলাম। শুয়েও ঘুম এল না। গরম তো বটেই, তবে মনের উত্তেজনাই প্রধান কারণ, মনে মনে কবির সঙ্গে দেখা করে কি করব কি বলব তারই মক্স করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল ছেলেরা ও ঘরে মারপিট শুরু করেছে। চটপট চড়-চাপড়ের শব্দ উঠছে। কিন্তু কই, বাদানুবাদ কই? কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনলাম—উঃ! উঃ! এই মেরেছি!

বুঝলাম মশা।

আধঘণ্টা পরেই শুনলাম—একজন প্রস্তাব করলে—চল বাইরে যাই।

হুড়মুড় করে বেচারারা বাইরে চলে গেল।

আবার কিছুক্ষণ পর ফিরল। আবার সেই চড়-চাপড়।

আর থাকা গেল না। ডেকে বললাম—আসুন আমার মশারির মধ্যে কোন রকমে পাঁচজনের বসে রাত কাটানো তো চলবে!

বেচারীরা বাঁচল। মুখেও তাই বললে—বাঁচালেন।

তারপর বলে—গল্প বলুন মশায়।

বললাম—দোহাই। সহ্য হবে না। গল্প জানিও না, আর আমি মশা[illegible] গল্পের উপর হাড়চটা। রাত বারোটা বেজে গেছে, এখন চুপচাপ বসে ঢুলতে ঢুলতে যতটা পারেন ঘুমিয়ে নিন।

রাত্রি চারটে বাজতেই ওরা বললে—আর না। এইবার আমরা বাই[illegible] বেরিয়ে পড়ব। অনেক জ্বালিয়েছি আপনাকে। তাই বেরিয়ে পড়ল। কো[illegible] বাধা নিষেধ শুনলে না।

সকালে কালীমোহনবাবুর খোঁজে বের হলাম। কবির কাছে সংবাদট[illegible] পাঠাব। হঠাৎ দেখা হল আমাদের জেলার সুধীন ঘোষের সঙ্গে। তিনি তখ[illegible] কবির খাসমহলের কলমনবীশ।

তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি কখন?

বললাম বিবরণ। তিনি তিরস্কার করে বললেন—দেখুন তো কাণ্ড। গুরুদে[illegible] শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন। আমাদের তো বাকি থাকবেই না আপনিও বা[illegible] যাবেন না।

আমি বললাম—কালকের কালটা যখন ভূত কালে পরিণত হয়েছে তখ[illegible]

কাজ কি আজ তার জের টেনে? কালকের কথাকে গয়াধামে পিণ্ড দান করে আজ থেকেই পালা শুরু হোক না। এখন দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিন।

বললেন—আমি এখনই চললাম। আপনি যেন পান্থনিবাসেই থাকেন।

তিনি চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ এই সময় দেখা হল অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সব শুনে বললেন—দেখুন তো মশায়! আমি যে পাশেই রয়েছি। আসুন চা খাবেন আসুন।

আমি বললাম—স্থানত্যাগে নিষেধ আছে।

তিনি বললেন—সে ব্যবস্থা আমি করছি। পান্থনিবাসে কি বলে এলেন তিনি।

অতঃপর তাঁর সঙ্গে না-গিয়ে উপায় রইল না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শুনলাম—সুধীনবাবু আমার খোঁজে এসে ফিরে গেছেন। আমি আবার বেকুব বনে গেলাম।

উত্তরায়ণ পল্লীর ফটকের কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম—শান্তিদেব প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীতযন্ত্র হাতে ঢুকছেন। শুনলাম কিসের যেন রিহারশ্যাল হবে। ছায়াঘন কালো কাঁকরের পথ বেয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তাঁর ছেলে শান্তিদেবের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। তবে তাঁকে আমি চিনতাম।

হঠাৎ দেখা হল কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন—আরে আপনি?

নিবেদন করলাম সব। তিনি সস্নেহে তিরস্কার করে বললেন—আমি শ্রীনিকেতনে বাস করি কে বলল আপনাকে? আসুন এখন। এখন এখানে গানের পালা বসছে। এখন দেখা হবার সময় নয়।

ওঁর বাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে পান্থনিবাসে ফিরলাম। শুনলাম সুধীনবাবু আরও দুবার খুঁজে গেছেন। আমার আর আপশোসের বাকি রইল না। চুপ করে বসে আছি। আবার এলেন সুধীনবাবু। বললেন—কি লোক আপনি মশায়? গুরুদেব তিনবার পাঠালেন আমাকে। বললেন—সে গেল কোথায়? উঠেছে কোথায়? আমি বলেছি গেস্ট হাউসে উঠেছেন। গেলেন কোথায় কি করে বলি? বললেন—খোঁজ কর। দেখ কোথায় আটকে গেল বলে দিলেন দুপুর বেলা ওকে নিয়ে এস। আর যেন কোথাও না যায়।

সেই চৈত্রের দুপুর! বীরভূমের উত্তাপ! আমি পান্থনিবাসের উত্তরদিকের ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে পথের পানে চেয়ে রয়েছি। দেখলাম একখানা গামছা মাথায় দিয়ে সুধীনবাবু আসছেন। কবি তখন 'পুনশ্চ' নাম্নী বাড়িখানিতে থাকতেন।

ঘরের দরজায় এসেই বুক গুরগুর করে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন—আসুন!

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম—প্রশান্ত সৌম্য স্বর্ণকান্তি দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে আমি। কবির সামনে টেবিলের উপর লেখা কাগজ, হাতে কলম, কাগজের ওপাশে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপ ফুল, ওপাশে খোলা জানালার ওধারে বিস্তীর্ণ মুক্ত লালমাটির প্রান্তর দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে; পাতা উড়ছে চৈতালী হাওয়ায়, কয়েকটা গাছে নতুন পাতার সমারোহ। উত্তপ্ত বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাঁকে ভালো করে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। বললেন—এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ! কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

এবার আমি নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার আপনাকে দেখেছি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বোলপুর স্টেশনে ঠিক এমনি দৃষ্টি দেখেছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চোখে। এমনি স্মৃতিমন্থন-করা প্রশ্নভরা সন্ধানী দৃষ্টি!

আমার কথায় তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন—না—না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। বৎসর পাঁচেক আগে ১৯৩৩

সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন কবি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসঙ্কোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি। বস তুমি বস।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

—কি কর?

বললাম—করার মতো কিছুতেই মন লাগে নি। চাকরিতেও না, বিষয়কাজেও না; কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছ?

—হ্যাঁ।

—ও পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ!

—জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

—সেইটে সত্যি হোক। তা হলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি করে?

—কিছু দিন সমাজ-সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়-কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারি আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি, কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়ি নি।

তারপরই হেসে বললেন,—তবে এ কথার শুরু প্রথম আমিই করেছি। আমি যখন বাংলাদেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতানার রাজত্ব চলেছে।

আবার বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট করে রইলাম।

আবার বললেন—দেখবে—দুচোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই দুখীরাম রুই এদের কথা—

ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখেছি কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এরপরই কথা উঠল লাভপুরের।

সেখান থেকে কেমন করে কি জানি কথাটার মোড় ঘুরে গেল—সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গের দিকে। ওই, আমার কলমের স্থূলতার অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভরে উঠল। বললেন—ও-দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জান তারাশঙ্কর? বলি, ভগবান, পুনর্জন্ম যদি হবেই তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। বিবেচনা করলাম না কাকে বলছি, কি বলছি, বলে উঠলাম—না-না এ কথা আপনি বলবেন না। না-না!

হাসলেন তিনি এবার। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাকে; বাঁচিয়ে রাখতে পার যেন।

আর কথা হল—তখনকার লীগ রাজত্বে বাংলা ভাষাকে যে আরবী ফারসী শব্দবহুল করবার চেষ্টা হচ্ছিল তাই নিয়ে। বললেন,—তাই তো ভাবি, যা করে গেলাম তা কি এরপর শিলালিপির ভাষার মতো গবেষণার সামগ্রী হয়ে তাকে

তোলা থাকবে! অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে উত্তরদিকের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের পানে চেয়ে রইলেন।

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, তোমার 'ডাইনীর বাঁশী'র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভালো লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

কথার জের টেনে তিনি বললেন—কলকাতায় একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান? আমি দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরবে চেয়ে রইলাম। কবি বললেন—তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন উইচক্র্যাফ্‌ট নিয়ে বাংলা গল্প। এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারে গ্রাম্যলোকের মতোই বলে উঠলাম, না-না। স্বর্ণ ডাইনী যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদেরই কাছারি বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশানকোণে তার বাড়ি। আর—

এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম—আমি তো ইংরিজীও ভালো জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমার দেশে। কোথায় পাব? ওদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়ি নি।

কবি হেসে বললেন—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝবার জন্য। ডাইনী মানে ওঁদের কাছে উইচক্র্যাফ্‌ট হলেই সে ইউরোপ ছাড়া এদেশে কি করে হবে। আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম; বললুম—উঁহু উঁহু! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক্ ধুক্ করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে

আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল ; গল্পটা মনে পড়ে গেল।

ওদিকে অপরাহ্ণের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে।

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বললেন, এখানে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইল। আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পান্থনিবাসে।

আমি আর একমুহূর্ত দেরি করলাম না। আমার আর ঠাঁই নাই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চলে এলাম লাভপুর।

চিঠি পেলাম এমন করে চলে এলাম কেন ?

ওই কথাই লিখলাম—আর আমার নেবার জায়গা ছিল না ; আমি যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তারই মধ্যেই চলে এসেছি।—কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর যে কথা বলছিলাম, সেইকথা বলি। প্রায় মাস কয়েক পর হঠাৎ ট্রেনে দেখা হয়েছিল স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়দের সঙ্গে। তাঁরা ইণ্টার ক্লাসে, আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী। বর্ধমান স্টেশনে প্ল্যাট্‌ফর্মে তাঁরা নেমেছেন, আমিও নেমেছি। আমাকে দেখে কালীমোহনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় ডাকলেন, শুনুন, শুনুন।

টেনে তুলে নিলেন নিজেদের গাড়িতে। বললেন, ভাড়া লাগে দেওয়া যাবে।

স্বর্গীয় সুকুমারবাবুও আমার পরিচিত ব্যক্তি। রামানন্দবাবুর ভাইপো এবং দীর্ঘকাল বীরভূমে ছিলেন এস. ডি ও.। শুধু তাই নয়, এতবড় সমাজকর্মী সচরাচর দেখা যায় না। অবসর নিয়ে কবিগুরুর কাজে লেগেছেন—শ্রীনিকেতনে, কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। কালীমোহনবাবু আমার সঙ্গে সুকুমারবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুকুমারবাবু বললেন, গুরুদেবের আদেশে আপনার গল্প আমরা সেখানকার বুড়োদের আসরে পড়ে শোনাই। বয়স্কদের আসরে এ কালের কি লেখা পড়ে শোনাব, আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না। গুরুদেব বললেন, তারাশঙ্করের গল্প পড়ে

শোনাও তো, আমার মনে হয় বুঝতে পারবে ওরা। এইটে ও পেরেছে বলে মনে হয় আমার। দেখ তো পরীক্ষা করে।

তা, পারছে বুঝতে।—বললেন স্কুমারবাবু। কবি বলেছিলেন—

মাটিকে এবং মাটির মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যোগ আছে।

এই সঙ্গে 'রাইকমল' প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর কথা বলব এবার। একখানি বড় কাগজে বইখানির সমালোচনা দীর্ঘকাল ধরে হয় নি! একদিন ঐ কাগজের একজন বন্ধুস্থানীয়কে তাগাদা দিতে গিয়ে তাঁকে একটু আঘাত দিয়ে ফেললাম। এর পরই সমালোচনা বের হল 'রাইকমলে'র নিন্দা করে। তবে 'রাইকমল'কে নিন্দা করতে গিয়ে তিনি, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ—এঁদের বৈষ্ণবী চরিত্রেরও নিন্দা করলেন। লিখলেন, বৈষ্ণবী চরিত্রের যা সত্যকারের পরিচয়—তাতে তারা সমাজের কলঙ্ক; অনেক ঘষে মেজে রাঙিয়ে নিয়েও এঁদের সৃষ্ট কোন বৈষ্ণবী চরিত্র নিয়েই বাংলা-সাহিত্য গৌরবান্বিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ যে উৎসাহ দিলেন, সেই উৎসাহ আমাকে সেই শক্তি দিয়েছিল, যে শক্তিতে ডাক শুনে কেউ সাড়া না দিলেও অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে মানুষ একলা পথ চলতে পারে। এবং এই সময়ে মহাকবির মনের গতিরও আভাস পাওয়া যাবে এই থেকে। সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মানুষের যোগ স্থাপন করতে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

মানুষের জীবনে উৎসাহের প্রয়োজন আছে।

তন্ত্রসাধনায় শুনেছি, সাধককে 'ভয় নাই'—'মাভৈঃ' এই কথা শোনাবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে বসে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় ওই সিদ্ধ সাধকের ওই অভয়বাণী। সাধনায় রত সাধকের সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর হয়, নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী আমার কাছে সেই অভয়বাণী।

আমি এ দিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। প্রথম জীবনে আমার সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁদের ও আমার রচনার সুরের অমিলের জন্য যতই নিঃসঙ্গতা অনুভব করে থাকি, যতই বিরূপ সমালোচনায় সমালোচিত হয়ে থাকি,—পূর্বাচার্যগণ, সাহিত্য সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সে সময়, তাঁদের কয়েকজনের অভয় এবং

উৎসাহ আমি পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন আচার্য মোহিতলাল। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন আমার 'ধাত্রী দেবতার' প্রকাশকাল পর্যন্ত। এবং তাঁর কাছে যে কোন সংশয়ে ছুটে যাওয়ার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না। তাঁকে খানিকটা ভয়ও করতাম আমি। এ ছাড়াও শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া তাঁর কাছে না-যেতে পারার একটা প্রধান কারণ। আমি গ্রামের মানুষ, ওখানে গিয়ে শহরের এবং বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের সর্বস্থানের বিদগ্ধ মানুষদের গ্রাম্য বেশ দেখে ভয় পেতাম, সঙ্কুচিত হতাম। গ্রাম্য মানুষ শহুরে সাজলে হাস্য-কৌতুকের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় শহুরে মানুষের কাছে। কিন্তু শহুরে মানুষ গ্রাম্য মানুষ সাজলে গ্রাম্য মানুষেরা শঙ্কিত হয়, ভীত হয়। তাঁদের আচারে আচরণে বিনয়ে সব জায়গাতেই আসল মানুষটা আড়ালে থাকে, অভিনেতার আসল ব্যক্তিত্বের মতো। রবীন্দ্রনাথে যে আচার-আচরণ তাঁর সাধনা-লব্ধ দিব্যভাবের মতো স্বাভাবিক ও সহজ, অন্য লোকের পক্ষে সে আচার-আচরণ সহজেই কৃত্রিম বলে ধরা পড়ে। এমন ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের সন্দেহের সৃষ্টি করবেই। শান্তিনিকেতন আমার দেশের দশ-মাইল দূরের ভুবনডাঙা। সেখানকার সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের। ওখানে আগে আগে গ্রাম্য পোশাকী দু-একজন অতি বিদগ্ধ তরুণদের হাতে আমি কঠিন ধাক্কা খেয়েছিলাম। চমৎকার মিষ্ট ভাষায় সবিনয়ে অবলীলাক্রমে মর্মভেদী রহস্য করে আঘাত করেছিলেন। এবং এমন সন্দেহও করেছিলেন যে, আমার নির্বুদ্ধিতার গণ্ডারের চামড়ায় খোঁচা মেরে যে কৌতুক তাঁরা অনুভব করলেন সেটা নেহাতই এক-তরফা। আমাকে আঘাত লাগে নি। লাগলেও বুঝতে পারি নি। অবশ্য গ্রামের লোকে রসিকতা জানে না, তা নয়। জানে। অনেক ক্ষেত্রে এই সব শহুরে মানুষদের, শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার মতো শ্রীকান্তের ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত গায়ের কাপড়টা গায়ে দিতে হয়; সে অবশ্য নিজের দোষে। গ্রামের লোকে রসিকতা জানলেও অতিথির উপর তা প্রয়োগ করে না, আগন্তুকের উপরেও না। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে আমার দ্বিধা ছিল। তিনি কিন্তু এই যাওয়া-আসা চেয়েছিলেন। এমন কি "শান্তিনিকেতনের একটা কোণ দখল করে বসলে" তিনি খুশী হতেন—এমন

কথাও আমাকে লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে আমি পারি নি। মুখেও রবীন্দ্রনাথ আমাকে এ কথা বলেছিলেন। সেই বোধ হয় তাঁর সঙ্গে আমার শেষবার সাক্ষাৎ। এর আগে আরও কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে, মেদিনীপুরে। চিঠিও পেয়েছি তাঁর। সে সব কথা পরে বলব। শেষবারের কথাটা সে সবের আগে বলতে চাই এই কারণে যে এইবারে তিনি শান্তিনিকেতন এবং দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বীরভূমের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তাছাড়া এইবার রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র রূপ আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেই কথা এইখানে বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

লাভপুর থেকে শান্তিনিকেতন গেলাম। উত্তরায়ণে গিয়ে শুনলাম, কবি চীনাভবনে গেছেন,—একটি নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান আছে। আমি ফিরে একটু চায়ের সন্ধানে পুরানো গেস্ট-হাউসের এলাকার মধ্যে কাচ-বাংলার পাশে কাঁকর-বিছানো পথের উপর পৌঁছেছি, এমন সময় কবির গাড়ি ওদিক থেকে এসে পৌঁছল। আমার কাছাকাছি একজন ভিন্নপ্রদেশবাসীও দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়িতে ছিলেন কবি এবং সুধাকান্তদা। গাড়িটা থেমে গেল! সুধাকান্তদা নামলেন এবং আমার হাত ধরলেন। ইতিমধ্যে ওই ভদ্রলোকটি কবির কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সুধাকান্তদা ছুটে গেলেন আবার। কবি কি বললেন এবং লোকটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সুধাদা আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, চলুন, আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার ভার আমার ওপর দিয়ে গেলেন। বললেন, তারাশঙ্করকে নিয়ে এস। এঁর কি কথা আছে বলছেন, আমি কথাটা শেষ করে ফেলি এর মধ্যে। আমরা কথা বলতে বলতেই উত্তরায়ণের সামনে বেদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বারান্দায় বসে কবি লোকটির সঙ্গে কথা বলছেন, কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চ এবং তীক্ষ্ণ।

সুধাকান্ত বললেন, কি হল? গলা চড়ছে কেন?

আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, কবি পিছনের ঠেস দেবার জায়গা থেকে সরে সোজা হয়ে বসেছেন।

হঠাৎ কবি উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, বনমালী! আবার ডাকলেন, বনমালী! বনমালী! তারপর ডাকলেন, মহাদেব! মহাদেব!

কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় চড়ছে। এর পরই ডাকলেন, সুধাকান্ত! সুধাকান্ত! এরা কি ভেবেছে বাড়ির মালিক মরে গেছে? তখনকার কবির মূর্তি বিস্ময়কর-রূপে প্রদীপ্ত। যেন প্রখর রৌদ্রে কাঞ্চনজঙ্ঘা চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে প্রখর হয়ে উঠেছে। সমস্ত উত্তরায়ণ সে কণ্ঠস্বরে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এ পাশের ও-পাশের বাড়ি থেকে দুজন-একজন উঁকি মারলেন। তাঁদের মুখে শঙ্কার চিহ্ন। দু-একজন উত্তরায়ণের প্রবেশ-পথে যাচ্ছিলেন বা আসছিলেন, তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। আমার মনে হল, গাছপালাগুলিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুধাকান্ত ছুটে গেলেন কবির কাছে এবং প্রথমেই সেই ভদ্রলোককে উঠতে অনুরোধ করলেন। তিনি উঠে চলে গেলেন। কবি সোজা হয়েই বসে সুধাকান্তের সঙ্গে কথা বললেন। আমি ভাবছিলাম, ফিরে যাই। কবির এমন ক্রোধ ক্ষোভ আমি দেখি নি। এই অবস্থায় কি তাঁর সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত হবে? সেই মুহূর্তেই সুধাকান্তদা নেমে এলেন। বললেন, চল, তোমার তলব পড়েছে।

চুপি চুপি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

সুধাদাও চুপি চুপি বললেন, লোকটি বড় উদ্ধত, শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে অশিষ্ট ভাষায় অপমান করবার চেষ্টা করেছে। উনি রেগেছেন, কিন্তু লোকটি অতিথি আগন্তুক, ওকে তো রেগে কিছু বলতে পারেন না। অথচ নিদারুণ ক্ষোভ! সেটা ওই বনমালী, মহাদেব এবং পরিশেষে এই সুধাকান্তকে হাঁক দিয়ে বের করে দিলেন।

কথা বলতে বলতেই বারান্দায় উঠলাম এবং প্রণাম করলাম। কবি তখনও সোজা হয়ে বসে। আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, শান্তি-নিকেতন জায়গাটি তো আমার খারাপ বলে মনে হয় না। যাঁরা আসেন, তাঁদেরও ভালো লাগে। তোমার কেমন লাগে?

কণ্ঠস্বর শুনে এবং প্রশ্নের ভঙ্গী দেখে ভীত হলাম। ত্রস্তভাবেই বললাম, আমারও ভালো লাগে।

গম্ভীর কণ্ঠে এবার বললেন, তাহলে তুমি শান্তিনিকেতনের নিন্দা করে বেড়াও কেন?

আমি একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তবুও বলবার চেষ্টা করলাম, কই না তো। আমি তো কখনও কারও কাছে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে কিছু বলি নি।

তবে? তবে তুমি শান্তিনিকেতনে আস না কেন? তোমার বাড়ি তো এই কাছেই, নিত্য আসা-যাওয়া করা চলে। এবার কণ্ঠস্বর প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সন্ত্রস্ত ভাব দেখে মিষ্ট হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, বস।

বসলাম। তিনি বললেন, আমি আশা করেছিলাম, এখানকার একটা কোণ আগলে তুমি বসবে। কিন্তু সে তুমি এলে না। এখানে আসাও তোমার দীর্ঘকাল পরে পরে। কেন বল তো?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, এমনই বিব্রত থাকি কাজে যে, সময় করতে পারি না। মিথ্যা কথাই বলেছিলাম।

তিনি সামনের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্নভাবেই বলেছিলেন, কি এত কাজ? কাজ করতে হলে তো বোলপুরে আসতে হয় গো তোমাকে। তোমাদের মুনসেফী কোর্ট। বিষয়কাজ করবে আর কোর্টে আসতে হবে না—এ তো হয় না। তোমাকে যে টেনে আনবে। তুমি তো নিশ্চয় বোলপুরে আস।

না। ও-পথ আমি মাড়াই না।

বল কি? তবে বিষয়কর্ম চলে কি করে? যন্ত্র বেগড়ালে কারখানায় পাঠাতেই হবে। বিষয় থাকলে গণ্ডগোল বাধবেই, আর সে গণ্ডগোলের মীমাংসার জন্যে আদালত হাঁটতেই হবে।

আমি এবার স্বীকার করলাম, বিষয়কর্ম আমি দেখি নি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কই রাখি নি। ও যা করবার করে আমার ছোট ভাই। আমি কিছু গ্রামের কাজ করি। কালীমোহনবাবু জানেন।

তবে শ্রীনিকেতনে আসছ না কেন?

আমি একটু চুপ করে রইলাম, তার পর বললাম, আছে একটু যোগাযোগ। তবে গ্রামে না থাকলে তো গ্রামের কাজ হয় না।

কবি নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, তা হলে তোমায় টান অন্যায় হবে। তোমার ইচ্ছা নেই। একটু মৃদু হাসলেন। তার পর বললেন, এ জেলার লোকের কাছে এ জায়গাটা বিদেশ হয়েই রইল। কোথায় যে রয়েছে মাঝখানের খাতটা!

কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর। সে আমার আজও কানে বাজছে!

মোহিতলালের সঙ্গে আমার যোগাযোগে এই ধরনের কোন বাধা ছিল না শহরেরই মানুষ মোহিতলাল, কিন্তু বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ছিল তাঁর পরিচয়, এবং প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল এই সংস্কৃতির প্রতি। সে পরিচয় আধ্যাত্মিক, এবং ভালোবাসা নিখাদ আত্মিক। এই ভালোবাসা দিয়ে তিনি গ্রামপ্রধান বাংলা দেশকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর আশেপাশে ভক্তদলের মধ্যে ওই ধরনের গ্রাম্য-পোশাকী শহুরে আলপিন-গোঁজা-লাঠিধারী কেউ ছিল না। শান্তি-নিকেতনের এঁদের সংখ্যা সেকালে দু-একজন হলেও তাঁরা ছিলেন একাই এক শো।

মোহিতলালের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল 'বঙ্গশ্রী'র কল্যাণে। সজনীকান্তেরও গুরুস্থানীয় ছিলেন তিনি। তাই 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর উপদেশ এবং লেখা সম্পর্কে মতামত ছিল অপরিহার্য। প্রতি সপ্তাহেই তাঁর পত্র আসত। প্রতি মাসের কাগজ বের হলেই তার লেখাগুলি পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করে পাঠাতেন।

বোধ করি আমার প্রথম লেখা 'শ্মশানঘাট'ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় গল্প 'মেলা' পড়ে পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। সেই বৎসরই পূজার সময় 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্মশানবৈরাগ্য' এবং 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল 'ঘাসের ফুল'। (ঘাসের ফুল' গল্প পড়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিচারে এমন গল্প আমি দুটি-চারটির বেশি লিখি নি।)

মোহিতলালের বিশেষত্ব ছিল এই যে, ভালো লাগলে অকুণ্ঠভাবে তা তিনি ঘোষণা করে বলতেন, ভালো না লাগলে সেও তিনি বলতেন প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে। নিন্দায় প্রশংসায় তাঁর খাদ ছিল না।

প্রথম তাঁকে দেখলাম 'বঙ্গশ্রী'-আপিসে। দেখে ভীত হয়েছিলাম। তাঁর

দৃষ্টি, তাঁর বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর শুধু বলিষ্ঠই নয়, কিছু পরিমাণে উগ্র। মতবিরোধে আপোস নেই। মীমাংসা একমাত্র যুদ্ধেই সম্ভব। আত্মপ্রত্যয় পাহাড়ের মতো দৃঢ়। তাঁকে নড়ানো যায় না। নিজের উপলব্ধি ছাড়া কারও কথা তিনি মেনে নেন না। তাঁব মতে যা মিথ্যা, যা অসুন্দর, তার বিরুদ্ধে তিনি খড়্গধারী। জীবনে ভালোবাসেন শুধু সাহিত্য। আহার নেই, নিদ্রা নেই, মানুষটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য-আলোচনা ও পাঠ নিয়ে বসে আছেন। আমাকে সেদিন আমার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে জানার মতো জেনে নিয়েছিলেন সব।

তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে তাঁর গভীব আকর্ষণ ছিল। ইংবেজী অনুবাদে তন্ত্রশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন অনেক। তাই যখন শুনলেন যে, আমরা পুরুষানুক্রমে শক্তি-তন্ত্রেব উপাসক তখন আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছিলেন, আপনি নিজে তন্ত্রসাধনা করেছেন?

বলেছিলাম, দীক্ষা হয় নি। তবে গুরুর তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি।

তার পর যখন শুনলেন যে, আমি জেল-খাটা স্বদেশীওয়ালা, এবং এক সময় কিছুদিনের জন্য ঘবেও পুলিসের নজরের উপর নজরবন্দী ছিলাম, তখন তাঁর মুখ গম্ভীর হল—অপ্রসন্নতাই বলব তাকে। বললেন, এ পথে চলতে হলে ও-সংস্রব চলবে না। ধর্ম নইলে মানুষ বাঁচে না, প্রতিটি মানুষেরই একটা না একটা ধর্ম আছে, কিন্তু যারা ধর্মপ্রচারক হয় তারা নিজেরাই হয় ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট; ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়,—নিজের অন্তরে দাও। অন্যের অন্তরে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা যখনই করবে তখনই হবে অধর্ম! তা ছাড়া, রাজনীতি হল সাময়িক—কালে কালে পালটায়; কিন্তু সাহিত্যধর্ম শাশ্বত।—দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঢাকা গিয়ে নিজেই পত্র লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—আপনার উপর প্রত্যাশা রাখি, তাই চিন্তাও হয়। এবং যে সর্বনাশা ছোঁয়াচ একবার আপনার লাগিয়াছিল তাহা সহজে মানুষকে রেহাই দেয় না। বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি সেই কারণে।

এর পর দীর্ঘকাল পত্রালাপ চলেছিল আমার সঙ্গে। সে পত্রের প্রত্যেকটিই এক-একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

একবার প্রশ্ন করলেন, কারণ করেছেন কখনও? শুধু তান্ত্রিকবংশের সন্তান হলে প্রশ্নই করতাম না। কিন্তু আপনি আবার কংগ্রেসী যে!

সত্য কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, তন্ত্রমতে কারণ করার অধিকারও হয় নি, করিও নি। এবং তিরিশ সাল পর্যন্ত অন্য ভাবেও না। তার পর বার দুয়েক কি তিনেক চেখে দেখেছি। বেশি খেতে ভরসা হয় নি। পাটনাতে প্রভাতী-সংঘের নিমন্ত্রণে গিয়ে এক বিখ্যাত বৃদ্ধ উকিল সম্বর্ধনা করেছিলেন এক পেগ হুইস্কি দিয়ে। সঙ্গে আরও সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। বৃদ্ধ উকিল খাঁটি মধ্যযুগের অভিজাত। সেই প্রথম। তার পরে এই রকমই বার দুয়েক।

উঁহু, তান্ত্রিক-চক্রের কথা জানতে চাচ্ছি। ও তো মদ খাওয়া। আমি কারণ করার কথা বলছি।

না। সে করি নি। আমাদের কুলগুরু আমার মানসিক গতি দেখে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, সে মন তোমার নয়। মনের গতির পরিবর্তন না হলে এ পথে পা দিয়ো না। তবে চক্রের পাশে বসে চক্রের উপকরণ যুগিয়েছি। চক্র দেখেছি।

বলুন। ব্যাপারটা শুনি।

বলেছিলাম—সেই সব গল্প। বিশেষ করে বামা ক্ষ্যাপার তারাপীঠে সাধকদের চক্রের কথা শুনে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, অদ্ভুত ব্যাপার!

তার পর বলেছিলেন, আপনার উপর প্রত্যাশা আমার দৃঢ় হল। আপনি মনের দিক দিয়ে ও-পথের পথিক না হলেও ও-পথের উপর শ্রদ্ধা হারান নি।

প্রতি পত্রে লিখতেন—হবে, আপনার হবে। নিজেকে দৃঢ় রাখুন।

'রসকলি' গল্প-সংগ্রহ বের হল, বইখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলাম। কবিকে বই পাঠালাম, মোহিতলালকেও পাঠালাম। কবির কথা পরে বলব। কারণ এর কিছুদিন আগে 'জলসাঘর' গল্প-সংগ্রহ সম্পর্কে কবির কথা বলবার আছে। মোহিতলাল বই পেয়েও কিছু লিখলেন না। আমি আবার লিখলাম—আপনি 'রসকলি' সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। আবার লিখলাম। লিখলেন—সম্পর্কে আমার মতামত আমি ঘোষণা করিয়া বলিব স্থির করিয়াছি। তাহার সময়

আসিয়াছে। কাগজে লিখিব। তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন। এবং গল্পগুলি সম্পর্কে মতামত তো প্রতিটি গল্প-প্রকাশের সময়ই জানাইয়াছি। সুতরাং এত ব্যগ্রতা কেন ?

'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ সালের প্রথম দিকে। গোটা পঁয়তাল্লিশ সাল চলে গেল, কোথাও কোনও সমালোচনা (মোহিতলালের) প্রকাশিত হল না।

১৩৪৬ সালের ১লা বৈশাখ। সে দিন বেলা আড়াইটার সময় এক আকস্মিক আঘাতে নিষ্ঠুর বেদনায় ও ক্ষোভে ব্যথাতুর ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ঠিক এই ধরনের আঘাত এক ভিক্ষুক ছাড়া কেউ কখনও পায় না। ওই রাজনৈতিক ব্যাপারেই পেয়েছিলাম আঘাত। বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ইলেক্‌শনে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। লাভপুরে কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমাদের গ্রামের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। প্রার্থীরা দুজনেই আত্মীয়। এ ছাড়াও এই সর্বপ্রধানের ছেলে নেমেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে। সেবার সেই প্রধান ব্যক্তিটি ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান হবেনই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোরালো এবং জোরালো। লাভপুরে কালীকিঙ্করবাবুর নির্বাচনের ভার প্রায় পুরোপুরি আমার মাথায়। হঠাৎ একদিন কালীকিঙ্করবাবু ডেকে খবর দিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মীয় প্রধানজনের মিটমাট হয়ে গেল। তিনি স্নেহাস্পদ কালীকিঙ্কর-বাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না, নাম প্রত্যাহার করবেন—আসবেন সরকার মনোনীত সভ্য হিসাবে। নাম প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট দিন ঠিক পরের দিন, ১লা বৈশাখ ১৩৪৬।

বৈশাখ মাসে মফস্বলে মর্নিং কোর্ট। ভোরবেলা আত্মীয় প্রধানের মনোনয়ন প্রত্যাহারপত্র নিয়ে কালীকিঙ্করবাবু আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন সিউড়ি। কোর্টের বটতলায় কাজ শেষ হতে বারোটা বেজে গেল। এর পর কালীকিঙ্কর-বাবু নিয়ে গেলেন ওই প্রধান ব্যক্তিটির সিউড়ির বাড়িতে। সেখানে তখন ওই প্রধানের ছেলে রয়েছেন। ওখানেই তাঁর প্রধান আড্ডা। ওখান থেকেই তিনি নির্বাচনের কাজ চালাচ্ছেন। নির্বাচনের কাজ তাঁর জেলাব্যাপী। কারণ এই

প্রধানজন সেবার ভাবী চেয়ারম্যান হিসাবে কংগ্রেসদলের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা। সেখানে দৈনিক একটা করে যজ্ঞের আয়োজন। পঞ্চাশ থেকে একশো জনের আহার বিশ্রাম চলছে। মিটমাট হয়ে গেছে। কালীকিঙ্করবাবুকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ওঁরাই নিয়ে গেছেন। আমিও গিয়েছি। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক বিরোধ নয়, তা ছাড়া আমার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ওঁদের। তবুও সত্য বলতে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। এই ধরনের দ্বিধাবোধকে আমি দুর্বলতা বলে মনে করি, একে প্রশ্রয় দিই না কোন কালেই। একে জয় করবার জন্যই গেলাম। ভাবলাম, একে আজ প্রশ্রয় দিলে বিরোধ ব্যক্তিগত হয়ে পড়বে; ওখানে গিয়ে হাস্যপরিহাসের মধ্যে অনেকটা সহজও হয়ে এলাম। এমন সময় ডাক এল, পাতা দেওয়া হয়েছে।

আমার মনটা খুঁতখুঁত করে উঠল। ঘড়ি দেখলাম, দেখলাম বেলা একটা। কালীকিঙ্করবাবু আমার হাত ধরলেন। আমার ঘড়ি-দেখা দেখেছিলেন তিনি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি মনের ভাবও বুঝেছিলেন। বললেন, এস এস। বাড়ি গিয়ে খেতে অনেক বেলা হবে। এরাও কিছু ভাববে। শেষটা একটু আস্তেই বললেন। যে কারণে দ্বিধা সত্ত্বেও গিয়েছিলাম, সেই কারণেই এতেও 'না' বললাম না। বসলাম কুশাসনের ওপর। পাতায় ভাত তরকারি দিয়ে গেছে। গ্লাসের জল হাতে ঢেলে হাত ধুয়ে ভাতে হাত দিয়ে গ্রাস তুলেছি। সামনে, ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে প্রধান ব্যক্তিটির পুত্র মাথায় জবাকুসুম তেল ঘষছেন এবং মৃদু মৃদু হাসছেন। আমাদের খাওয়াও দেখছেন। গ্রাসটা আমার মুখের কাছে পৌঁছেছে, এমন সময় তিনি হেসে বলে উঠলেন—ঠিক কথাগুলি মনে নেই, তবে তার অর্থ হল, আমাদের বিরোধিতা করে আমাদের বাড়িতেই খেতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ না? অবশ্য আর-একজনের নাম যোগ করে সুকৌশলে নিজে বলার দায়িত্ব লাঘব করবার চেষ্টা করেই। বললেন, জান, অমুক কি বলছিল? বলছিল, তোমাদের সঙ্গে ইলেকশনে বিরোধিতা করে তোমাদের বাড়িতেই খেতে এল? লজ্জা হল না? এবং ব্যাপারটাকে পরিহাসের সামিল করবার সঙ্গে সঙ্গেই হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমার মনে হল, আমাকে যেন ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলে কেউ। করলে মাথার উপর। ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে

মনে হল। তবুও প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে ধীরভাবেই হাতের গ্রাসটা মুখের কোল থেকে পাতার ওপর নামিয়ে দিলাম। খাবার জন্য পাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছিলাম, সোজা হয়ে বসলাম। দেখলাম, প্রতিটি মানুষই হাতে গ্রাস নিয়ে মাটির পুতুলের মতো অসাড় হয়ে গেছে যেন। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার নিজের মনের ত্রুটি নয়, কথাটা সকলের মনেই প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমি ভাতের গ্রাসটি নামিয়ে হেসে তাঁকে বললাম, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লজ্জাহীনতার যে কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তা থেকে তুমি আমাকে নিবৃত্ত করেছ। আমাকে তুমি রক্ষা করেছ। যথাসময়ে কথাটা উচ্চারণ করেছ। এখনও অন্নের গ্রাস মুখে তুলি নি, উদরস্থ হওয়া দূরের কথা। এক মিনিট পরে হলে এর আর প্রতিকার ছিল না। বলেই আমি উঠে পড়লাম। উচ্ছিষ্ট হাত ধুয়ে দাঁড়ালাম। অবশ্য এর পর ওই প্রধান ব্যক্তির ছেলেটি যথেষ্ট অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। খেতেও অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অন্ন আমি আর গ্রহণ করি নি। ভদ্রতা রাখতে জল খেয়েছিলাম।

সেই ক্ষুব্ধ ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ১লা বৈশাখের বেলা দেড়টা। কালীকিঙ্করবাবুর মোটরে ফিরছি, বায়ুস্তরে বহ্ন্যুত্তাপ হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল, আমার অন্তর্দাহের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। আমার বুকের ভিতর এমনি জ্বালা, এমনি উত্তাপ। তবুও আমি পৃথিবীর মতো শান্ত। ভাগ্যিস আমি অন্নগ্রাসটা মুখে তুলি নি। আমার ভগবানকে আমি প্রণাম জানালাম বার বার। রক্ষা করেছ তুমি আমাকে, রক্ষা করেছ চরম বহ্নিদাহের জ্বালা থেকে। ওই অন্ন গ্রহণ করলে আমার অন্তর্দাহের আর সীমা থাকত না। হয়ত বা আজীবন দগ্ধ হতাম। পরলোক থাকলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হতেন হয়তো। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। নতুন বৎসরের প্রথম দিনে ভাগ্যে যা জুটল, ভগবান, তাই যদি এ বৎসর ধরে আমার দৈনিক প্রাপ্য হয়, তবে তুমি যেন এই ভাবে অন্তরে জাগ্রত থেকে আমাকে রক্ষা করো। বাড়ি এসে পৌছুলাম, বেলা তখন

বাড়ির সকলেই ঘুমুচ্ছেন। স্তব্ধ। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। মনে আছে একটা

কাক এই সময় দ্বিপ্রহর-অবসান ঘোষণা করে বারান্দার রেলিঙের উপর বসে কা-কা শব্দে ডেকে উঠল।

আমি দেখলাম, বারান্দায় পড়ে রয়েছে—১৩৪৬ সাল বৈশাখের 'প্রবাসী'। সেই দিনই এসেছে। উলটে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল 'রসকলি'র সমালোচনা। নীচে সমালোচকের নাম মোহিতলাল মজুমদার। রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে গেলাম—

"শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প বাংলার পাঠকসমাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা স্বীকার করিতেছেন।...বর্তমানে কাব্যের ক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্য-সম্রাটের পদ কোন কবির প্রাপ্য হয় নাই। গল্পলেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি।..."

এক মুহূর্তে আমার অবস্থা সে যে কি হয়ে গিয়েছিল, সে আজ বর্ণনা করতে পারব না। দীর্ঘদিন পরে সে বর্ণনা করা যায় না। তবে মনে আছে, এতক্ষণ ধরে যে মর্মান্তিক বেদনাকে সহ্য করে দৃষ্টিকে শুষ্ক রেখেছিলাম, সে আর শুষ্ক থাকে নি। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল। বৈশাখের উত্তপ্ত বারান্দায় বুকে টপটপ করে চোখের জল ঝরে অভিষিক্ত করে দিয়েছিল খানিকটা স্থান।

দীর্ঘ সমালোচনা। প্রতি ছত্রেই এই অকুণ্ঠিত প্রশংসার ঘোষণা। কোন রকমে পড়ে গেলাম—তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবি-মানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থির রস-কল্পনার অধীন করিতে পারে; পশু ও মানুষ, বন্য ও সভ্য, সুরূপ ও কুরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং রুক্ষ ও কোমল, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত সুনীতি এই সকলের মধ্যেই তিনি জীবনের সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন।...তাঁহার কবিশক্তির

আর-একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, জীবনের যে রঙ্গভূমিতে এই সকল নটনটী অভিনয় করিতেছে তাহার দৃশ্যপটও কোথাও অবান্তর নহে—বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই সুরে বাঁধা। ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরে মানবজীবনকাব্যের এমন রসঘন চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে পারেন ('রসকলি'র প্রথম ও শেষ গল্পটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি) তাঁহার প্রতিভার নিকট বাংলা-সাহিত্য আজিকার এই দুর্দিনে অনেক কিছু আশা করিয়া থাকিবে।

আমি সেদিন ওই বারান্দায় শুয়ে ওই কাগজখানির উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর। গাঢ় সে ঘুম। এমন ভাবে একটি মর্মান্তিক বেদনা ও ক্ষোভ কয়েক মিনিটের মধ্যে মুছে যেতে পারে—এ জানতাম না সে দিনের আগে।

তাই বলছিলাম, অভয়দাতার প্রয়োজন হয়।

ওই ক্ষোভে এর পর আমার ওই নির্বাচনে উল্কার মতো সারা জেলাটা ঘুরে বেড়াবার কথা। কাগজ-কলম কুলুঙ্গিতে তোলা থাকবারই কথা। কিন্তু মোহিতলালের এই প্রেরণা ক্ষোভ ভুলিয়ে দিয়ে যেন বলে দিয়েছিল, কিসের ক্ষোভ! কিসের বেদনা! অমৃতের সাধনা কর তুমি।

মোহিতলালকে পত্র লিখেছিলাম। প্রশংসা সম্পর্কে সঙ্কুচিত হয়েই কিছু লিখেছিলাম। তার নকল আমার কাছে নেই। এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সমস্ত ঘটনা লিখে লিখেছিলাম, এমন ভাবে নিষ্ঠুর আঘাতে আহতকে সঞ্জীবিত যিনি করতে পারেন, তিনিই গুরু। আপনি আমার শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করুন।

পত্রোত্তর পেলাম—আমার সমালোচনার মধ্যে আপনার যে প্রশংসা আমি করিয়াছি তাহাতে আপনি বেশ সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন। আমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। সত্যকে আমি চিরদিনই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছি। না বলিলেই অন্যায় করিতাম। ইহাতে আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, আবার ইহাতে স্ফীত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেও মহাভ্রম করিবেন। সাধনা করিয়া চলুন।...

পরিশেষে ওই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন—আঘাত পাইয়াছেন, ভালোই

হইয়াছে। ইহাতে আপনার সৃষ্টিশক্তি জাগ্রত হইবার কথা। নিষ্ঠার সহিত এই সময় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সৃষ্টির কাজে লাগিয়া যান দেখি! আমার সৃষ্টির কাজ তখন আরম্ভ হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'তে "ধাত্রী দেবতা" শেষ হয়ে আসছে এবং 'প্রবাসী'তে এই বৈশাখ সংখ্যাতেই আরম্ভ হয়েছে "কালিন্দী"।

মোহিতলালের কথা অনেক। তিনি আমার গুরুদের অন্যতম। আমার জীবন-সাধনায় তাঁর কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি।

মোহিতলাল আমার জীবনে একদা সত্য সত্যই আচার্যের কাজ করেছেন। জীবনের বিচলিত মুহূর্তে তাঁর অভয় এবং উৎসাহ পেয়েছি তপস্যাসিদ্ধ উত্তর-সাধকের অভয়ের মতো। তাঁর চরিত্র, তাঁর সাধনার নিষ্ঠা, জীবন ও জগৎ-রহস্য উদ্ঘাটন করে তার লীলা প্রত্যক্ষ করার বিচিত্র দৃষ্টি আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁকে একদা লিখেছিলাম—আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য গুরু অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি কি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?

এ একেবারে প্রথম দিকের কথা। অর্থাৎ 'প্রবাসী'তে 'রসকলি'র সমালোচনা প্রকাশের অনেক আগের কথা। যে সময় আমার কন্যাশোকের কথা পূর্বে লিখেছি সেই সময়ের কথা। 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হবার কিছুকাল, বোধ করি ছ-সাত মাস, পরের কথা। তখন আমাদের কুলগুরুর শেষপুরুষ দেহরক্ষা করেছেন। এরও বৎসর তিনেক পূর্বে, একসময় তাঁর তল্পীবহনের চেষ্টা করেছি, তখন কুলগুরু বলেছিলেন, এ পথে তো তোমার তৃপ্তি হবে না বাবা। তোমার মন ছুটেছে আলাদা সড়ক ধরে। তার দু ধারে বাড়ি, কাতারে কাতাকে লোক। এ পথ যে জনমানবহীন পথ। আর দশজন যেমন, তোমার ধাত তেমন হলে আমি 'না' করতাম না। দিতাম কানে তিন ফুঁ। ব্যবসা, তেজারতি, চাষ, মামলা—দেওয়ানী ফৌজদারী করে ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে আসনে বসে কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে বীজমন্ত্রটি স্মরণে এনে জপে বসে যেতে; কারণের বোতল পেলেই 'কালী কালী বল মন, জয় তারা' বলে অকারণে চক্রের নামে কুচক্রে বসে যেতে। বাবা, আমরা তান্ত্রিক বামুন পণ্ডিত লোক, ইংরিজী মত বুঝি না, মনে করি—ওতে ইহলোকের খুব ভালো মন্ত্র আছে। একশোটা ধনদা-কবচ ধারণ করলে যা না হবে, ওই মতে দীক্ষা নিলে তাই হবে। তবে ও মন্ত্রে

তারপর এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। যারা চেষ্টা করে, তারা প্রায় দেখি নাস্তিক হয়ে যায়। তুমি বাবা সেই পথ ধরেছ। খানিকটা না এগুলে তোমার যে কি মতি হবে, তা তো বুঝতে পারছি না। যারা এক পা এপথে, এক পা ওপথে ফেলে চলে, ইহকালের জন্যে ইংরিজী মত আর পরকালের জন্য দেশী মত ধরে, তাদের ধরনের মানুষ তুমি নও। কাজেই মন্ত্রদীক্ষা এখন তোমার নেওয়াও উচিত নয়; আমার দেওয়াও উচিত নয়। আগে তোমার মন স্থির হোক।

এ কথা আমার কন্যা-বিয়োগেরও পূর্বের কথা। ১৯৩০ সালের আন্দোলনেরও দু-এক বৎসর আগের কথা। কথাটি তখন আমার মনে রেখাপাত করেছিল। এবং আন্দোলন জেল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ও জেলের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লব-বাদের ইতিহাস ও দর্শন কিছু পড়াশুনা ও আলোচনার ফলে মনের গতি এমনই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ওই গুরুটিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এই উপদেশের জন্য। তিনি অবশ্য তখন দেহরক্ষা করেছেন; জীবিত থাকলে ধন্যবাদের উত্তরে কি বলতেন জানি না।

যাই হোক, ১৯৩২ সালে কন্যা-বিয়োগের ফলে যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম, তাতে মনের গতির কাঁটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাক খাচ্ছিল। এই সময় মনে দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিল পরলোকতত্ত্ব জানবার। তখন লাভপুরে থাকলে নিত্যই গিয়ে শ্মশানে বসে থাকতাম। এ সেই সময়ের কথা। কিন্তু দীক্ষা নেব কার কাছে? কি মন্ত্রে দীক্ষা নেব?

মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অকস্মাৎ একদিন মনে হল, এঁর কাছে দীক্ষা নিলে হয় না?

এ কথায় অনেকের মনে সংশয় জাগতে পারে। সেই কারণে এখানে এই প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। নূতন কালের মানুষ যাঁরা, যাঁরা পুরাতন কালকে দেখেন নি, তাঁদের কাছে হয়তো দীক্ষার কথাটাই সমগ্রভাবে প্রকাণ্ড একটা ভ্রান্তি এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাস্যকরও। কিন্তু আমি যে হিসাবে দীক্ষার কথা বলছি, সেটা ঠিক হাসির কথা নয়। দীক্ষা তাঁদেরও একটা করে আছে। জীবনে বিশেষ একটি মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সেই মতবাদ-সম্মত একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা ও বুঝতে চেষ্টা করার কথাই

আমি বলছি ; মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটাই দীক্ষাগ্রহণ এবং সেই মতবাদ সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা, বুঝতে পারা এবং সেই মতবাদ অনুমোদিত পন্থায় নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হল সেই সাধনা।

যারা সেকাল দেখেছেন, তাঁদের মনে সংশয় জাগবে, আমি ব্রাহ্মণসন্তান হ বৈদ্যসন্তান মোহিতলালের কাছে দীক্ষা চাইলাম কি করে? আয়ুর্বেদও অব পঞ্চম বেদ বলে স্বীকৃত। তবুও প্রচলিত সমাজবিধানে চতুর্বেদ-অন্তর্গত ব্রাহ্ম ছাড়া এই গুরুর কাজে অধিকার অন্যের ছিল না। অন্তত গৃহীর ছিল না তবে সন্ন্যাসীর এ বাধা নেই কারণ সন্ন্যাসীর জাতি নেই, বর্ণ নেই, ইহলো পরলোক কিছুই নেই—আছে শুধু তপ এবং সাধনা। সেই তপ এবং সাধন তাঁর কাছে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, তিনিও বিতরণ করতে পারেন।

মোহিতলালকে আমার সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়েছিল সেদিন। এবং অ দিক দিয়ে বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করে যাওয়ার মতো সাহস ও প্রবৃ দুইই তখন আমি পেয়েছি। জ্ঞানযোগে তাঁর দৃষ্টির গভীরতা, ধ্যানযোগে মতো সাহিত্যতন্ময়তা, নিজের মতের দৃঢ়তা, জগত ও জীবন-ব্যাখ্যায় শুচিতা অশুচিতার উর্ধ্বস্তরের অনুভূতি অথচ তার প্রকাশে জ্যোতির্ময় পবিত্রতার ধারণ সাধনফল সম্পর্কে নির্লোভ অনাসক্তি দেখে আমি তাঁকে সন্ন্যাসী ভাবতে দ্বি করি নি। দু-একবার ঢাকা গিয়ে সংসারের মধ্যেও মোহিতলালের সন্ন্যাসে আসন আমি দেখে এসেছি। এই দেখেই আমি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁে লিখেছিলাম, আপনি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?

কি দীক্ষা নেব, সে সম্পর্কেও আমার ধারণা একটা ছিল।

আমাদের কুলগুরু আমাকে বলেছিলেন, শক্তিতন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা নি হলে 'তারা'-মন্ত্রে নিতে হবে। শক্তিতন্ত্রে তারাই হলেন সরস্বতী। তার অপর নামই হল—নীল সরস্বতী। কালী হলেন মহালক্ষ্মী।

কথাটা আমার মন মেনে নিয়েছিল। শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষাই যদি নিই, ত এই মন্ত্র ছাড়া আর কোন মন্ত্র আমি নিতে পারি?

মোহিতলালকে যখন পত্র লিখলাম, তখন শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষা আমি নি চাই নি। আমি চেয়েছিলাম সারস্বত-তন্ত্রমতে দীক্ষা। এমন কোন তন্ত্র ব

মানে আমাদের দেশে প্রচলিত নেই, কিন্তু অতীত কালে তো ছিল। ভারতবর্ষে মহাকবি বাল্মীকি এবং মহর্ষি বেদব্যাসের জীবন থেকে তো এর আভাস পাই। আদিকবি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলে স্বীকার করেও তাঁর মনুষ্যজীবন বর্ণনায় মহাকালের অমোঘ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেন নি। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিয়েছেন, যদুবংশকে কুরুক্ষেত্রের প্রতিফলে গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হতে দিয়েছেন। এই অনুভূতি এই দৃষ্টিলাভের জন্য অবশ্যই একটা সাধনা তাঁরা করেছিলেন। একটি ইষ্টকে তাঁরা ধ্যান করেছিলেন। এবং তাঁদের জীবনে যে পরিশুদ্ধতা, যে প্রসন্নতা, যে শান্ত কাঠিন্য আমরা দেখতে পাই, তাঁদের যে মহর্ষিত্ব স্বীকারে কোনো সংশয় জাগে না, তার একটি সাধনপন্থা নিশ্চয়ই আছে। সে পথ ও সে তন্ত্র পরবর্তী কালে যেন হারিয়ে গেছে। কালিদাস মহাকবি, কিন্তু মহর্ষি আখ্যা পান নি। অথচ নূতন কালে রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জন করলেন আমাদের চোখের সামনে।

মধ্যযুগে কবিরা ঋষিত্বের পরিবর্তে ভক্তত্ব অর্জন করেছেন। তাঁতে তারা জীবনে যাই পেয়ে থাকুন, ঋষিত্বের এবং ভক্তত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকুক বা না থাকুক, একটু হিসেব করে দেখলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি সারস্বত-সাধনা বা সরস্বতী-তন্ত্র-মতে সাধনা তাঁদের মূল সাধনা ছিল না। তাই ঋষিদৃষ্টি তাঁরা অর্জন করেন নি। কথাটা সম্পর্কে আমার বাল্যকালে আমি যে সেকালের ঘরোয়া আলোচনা শুনেছি, সেই কথা এখানে বললে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মধ্যযুগে চণ্ডীদাস থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত কবিরা সাধক! ও-দিকে কবীর তুলসীদাসও তাই, ভক্ত-সাধক। এঁদের কাব্য সার্থক কাব্য, তবুও একটি বিশেষ রসের অভিসিঞ্চনে এমন অভিষিক্ত যে বৈষ্ণব কাব্যের মাল্যখানি যদি বলি, অগুরু-চন্দনে এমনি চর্চিত যে মালতী-মল্লিকা-যূথী প্রভৃতি বিভিন্ন পুষ্পের বর্ণ এবং গন্ধ সেখানে ঢাকা পড়ে বা চন্দনগন্ধের সঙ্গে মিশে অন্য এক রূপ ও গন্ধ ধারণ করেছে, তবে অন্যায় বলা হবে না। শাক্ত কাব্যেও তাই, সে রক্তচন্দনের শোভাই বড়। সেকালে আমাদের শাক্ত কর্তারা বলতেন, মা সরস্বতী হলেন শক্তি এবং শিবের ঘরের গিন্নী কন্যা। মা-বাপের হাল-হদিস রুচি এমন কি তাঁদের আসল তত্ত্ব পর্যন্ত সব জানেন। তাই সাধকেরা শক্তি বা শিব যাকেই জানতে হোক, ধরে গিয়ে

দিদিঠাকরুনটিকে। বলে—ঠাকরুন, তুমি দয়া করলেই ঠিক সুনজরে পড়ব এ বেশি সুনজরে পড়ব। এখন বলে দাও দেখি, কি ভাবে কথা বললে, কি নামে ডাকলে ওঁরা খুশি হন, তোমার মা-বাপের আসল তত্ত্বটাও বলে দাও তো!

বৈষ্ণবেরা বলেন, ঠাকরুন, তোমার ঠাকুরটিকে তুমি যে ভালোবাসায় পেয়েছ, সেই ভালোবাসার তত্ত্বটা আমাদের বলে দাও দেখি। কিসে খুশি হন, কেমন করে ডাকলে খুশি হন বলে দাও তো!

অর্থাৎ সরস্বতী এ যুগে স্বাধীন সত্তা হারিয়েছেন। ঋষিদৃষ্টিতে কাব্যসাধনা বিলুপ্ত হয়েছে।

নূতন কালে, বাংলা দেশে নবজাগরণের সময় সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞানযোগ নূতন করে স্বাধীন আসন পেয়েছেন। সারস্বত-তন্ত্রের পুনরুত্থান হয়েছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অবশ্য সাধারণভাবে মা-সরস্বতীর দুঃখ আরও বেড়েছে। সেখানে বণিকের মানদণ্ডটি রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার বণিকের একমাত্র দেবতা, যিনি নাকি বাংলা দেশের মতে একাধারে সরস্বতীর সহোদরা এবং সপত্নী তিনি, অর্থাৎ মা-লক্ষ্মী ওই দাঁড়িপাল্লার দণ্ডটির তাড়নায় সরস্বতীকে করেছেন নিজের অধীন। একালে একেবারে হালে বি. কম. আই. কমের সংখ্যাবৃদ্ধি সে সত্যটিকে একেবারে প্রকট করে দিয়েছে। সে দিক দিয়ে সরস্বতী এখন লক্ষ্মীর রাজমহলে দাসদাসী সরবরাহের আড়কাটিতে পরিণত হয়েছেন! যাই হোক, স্বল্প কয়েকজন সাধকের জীবনে একালে সেই প্রাচীন সারস্বত-তন্ত্রের নবজাগরণে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, এই দীক্ষাই নেব। দীক্ষার উপর তখন আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল, সে আমি পূর্বেই বলেছি। আমি সাহিত্যসৃষ্টিই করতে চাই নি; আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে—বায়োলজি এবং মেডিকেল সায়েন্সের পরও যা আছে তাই, তাকে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। অন্তত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলাম। সংযম নয়, ভয় সংবরণ নয়, আনন্দ-অনুভব-শক্তি, যা আজ নেই। নূতন কালের ভাবের ভাবুক কারও নেই। তাকে অর্জন করা যায় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ দীক্ষা দিতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনে তাঁর সাকার না হলেও নিরাকার

একটি দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁকে ধ্যান করেছেন নিত্য নিয়মিত। রবীন্দ্র-কাব্যের সর্বত্র তাঁর আভাস ও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়ার আমার সাহস ছিল না, পূর্বেই বলেছি। তাই মোহিতলালকে লিখলাম।

—মোহিতলাল লিখলেন—দীক্ষা লইয়া কি করিবেন? দীক্ষায় আমার নিজের কোনও বিশ্বাস নাই। আমার দীক্ষা সাহিত্যের দীক্ষা, সে মন্ত্র আপনি স্ফুরিত হয়। অন্তরে বীজ থাকিলে সাধনার উত্তাপে নিষ্ঠার অভিসিঞ্চনে সে বীজ আপনি উপ্ত হইবে, মন্ত্র-চৈতন্য আপনি ঘটিবে।

আমি মনে মনে বিষণ্ণ হলাম। এবং এ কথা আর কখনোও তাঁর কাছে লিখি নি। উত্তরকালে শাক্ততন্ত্র নিয়ে অনেক কথাই তিনি আমাকে লিখেছেন। শাক্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর একটা বিপুল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে তাঁর যেন কোথাও বাধা ছিল। সম্ভবত নূতন কালের ইউরোপীয় সাহিত্যের মাধ্যমে নাস্তিক্য-মতবাদের প্রভাবই ছিল সেই বাধা।

বাংলা দেশের কয়েকজন কবি—যাঁরা মোহিতলালের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী—তাঁদের জীবন দেখে মনে হয় এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাসও বটে যে, মোহিত-লাল যদি জীবনে দীক্ষা নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক কোনো দেবতাকে অনুভব করতেন, নিত্য-নিয়মিত ধ্যান করতেন, তবে তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা প্রদীপ্ততর হয়ে উঠত। বর্তমানে বাংলা দেশের সর্বাগ্রজ কবি করুণানিধান, কবি কুমুদরঞ্জন, কবি কালিদাস রায়কে দেখেই এই কথা বলছি। কথা বললেই এঁদের প্রসাদতৃপ্ত অন্তরের পরিচয় মেলে। মাত্র জ্ঞানযোগে সিদ্ধি অত্যন্ত কঠিন। সেখানে মধ্যপথে শূন্যবাদের মত্ততায় আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। শূন্যবাদের মত্ততা মোহিতলালকে কোন দিন আচ্ছন্ন করে নি, তিনি জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেও একটি নীতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাকে তিনি জানতেন। মনে মনে মানতেনও। কিন্তু মনে মানা এক কথা এবং নিঃসংশয় বিশ্বাসে তার অনুশীলন আর-এক কথা। কবি কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —ইহার প্রধান লক্ষণ রূপপিপাসা। অর্থাৎ কবি কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিও সৃষ্টির ধারার লক্ষণ। ইহার ভগবান যিনি তিনি আর কিছুই নন, তিনি পরম সুন্দর; বিশ্বের বিরাট দেউলে সেই পরম সুন্দরই তৃণ হইতে তারকা পর্যন্ত সর্বত্র

বিরাজ করিতেছেন। বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম নাম দিয়াছে, যাহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বময় বলিয়াছে।...এ সম্পর্কে আলোচনা করে শেষে তিনি নিজেই লিখেছেন—ওই দেউল, ওই বিগ্রহ, ওই আরতির আনুষ্ঠানিক যাহা-কিছু সকলই সেই রূপ-পিপাসার শুধুই প্রতীক নয়, শুধুই রূপক নয়, কোন্ অর্থে (অর্থাৎ কোন্ দিক দিয়া) একেবারে একটা সাক্ষাৎ রূপ হইয়া উঠিয়াছে।

মোহিতলাল শূন্যবাদী হলে কাব্যরসটুকু স্বীকার করেও বক্রহাস্য হাসতেন। তা তিনি হাসেন নি। তিনি জ্ঞানবাদী হতে চেয়েছিলেন এবং কঠোর সাধনায় জ্ঞানযোগের শূন্যবাদের ধাপ অতিক্রমও করেছেন। কিন্তু বিশেষ ইষ্ট এবং সেই ইষ্টের সপ্রেম ধ্যান করেন নি। সেই কারণেই তাঁর জীবনের কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ধারায় যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। তাঁদের প্রকৃতির ধাতু আলাদা। তাঁদের একটি বড় দল এবং স্বতন্ত্র ধারা এদেশে একালে সৃষ্টি হয়েছে। যদি বলি এঁদের দলে এবং ধারায় ভারতীয় ধারার বৈদিক ও তান্ত্রিক বা যে কোন মতের কোন মন্ত্র-দীক্ষাকে এঁরা স্বীকার করেন নি তবে অন্যায় বলা হবে না।

আরও একটু স্পষ্ট করে বললে এই দাঁড়ায় যে জগৎ ও জীবনকে দেখার ভঙ্গিতে এঁরা বস্তুপুঞ্জ ও জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই সমস্ত কিছুকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে জৈব কোষের ক্ষয়শীলতার মধ্যেই এঁদের জীবনের স্ফুরণ এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যেই জীবনের শেষ এঁদের। জৈবকোষের চরম ক্ষয়ের পরও অনন্তকাল প্রবহমান বিশ্বশক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব এঁরা করতে চান না। যেটা স্ফুরিত হল সেটার অস্তিত্বই ওই শক্তির মধ্যে ছিল—ততদূরও যেতে যান না। তাই দীক্ষা তাঁদের অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এঁদের কাছে স্বীকৃতি পান না।

এঁদের কথা যাক। মোহিতলালের কথা এবং নিজের কথা বলি।

প্রথমে দীক্ষার কথাই বলি।

মোহিতলালের সঙ্গে এই পত্রালাপের পরও আমার গুরুসন্ধানে আমি ক্ষান্ত হই নি। অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি তান্ত্রিক নন, বৈষ্ণব

নন, খাঁটি যোগী—এবং সাগ্নিক তপস্বী। সন্ন্যাস গ্রহণের দিনে যে হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই অগ্নিকে তিনি একমাত্র স্নান, আহার ইত্যাদি জৈব-কৃত্যের সময় ছাড়া, অহরহই স্পর্শ করে থাকেন। এই লোকটিকে দেখে আমার দীক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আবার প্রবল হয়ে উঠল। আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। প্রথমদিন প্রথম দর্শনেই তাঁকে প্রার্থনা জানালাম, বাবা আমার চিত্ত বড় অশান্ত, দীক্ষার জন্য আমি ব্যাকুলতা অনুভব করি। আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন ?

সন্ন্যাসী তখন দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত, সদ্য আসন গ্রহণ করে তাঁর বহনকরা অগ্নি দিয়ে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করছেন। তিনি উত্তর দিলেন. বাবা, সুধা রাখতে গেলে হিরণ্ময় পাত্র অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না।

মনে কঠিন আঘাত পেলাম। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে 'নমো নারায়ণায়' বলে প্রণাম জানিয়ে চলে এলাম। এই প্রণাম-পদ্ধতির তুল্য অপরূপ প্রণাম-পদ্ধতি আর নেই। মানুষকে প্রণাম কেউ করে না। মানুষের অন্তরস্থ নারায়ণ অর্থাৎ দেবত্ব বা মহত্ত্বকে প্রণাম জানায়।

এর পর এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার এক অদৃশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হল। বিচিত্র সে দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের শেষে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী নিজে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বিচিত্রভাবে আমাকে পরাজিত করলেন। সে পরাজয়ে যে আনন্দ, তার আস্বাদ আজও আমার অন্তরলোকে অমৃতের মতোই অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর প্রসঙ্গ আমার জীবনকে ধন্য করে দিয়েছে। সে অমৃতে সেদিন আমার সকল অশান্তির দাহ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

তিনি আমাকে দীক্ষার কথায় বলেছিলেন, দীক্ষার জন্য অধীর হয়ো না। জীবনে যা'র সাধনা থাকে, তার গুরু আপনি আসেন। তোমার গুরু আসবেন। তোমার সাধনা তুমি করে যাও। শুনেছি, তুমি জ্ঞানের সাধনা কর। তার সঙ্গে এই রকম কর্মের সাধনা কর। নইলে পূর্ণ হবে না সাধনা। আমি তখনকার মতো গুরুর সন্ধানে বিরত হলাম। রত হলাম সাহিত্য-সাধনায়।

বলতে বলতে খানিকটা সময়ের ফের ঘটে গেছে। অনেকটা পরের কথায় চলে এসেছি। ফিরে যেতে হবে পিছনে। 'বঙ্গশ্রী'র আমলে। তখন সবে চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'ছলনাময়ী' ও 'রাইকমল' বের হয়েছে। থাকি কালীঘাট-বালিগঞ্জের ঠিক মাঝখানটিতে একটি বস্তির ধারাধারি, ঘরখানি টিনে ছাওয়া, পাকা মেঝে, পাকা দেওয়াল। আমাদের দেশের ষষ্ঠীচরণ দাস বালিগঞ্জে আমারই গ্রামবাসী বন্ধু কালীকিঙ্করদাদার বাড়ি খানসামার কাজ করে, সে এসে দিনান্তে একবার পথের কল থেকে জল তুলে দেয়, ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়, বসে ঘুমোয়, মধ্যে মধ্যে বলে—কি লেখেন বাবু, পড়ুন শুনি! সে বুঝতে পারে দেখে উৎসাহিত হই। খাই পাইস হোটেলে—তাও একটা নির্দিষ্ট হোটেলে নয়, কালীঘাট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পথের মধ্যে যেটা যেদিন ক্ষুধার সময় চোখে পড়ে সেটাতেই। খরচ, মাসে পঁচিশ-তিরিশ টাকার বেশি নয়। তাও সব মাসে কুলোয় না। যে মাসে টাকা ফুরোয়, সে মাসে তিনটে টাকা থাকতেই লাভপুরে রওনা হই। আবার কিছু লিখে, কোনক্রমে দশটা টাকা যোগাড় করে কলকাতা রওনা হই এবং কাগজের আপিসে আপিসে ঘুরে সেগুলি দাখিল করে আসি আর অনুরোধ জানাই যাতে সেই মাসেই প্রকাশিত হয়। তা হলেই টাকাটা পাব। লেখা বের না হলে তো টাকা পাওয়া যাবে না! পাওয়ার মতো প্রতিষ্ঠাও হয় নি, আর আমি চাইতেও পারতাম না, মুখে বাধত। দুটো জায়গা ছিল যেখানে গল্প দাখিল করেই টাকাটা চাইলেই পাওয়া যেত। 'বঙ্গশ্রী'তে সজনীকান্তের কাছে আর 'দেশ' পত্রিকার আপিসে, পবিত্র গাঙ্গুলীর তদ্বিরে এবং সুপারিশে। পবিত্র তখন 'দেশ' পত্রিকার সহকারীর কাজ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিম সেন মশায় তখন বোধ হয় দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, আসতেন না। সব কাজের কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত মাখন সেন মশায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ এক ব্যক্তি। সমগ্র 'আনন্দ-বাজারে'ই তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপ। তিনি কর্মী মানুষ, গুণীও বটেন। কিন্তু এসব স্বীকার করেও এইটুকু নালিশ করব, তিনি মেজাজী ও রূঢ় মানুষ, এবং সে

রূঢ়তা সেকালে 'আনন্দবাজারে'র আপিসে আধিপত্যের উত্তাপে অসহনীয় ও অশোভন হয়ে উঠত। এঁর সাহিত্য-বিচার নির্ভর করত মেজাজের উপর। 'দেশ' পত্রিকায় আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল একটি পূজা-সংখ্যায়, গল্পটির নাম —"নারী ও নাগিনী"। এই গল্পটি সম্পর্কে তিনি নাকি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছিলেন, ফরাসী গল্পের সমকক্ষ; এবং দক্ষিণা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন দশ টাকা। দশ টাকা সেকালে আমার পক্ষে অনেক। এর পর থেকে সাধারণ সংখ্যা 'দেশে' আমার অনেক গল্প বেরিয়েছে। সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের দক্ষিণা ছিল—পাঁচ টাকা। সজনীকান্তের কাগজ মাসিক-কাগজ। মাসে একবারের বেশি সেখানে যাওয়া যায় না এবং প্রতিমাসেও যাওয়া যায় না। সে যাওয়ার উপায় থাকলে মাসের অর্ধেক সমস্যা মেটে—পনের টাকা পাওয়া যায়। 'দেশ' মাসে চারখানা বের হয়। সেখানে বার-দুই যাওয়া যায় এবং দশটা টাকা মেলে। এই যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতায় এই ভদ্রলোকের বিচিত্র বিচারপদ্ধতি আমার পক্ষে তিক্ততার কারণ হয়ে আছে। মেজাজ ভালো থাকলে লেখার প্রশংসা করে নিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাউচার সই করে দিয়েছেন। আবার মেজাজ খারাপ থাকলে সোরগোল তুলেই এমন ভাবে 'না' বলেছেন যে লজ্জায় মরে গিয়েছি ভিক্ষুকের মতো। "মুসাফেরখানা" গল্পটি ভালো গল্প, সে গল্পও খারাপ মেজাজে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এটা একটা ডাস্টবিন নয়। "মহামারী" বলে একটি গল্পের কথাও মনে পড়ছে। শীতের সময়, বোধ হয় মাঘ মাস, বাদলা নেমেছে, সে দিন আমার হাত রিক্ত হয়ে পড়েছে প্রায়; তিন টাকাও অবশিষ্ট নেই; লাভপুর পালাতে হলে বিনা টিকিটে যেতে হবে—এমনই অবস্থা! একটি লেখা—ওই "মুসাফেরখানা" ('রসকলি' নামক গল্প-সংগ্রহে প্রকাশিত) নিয়ে 'দেশ' আপিসে গেলাম একটা-দেড়টার সময়। সেদিন কিছু একটা হয়েছিল আপিসে। নিচের তলায় শ্রীযুক্ত মাখন সেন মশায়ের ঘরে কর্তাব্যক্তিরা ছুটোছুটি করছেন। পবিত্র বললেন, বসুন ভাই, আজ একটু অপেক্ষা করতে হবে। বসলাম, বিড়ি টানতে লাগলাম একটার পর একটা। মধ্যে মধ্যে চা। ওটা সেকাল থেকেই 'আনন্দবাজারে' মহোৎসবের মতো অঢেল। চাইলে তো মেলেই, না চাইলেও মেলে; নূতন আগন্তুক এলেই তাঁকে সম্বর্ধনার সময় উপস্থিত সকলকেও পরিবেশন

করে যায় বেয়ারা। আপিসের কর্তার স্লিপ সই করিয়ে নিয়ে যায়। বেলা চারটে নাগাদ পবিত্র গল্পটা হাতে করে গেলেন কর্তাব্যক্তিটির কাছে। লেখাটা হাতেই ফিরে এসে বললেন, আজ নয়, কাল; কাল আসতে বললেন। আমি একটু সাহস করে একখানা স্লিপে লিখে দিলাম, আমার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। যদি অনুগ্রহ করে আজই দেখে ব্যবস্থা করেন তো অনুগৃহীত হই। পবিত্রকে বললাম, এটা নিয়ে আর-একবার যান ভাই; পবিত্র এবার লেখাটা তাঁর হাতে দিয়ে ফিরে এলেন, বললেন, বসুন। আধ ঘণ্টা পর তিনি চটির শব্দে ঘরখানিকে সচকিত করে তুলে এসে টেবিলের উপর লেখাটি ফেলে দিলেন এবং একটি 'নো' শব্দ উচ্চারণ করে দিয়েই চলে গেলেন। সে দিনে শীতের সন্ধ্যায় টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে বর্মণ স্ট্রীট থেকে মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। এর পর শ্রীযুক্ত মাখন সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে অনেকখানি এই উত্তাপ থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। 'আনন্দবাজারে' আমার "প্রতিমা" গল্প যেবার প্রকাশিত হয়, সেবার এই গল্পটিই 'আনন্দবাজারে' সেরা গল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল—সেই সূত্রেই আলাপ, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সজনীকান্ত, এবং সেই হিসেবে আমিই পেয়েছিলাম সর্বোচ্চ দক্ষিণা—পঁচিশ টাকা। সে অবশ্য পরের কথা।

কাগজের আপিসে এই অবস্থা হলেও তখন কিন্তু তরুণ মহলে খ্যাতি হয়েছে আমার। মধ্যে মধ্যে কলেজের ছেলেরা আসতেন। তিনটি ছেলে প্রায় নিয়মিতই আসতেন। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কবিযশঃপ্রার্থী। এঁদের একজন আজ নেই, অনেক কাল আগেই নিতান্ত তরুণ বয়সেই মৃত্যু তাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিয়েছে। তাঁর নাম ছিল ফাল্গুনী রায়, তাঁর মা দু-চারটি ভালো গল্প লিখেছিলেন। মায়ের প্রথম গল্প এবং আমার প্রথম গল্প 'কল্লোলে'র এক সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। নৃসিংহবালা দেবী তাঁর নাম। ফাল্গুনীরা আসত তিনজন—ফাল্গুনী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের সঙ্গে একালের নাম-করা লেখক সুশীল জানাও বোধ হয় মধ্যে মধ্যে আসতেন। সুধীরঞ্জন এবং বিশ্বনাথ—এঁরাও আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সুধীরঞ্জন সেকালে বড় মুখচোরা ছিলেন। এসে চুপ করে বসে থাকতেন।

গৌরবর্ণ, মিষ্ট চেহারার কিশোর। মধ্যে মধ্যে অনুরোধ করতেন, তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য। কাছেই তাঁদের বাড়ি ছিল। বলেছিলাম, যাব। কিন্তু পরিচয়ে একদিন জানলাম, সুধীর বাবা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। শুনেই মন আমার বেঁকে গেল। পুলিস সাহেব সামসুদ্দোহার কুটিল ধর্মাধর্মহীন ব্যবহারে তখন আমার মন ইংরেজের চেয়েও ইংরেজের কর্মচারীদের উপর বেশি বিরূপ। অবশ্য বীরভূমে সামসুদ্দোহার আমলেই ছিলেন শ্রী কে. কে. হাজরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর দৃঢ় ন্যায়পরায়ণতায়, ভদ্র ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীযুক্ত হাজরার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করবার মতো যোগ্যতাও ছিল না, কোনোদিন কোনো প্রয়োজনও হয় নি তাঁর কাছে যাবার। তবুও যা শুনেছিলাম, দূর থেকে অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় শুনেছিলাম, তাতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু শ্রী কে. কে. হাজরা একজন দুজন ছাড়া মেলে না। আজও না। সরকারী কর্মচারীদের কথার ঝাঁজ, চোখা বাঁকা ধারালো খোঁচা আজও অনুভব করি, সইতে হয়, এই তো সেদিন—। থাক, সে কথা যথাস্থানে লিখব।

সেবার পুজোর সময় যে কটি গল্প লিখেছিলাম, তার মধ্যে "রায়বাড়ি" গল্পটি অন্যতম। "রায়বাড়ি" গল্পটি আমার খুব প্রিয় গল্প। তার কারণ পরে বলব। গল্পটি লেখার একটি ছোট্ট ইতিহাস বলব। পুজোর আগে দেশে গিয়েছি, আমার বন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার এসে একখানা ছাপা কাগজ আমার হাতে দিলেন। বললেন, তাঁদের গ্রামের আমাদেরই বন্ধু শরৎচন্দ্র চন্দ মাস্টারের পুরনো ঘরের মেঝে বাঁধাবার জন্য জিনিসপত্র বের করা হয়েছে, তার মধ্যে এটা ছিল। দেখ, এটা কি বল দেখি! সত্যই কাগজখানা বিচিত্র! একটা ছাপানো জিনিসের ফর্দ। এবং সে ফর্দ দেখে একালে ইংরিজীজানা মহলের এক-আধজন বহুদর্শী ছাড়া বলতে পারবেন না, সেটা কিসের ফর্দ। একটা মস্ত বড়—অন্তত সাত-আট পৃষ্ঠা ফর্দের এক পৃষ্ঠার আধখানা। আজও যত দূর মনে পড়ছে, তাতে তিল কুশ থেকে আরম্ভ করে কোশাকুশি, পুষ্পপাত্র, কুশাসন, কম্বলের আসন, হাঁড়ি, মালসা, পিতলের গ্লাস, আতপচাল, ঘি, আলু, কচু, লবণ, হলুদ, হরতকী, মিষ্টান্ন, একমন কাষ্ঠ, মায় খড়কে কাঠি পর্যন্ত রয়েছে। ফুল-বিল্বপত্র বাদ পড়ে নি। আরও

আছে, জলের জন্য জালা, ঘটি, হস্তপ্রক্ষালনের জন্য মৃত্তিকা, দাঁতন কাঠি, এবং চাকর একজন—এও তার অন্তর্ভুক্ত।

দেখে আমি বললাম, এ কোন বিরাট ক্রিয়ার ফর্দ। এটুকুতে যা আছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, সে ক্রিয়া অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ নয়; হয় শ্রাদ্ধ, নয় দেবপ্রতিষ্ঠা, যাতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এটুকুতে পণ্ডিতদের সম্বর্ধনা এবং পরিচর্যার ব্যবস্থার ফর্দ রয়েছে। কিন্তু এত বড় শ্রাদ্ধ বা ক্রিয়া কোথায় হয়েছে এখানে? বড় বড় রাজা মহারাজা ছাড়া কোথায় হবে এখানে? বড় জমিদার বলতে বরেন্দ্রভূমে। রাঢ়দেশে কজন রাজা আছেন—বর্ধমান, কাশিম-বাজার, কাঁদী। আর দু-চার জন রাজা আমাদের অঞ্চলে আছেন, কিন্তু তাঁরা কীর্তির জন্য খ্যাত নন। সম্ভবত এঁদের বাড়িরই কোন ক্রিয়ার ফর্দ, শরৎ চন্দ্রদের বাড়িতে এসেছে বিচিত্রভাবে। ওদের এককালে ছিল মসলাপাতির দোকান, কোন জিনিসের মোড়ক হয়ে চলে এসে থাকবে।

ফর্দটি আমি রেখে দিলাম। মনের মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠার কথাটা বড় হয়ে উঠল না, শ্রাদ্ধের কথাই ঘুরতে লাগল। মহা-সমারোহের কোন শ্রাদ্ধ। দশ দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধ, নকল করে চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা ফর্দ তৈরিতে সময় লাগবে, তাই হয়তো ছাপানো হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ দিল 'জলসাঘরে'র সুর। সেই বছরেই গত বৈশাখে 'জলসাঘর' বের হয়েছিল এবং 'জলসাঘর'ই আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিল পাঠকসমাজের মধ্যে। বহুজনের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। কে বলেছিলেন মনে নেই, বলেছিলেন—'জলসাঘরে'র ভাঙনের কথা লিখলেন; গড়নের কথা লিখুন। তখন থেকেই কল্পনা ছিল—আরও দুটি গল্প লিখে 'জলসাঘর' নাম দিয়েই একটি বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুস, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে। সেই কল্পনা নিয়েই এই ফর্দটিকে উপলক্ষ্য করে "রায়বাড়ি" লিখলাম—জলসাঘর গড়ে ওঠার গল্প। জলসাঘরের ভাঙনের কথা মনে রেখে তার বাতিদানের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার কথা মনে রেখেই লিখলাম "রায়বাড়ি"। প্রজাদের অভিসম্পাত থাকল। "রায়বাড়ি"র বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র চোখে দেখি নি, কিন্তু এমন চরিত্রের কথা গল্পে আমি শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি এবং এখনি

কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে, পিতৃপুরুষদের সমসাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এ চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে। ১০৯২নং লাটটি আমাদেরই ছিল। ওই লাট শাসন করতে না পেরে আমারই পূর্বপুরুষ সেকালের নামকরা এক দুর্ধর্ষ জমিদারকে পত্তনি দিয়েছিলেন। সে জমিদারটির নাম আমাদের ও-অঞ্চলে আজও লোকের কাছে গল্পের কথা হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মুরশিদাবাদের নিমতিতার জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। এবং ১০৯২ নং লাটের প্রজাদের নিমতিতায় গৌরসুন্দরের সঙ্গে মিটমাট করতে যাওয়ার ছবিটুকু একেবারে বাস্তব সত্য। গল্পের শেষে আছে, দুকুলপ্লাবী গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসিয়ে বিশ্বম্ভর নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলে যাবেন। জলসাঘরের বাতি আধখানা জ্বলে সেদিন নিবে গিয়েছে। রায়বাড়ি অন্ধকার। সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরিধান করে রায় একখানি দণ্ড হাতে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গার ঘাটে। চলে যাবেন। একবার ফিরে তাকালেন বহু মমতায় রায়বাড়ির দিকে। দেখলেন, এ কি ! আবার আলো জ্বলেছে, রায়বাড়ির সেই জলসাঘরে ; সেই আধপোড়া বাতিগুলিই আবার জ্বলে উঠেছে ! সেই আলোতে ঘরে তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবিগুলো দুলছে, তাঁরা যেন তাঁকে ডাকছেন। ফিরে আসতে বলছেন ! চোখে তাঁর জল এল। তিনি ফিরে এলেন। কালী বাগদী কালী-বাড়ির বিরাট সিংহদ্বারে গিয়ে সবলে করাঘাত হানলে—দুয়ার খোল।

'জলসাঘরে'র মাঝের গল্প আর লেখা হয় নি। লিখি নি। এর এক বৎসর পরেই 'জলসাঘর' বই প্রকাশিত হল। সজনীকান্ত জলসাঘরের 'জলসাঘর' প্রকাশ করবেনই। সেই কারণেই ওই দুটিকে এক করেই জলসাঘরের পালা শেষ করলাম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এলেন। আমি একদিন 'জলসাঘর' হাতে নিয়ে বিচিত্রা-ভবনে উপস্থিত হলাম। তাঁকে প্রণাম করে বইখানি তাঁর হাতে দিয়ে চলে এলাম। এখানে এম্পায়ারে এবং ছায়ায় নৃত্য-নাট্যের পালা হল। সে বোধ হয় সবসুদ্ধ সাত-আট দিন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে যাঁরা যাওয়া-আসা করলেন, তাঁদের কাছে 'জলসাঘরে'র প্রশংসার কথা শুনলাম। কলকাতার নৃত্যনাট্যের পর্ব শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে

ফিরলেন। ফেরার পথে তাঁর হাতে নাকি 'জলসাঘর' বইখানি ছিল! ট্রেনেই তিনি ইরিসিপ্লাসের আক্রমণে জ্ঞান হারান বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন চেতনাহীন অবস্থা তাঁর। গোটা দেশ উৎকণ্ঠায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তাকিয়ে রইল শান্তিনিকেতনের দিকে। সে কি উদ্বেগ! তার পর মেঘ কাটল, আবার আলোয় ভরে উঠল দেশ। কবির চেতনা ফিরেছে। আশঙ্কা কেটে গিয়েছে। এ সংবাদ যেদিন কাগজে বের হল, ঠিক তার তৃতীয় দিনে দুখানি পত্র পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে। একখানি লিখেছেন সুধীর কর—কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি, অন্যখানি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুধীর কর লিখেছেন—তারাশঙ্করবাবু, পত্রপাঠ যদি একখানি 'জলসাঘর' কবিকে যে ভাবে লিখে দিয়েছিলেন তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর অসুখের সময় যে সব ভক্ত এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই কোন সাহিত্যরসরসিক বা রসিকা নিজের পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে গেছেন। এদিকে গুরুদেব বইখানির বার বার খোঁজ করছেন। না-পেলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। বইখানি পাঠালে অত্যন্ত উপকৃত হব। আমার নামে বা রথীন্দ্রবাবুর নামে পাঠাবেন।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবুর পত্র সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখেছেন—শ্রীসুধীর কর আপনাকে পত্র লিখছেন। একখানি বই পাঠালে অত্যন্ত খুশি হব।

বই পাঠিয়ে দিলাম সেই দিনই।

এর কয়েক দিন পর 'প্রবাসী' আপিসে পুলিন সেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যসহকারে বললেন, শুনেছেন নাকি?

বুঝলাম না কথা। উত্তরে প্রশ্নই করলাম, কি?

একটু বিস্মিত হয়েই পুলিনবাবু বললেন, সে কি? কেউ জানায় নি?

না তো। কি?

পুলিনবাবু আবার হেসে বললেন, না, তা হলে বলব না। থাক। শীর্ণ-কায় মানুষটি আপনি স্ফীতকায় হয়ে উঠবেন। হয়তো বা ফেটেই যাবেন।

আমি আর বার দুই অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হলাম। এটুকু আমার স্বভাবের বাইরে। তবে সংবাদটা পেলাম। শ্রীযুক্ত সুধীর করই আমাকে জানিয়ে-

ছিলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন 'জলসাঘর' বইখানি। ওই "রায়বাড়ি" গল্পে, গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সুধীর কর লিখেছেন, গুরুদেব কোন খ্যাতনামা কবিকে আপনার সম্পর্কে একখানি মূল্যবান পত্র লিখেছেন। তাতে ইউরোপের গল্পলেখকদের সঙ্গে আপনার তুলনা করেছেন। পারেন তো চিঠিখানি সংগ্রহ করুন।

যাঁকে লিখেছেন তিনি খুব সম্ভব ৺সুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয়। কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে চিনিয়েছিলেন আমাকে! যাই হোক, আমি কিন্তু কোন খোঁজ করি নি।

কি বলে যাব? কি বলব?

এই কারণেই 'জলসাঘরে'র "রায়বাড়ি" আমার খুব প্রিয় গল্প। কিন্তু গল্পটি মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের কাছে আদৌ সাদর অভ্যর্থনা পায় নি। এই পত্রিকাটির আপিসের নিয়ম ছিল গল্প যাবে মালিকের কাছে। তিনিই গল্প নির্বাচন করতেন। আগে সম্পাদকের হাতে দিতাম, তিনি পাঠিয়ে দিতেন কর্তার দপ্তরে। এ সময়ে কর্তার কাছে সরাসরি দিয়ে আসবার মতো সাহস এবং প্রতিষ্ঠা আমার হয়েছিল। আমি গল্পটি কর্তার হাতে দিতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, এই তো পর পর তিন-চারটে গল্প আপনার ছাপা হল। আবার এখন কেন? আমি বললাম, থাক আপনার কাছে, এক মাস পরেই ছাপবেন।

তিনি আর কোনও কথা বললেন না। লাল পেনসিল দিয়ে একটা ঢেঁড়া-চিহ্ন দেগে রেখে দিলেন। ঢেঁড়া কাটা চিহ্নটাই এমনি যে, কাটা অর্থাৎ বাতিল ইঙ্গিতটা মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয়। আমি সন্দিগ্ধ হয়ে সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে কথায় কথায় চিহ্নটার অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর পেলাম, ওটার অর্থ রিজেক্‌টেড্‌। যাবে না।

সম্পাদকীয় দপ্তরে কোন কথা না বলেই ফিরে এলাম। লেখাটাও ফিরিয়ে আনলাম না। মনে মনে স্থির করলাম, থাক, ওঁরাই ফিরিয়ে দিন।

গল্পটি কিন্তু পরের মাসেই ছাপা হল। তখন আমি দেশে। একটু বিস্মিত হলাম। তখন আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাইস হোটেলে খাওয়ার ফল ফলেছে। দুরন্ত পেটের রোগে ভুগছি।

পুজোর ঠিক পরেই কিছুদিনের জন্য পাটনায় মামাদের ওখানে যাব স্থির করলাম। যাব—হঠাৎ বাধা পড়ল 'গণদেবতা'য় যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা আছে, সেই দাঙ্গা আমাদের দেশে বেধে ওঠবার উপক্রম হল।

শুরু ওই একটা তালগাছ নিয়েই। মুসলমানটির নামও ওই রহম শেখ। এবং এই ঘটনাটি আমার জীবনে লাভপুরের সঙ্গে বন্ধন-সূত্রে আবার হানলে কঠিন আঘাত।

একটি তালগাছ কাটার ঘটনা উপলক্ষ্য করে আমাদের ও-অঞ্চলে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল তার এক পক্ষে রহম শেখ, অন্য পক্ষে আমাদের গ্রামের প্রধান ধনী ষষ্ঠীকিঙ্করবাবু। এ ঘটনাটি 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে জুড়ে দিয়েছি। তখন লীগ-আমলের প্রথম। লীগ-মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসর। সামান্য ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হল সে স্মরণ করলে আজও শিউরে উঠি। আমিও এর মধ্যে প্রায় স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলাম; জড়িয়ে পড়েছিলাম হিন্দুদের পক্ষেই, পঞ্চগ্রামের দেবু ঘোষের মতোই। ফলে যখন সদর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এসে হাজির হল এবং গ্রামের ভিতর দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে বেড়ালে, তখন আমার বাড়ির সামনেই তাদের হল্ট হুকুম দিয়ে সেখানেই প্রায় আধ ঘণ্টা লেফট-রাইট কুচকাওয়াজ করিয়ে বেশ হুমকি দেখিয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ছে, সে দিনটি ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া কি চতুর্থী। এদিকে পুজোর পর ত্রয়োদশীতেই আমার পাটনা রওনা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই কারণেই আটকে গিয়েছি। সে দিন রিজার্ভ ফোর্স এসে পড়তেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ব স্থির করলাম। সন্ধ্যাবেলা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তলব পাঠালেন থানায় এবং আমাকে খুব শাসিয়ে দিলেন।

অথচ যাঁদের নিয়ে বিবাদ, প্রকৃত পক্ষে যারা দাঙ্গার এক অংশ তাঁদেরই ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদেরও ধন্য করলেন, নিজেও ধন্য হলেন। ধন্য না হলেও আহারে পরিচর্যায় সুনিদ্রায় পরিতৃপ্ত হলেন।

আমি রাত্রেই রওনা হয়ে গেলাম।

ভাগলপুর পড়ে পথে। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু "বনফুলে"র সঙ্গে তখন নিয়মিত পত্রালাপ চলত। তিনি বার বার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন—এখানে এস, অসুখ ভালো হবে, শরীর সেরে যাবে! আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।

বনফুলের লেখা গল্পগুলি কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, অর্থাৎ গল্পগুলির ঘটনা সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু ডাক্তার বলাইচাঁদের দেওয়া ভরসা একেবারে খাঁটি বাস্তব। ভাগলপুরে থাকি বা না থাকি একবার ওখানে নেমে বলাইকে দেখিয়ে ওষুধপত্রের একটা ব্যবস্থা করে নেবার অভিপ্রায় ছিল, আর ছিল এই সবল এবং প্রাণখোলা মানুষটির সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবার বাসনা। ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ-মুঙ্গের এ দুটি জায়গা যাবারও অভিপ্রায় ছিল। ভাগলপুরে নেমেছিলাম খানিকটা রাত্রি থাকতে। রাত্রিটুকু স্টেশনে কাটিয়ে দিয়ে আলো ফুটতেই একটা একা করে বনফুলের বাসার দরজায় হাজির হলাম। মোটাসোটা মানুষটি কাছাকোঁচা গুঁজতে গুঁজতে দরজা খুলে আমাকে দেখেই হৈ-হৈ শুরু করে দিলেন। এ দুটিই বনফুলের বৈশিষ্ট্য। বলাই যখন সেজে-গুজে সমাজে সভায় ঘোরাফেরা করেন, তখন কোমরে বেল্ট আঁটেন; বাড়িতে বেল্ট খুলে বসলেই মিনিটে মিনিটে কষি গুঁজতে হয় এবং ক্রমে ক্রমে গোড়ালির কাপড় হাঁটুর উপরে উঠে যায়। এরই মধ্যে অনর্গল গল্প—সে বৈঠকী এবং সাহিত্যিক দুইই। এর মধ্যে বাইরে থেকে ডাক পড়লে ওই অবস্থাতেই কষিতে আর একটা পাক মেরে কাছাটা টানতে টানতে গিয়ে হাজির হন সহাস্যমুখে; সবল মানুষ, হাস্য যত প্রাণময় ও সহজ, ক্রোধও তত তীব্র সশব্দ। ক্রুদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গেই খোলাখুলি জানিয়ে দেবেন, তিনি রেগেছেন। অন্য দিকে ভোজনবিলাসী এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ। অতি অল্প আসবাবে ঘরখানি সুন্দর করে সাজানো—যতদূর মনে পড়ছে, বনফুলের ফুলদানি কখনও খালি থাকে না,

ভোরবেলাতেই ফুলের গুচ্ছ সংগ্রহ করে সেগুলিকে পূর্ণ করে দেন, তেমনি আলো ঘরগুলিতে। বাড়ির উঠানে জালের খাচায় ডজন খানেক বুনো হাঁস। পরে শুনেছি, বাড়িতে গাই এবং ভালো জাতের রামপক্ষী পুষেছেন। বলাইযেব গৃহিণীও এদিক দিয়ে তাঁর স্বযোগ্য সহধর্মিণী। বনফুলের ক্রমবর্ধমান খ্যাতিব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ভদ্রমহিলা ঘর-সংসারের একচুল ত্রুটি না ঘটিয়েও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে একে একে আই. এ, এবং বি. এ, পাস করেছেন, এম. এ পাস করবার ইচ্ছেও রাখেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করাই ছিল। এবং বনফুল নাকি একমাত্র এই পাশের যোগ্যতাটাই বিবাহের সময় বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর নাকি পণ ছিল ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়ে ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু তাঁর নিজের দাবি ছিল না। সেকালে ম্যাট্রিক পাস মেয়ে সাধারণ বাঙালীব ঘরে খুব স্বলভ ছিল না এখনকার মতো। কাজেই বনফুলেব পিতৃদেবকে কন্যাসন্ধানে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। খোঁজ পেয়ে তিনি বনফুলকে জানিযেছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাস মেয়ে পাওযা গিয়াছে। এখন তুমি নিজে দেখিয়া পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাও।' বনফুল জানিয়েছিলেন, "আমার দাবি ম্যাট্রিক পাস মেয়ে। সে যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই উঠে না। ভদ্র ও সদ্‌বংশ—স্বতরাং দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই।' বিবাহ হয়ে গেল। তাতে বনফুলেব জীবনে কোন ক্ষোভের কারণ হয় নি। পারিবারিক জীবনে তিনি স্বখী; পত্নীটি সত্যকারের গুণবতী এবং প্রকৃতিগত ভাবে তাঁদের ঐক্য অসাধারণ। বনফুলের মাছ-মাংসে একটু বেশি রুচি, পত্নীরও তাই; এমন কি কতটা মুন দিয়ে রান্না হবে—এ নিয়েও কোনদিন মতভেদ হয় না। রন্ধনবিদ্যায় স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান পারদর্শিতা। কলকাতায় সজনীকান্তের বাড়িতে বনফুলের রান্না করা মাংস খেয়ে অনেক সাহিত্যিকই তাঁর তারিফ করেছেন। বনফুল-পত্নী অভ্যাস ও বেশি চর্চার ফলে উৎকৃষ্টতর রান্না করেন। এ কথা বনফুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদের ভয়েও গোপন করব না এবং বন্ধুপত্নীর নিকট থেকে অধিকতর সমাদরের প্রত্যাশাতেও বাড়িয়ে বলছি না। কারণ তাঁদের ওখানে অচিরে আতিথ্য গ্রহণেব কোন কল্পনাই নেই। এমন কি সুদূরভবিষ্যতে কবে যেতে পারি সেও গণনা করে বলতে পারি না। তখন ছেলে

মেয়েতে তাঁদের তিনটি—কেয়া, অসীম, রত্ন। বনফুলের সংসার রৌদ্রালোকিত পুষ্পোত্থানের মত সুন্দর ঠেকল। মন জুড়িয়ে গেল।

পৌঁছবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চা-পর্ব। ডিম-মাখানো ভাজা পাউরুটির কথা আজও মনে পড়ছে। কারণ ওই বস্তুটা বলাইয়ের ঘরেই প্রথম খেয়েছিলাম। আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে এসব অজানা। ছোট্ট একটি আধুনিক নাগরিক পরিবারের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পবিচয। আধুনিকও বটে, নাগরিকও বটে, কিন্তু উগ্রতাবর্জিত। সইয়ে নিতে, খাপিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় না, সময় লাগে না।

চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতেই বনফুল পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ গোটা চারেক হাঁস তৈরী করতে বল। আর মাছ—ভালো মাছ।

আমি শিউরে উঠে বললাম, দোহাই মশাই! মরে যাব আমি! আপনি জানেন না, আমি পেটের গোলমালে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছি।

তখন তাঁর সঙ্গে 'আপনি' 'আজ্ঞে' চলত।

বনফুল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। তা হলে তো মাংসই আপনার পথ্য। পথ্যই নয়, ওষুধও বটে। ভয় কবছেন কেন? আমি তো ডাক্তার। দায়ী আমি। নিন আর-এক পেয়ালা চা। ওগো, আর-একখানা রুটি।

কথার মাঝখানেই বলাই-গৃহিণী ডিম-মাখানো পাঁউরুটি নিয়ে হাজির। আমি উপুড় হয়ে পড়লাম প্লেটের উপর।—দোহাই! অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু ভয় যাচ্ছে না।

বনফুল নিজের প্লেটে সেটা নিয়ে হেসে বললেন, তবে থাক।

এর পর নিয়ে গেলেন নিজের ক্লিনিকে।

বনফুলেব ক্লিনিক-প্র্যাকটিস। স্টেশন রোডের উপর ঘরখানিতে নানা যন্ত্র-পাতিতে ভর্তি বিচিত্র গন্ধ সেখানে। রক্ত, মল, মূত্র, পুঁজ, থুথু পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—টেস্ট টিউব, স্লাইড, মাইক্রস্‌কোপ, স্পিরিট ল্যাম্প, রিপোর্ট-ফর্ম, খাতা। তারই মধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চার খাতা-কলম। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ওষুধপত্র মিশিয়ে পরীক্ষার সামগ্রী চাপিয়ে দিয়ে এসে খাতা-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসছেন। অক্লান্ত লেখনী, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি, আকাশচারী বিহঙ্গের

মতো কল্পনার পক্ষবিস্তার ; লেখা চলে—গল্প, কবিতা, হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গরসাত্মক। বনফুল বললেন, এবার আপনার রাজ্যে প্রবেশ করছি। সিরিয়াস লেখা শুরু করেছি। বড় লেখা। দেখি, কেমন হয়! একটা লিখেছি, শোনাব আপনাকে।

তখনও পর্যন্ত বনফুল বড় লেখা এবং সিরিয়াস লেখা শুরু করেন নি। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস নিয়েই কারবার করতেন।

কথা বলতে বলতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। নির্দিষ্ট সময় পার হচ্ছে, নামাতে হবে পরীক্ষার বস্তু। নামালেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হলেন। মনে হল, ভুলেই গেছেন সাহিত্যের কথা। স্লাইড চড়ালেন মাইক্রস্‌কোপে। বিশ্লেষণ শেষ করে ফর্ম টেনে বসে পূরণ করে চললেন। সই করলেন। খামে পুরলেন। নামঠিকানা লিখে রেখে আবার একটা পরীক্ষা শুরু করে দিয়ে এসে বসলেন লেখার টেবিলে। লিখে চললেন।

বিস্মিত হয়ে গেলাম শক্তি দেখে।

এরই মধ্যে লোক আসছে, ফিস দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যাচ্ছে। বেলা একটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে চলল এই দুই সাধনা—বিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের।

এর পর বাড়ি। স্নান আহার। পরিচ্ছন্ন এবং অভিনবত্বে ভরা আহারের উপকরণ। মাংসে হাত দিয়ে ভাবিত হলাম। বনফুল বললেন, খান মশায়। আমি ডাক্তার, আমি বলছি—খান।

কথায় আদেশের সুর। ভয়ে ভয়েই খেলাম।

খাওয়ার পর লেখা নিয়ে বসলেন বনফুল। একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগলেন। গতরাত্রি জেগে কেটেছে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে। তার উপর দুপুরে ঘুম অভ্যেস। আমার চোখে ঘুম নামল। কিন্তু বনফুল পড়েই গেলেন, পড়েই গেলেন—একটার পর একটা, একটার পর একটা। আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা বোধ করি তাঁর চোখেই পড়ল না।

আজও মনে পড়ছে; সে দিন মনে মনেই বলেছিলাম, বনফুল সিংহ নন, ব্যাঘ্র। সিংহ শুনেছি মৃত বা অতিদুর্বল প্রাণী বধ করে না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় আবার চা-খাবার।

এইবার বনফুল থামলেন। বললেন, চা খান। ঘুম ছাড়বে। দিনে ঘুমোলেন না, ভালো হল, এতটুকু বদহজম হবে না। কি, অম্বল মনে হচ্ছে ?

সন্ধ্যার সময় বনফুল আমাকে নিয়ে বের হলেন; বিখ্যাত Asude অর্থাৎ আশু দে, মাখন চৌধুরী—এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আরও কারও কারও সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে একটি কৌতুকের কথা মনে আছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, দাঁড়ান।

একটি পাশের পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এক ভদ্রলোক আসছেন, দেখছেন ?

দেখলাম, একজন খাঁটি বাঙালী প্রৌঢ় অর্থাৎ আমারই মতো ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত প্রৌঢ় বাঙালী আসছেন। গলায় যেন একটা কম্ফার্টার জড়ানো ছিল মনে হচ্ছে। বনফুল বললেন, উনি হলেন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র সেই মেজদা, যিনি নাকি গঁদের আঠা দিয়ে নাক ঝাড়া, জল খাওয়া, বাইরে যাওয়ার সময়ের হিসেবের কাগজ পাতায় এঁটে রাখতে গিয়ে নিজের পড়বার সময় পেতেন না, বছর বছর ফেল করতেন, যিনি "ছিনাথ বউরূপী"র ব্যাঘ্রবেশ দেখে দাঁতকপাটি লাগিয়ে তক্তপোশে পড়ে গোঁ-গোঁ করেছিলেন।

উনিই তিনি ?

উনিই তিনি। দেখুন না, মজা দেখুন।

ভদ্রলোক বড় রাস্তায় পড়তেই বনফুল তাঁকে নমস্কার করে কুশলবার্তা প্রশ্ন করলেন এবং আমার পরিচয় দিয়ে বললেন—ভাগলপুর বেড়াতে এসেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় ভাগলপুরের যে সব জায়গার কথা আছে, দেখছেন এবং দেখবেন। যে সব পাত্রপাত্রীর কথা আছে—

এর পর ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন।

বনফুল হেসে বললেন—শরৎবাবুর ওপর ভয়ানক চটা উনি।

সন্ধ্যের পর আবার কিছুক্ষণের জন্য ক্লিনিক। তার পর বাড়ি ফিরে আবার চা এবং সাহিত্য। সে দিন সন্ধ্যায় শোনালেন তাঁর প্রথম সিরিয়স রচনা, বড় গল্প—'টাইফয়েড'।

শুনে চমকে গেলাম।

এর পরই এলেন বনফুলের মেজভাই ভোলানাথ। তিনিও ডাক্তার। ভাগঃ পুর থেকে কিছু দূরে ডাক্তারি করেন। চমৎকার চেহারা। খাপখোঃ তলোয়ারের মতো। ভোলানাথও লিখতে পারেন। কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরে আর চর্চা রাখেন নি। চমৎকার মানুষ।

তিন দিন ছিলাম বনফুলের ওখানে। তিন দিনেই বুঝলাম, আমার রোগে উপশম হয়েছে। চতুর্থ দিনে রওনা হলাম। বনফুল ও তাঁর গৃহিণী অনে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার তাগিদ ছিল। এবং সঙ্কোচের সঙ্গেই বলা যে, বনফুলের মতো স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে আহারে সাহিত্যালাপে মজলিসে পাঃ দিয়ে চলা আমার পক্ষে কঠিনও হয়ে উঠেছিল।

আমার জীবনে সাহিত্যিক সুহৃদের মধ্যে অন্তরঙ্গতমদের মধ্যে বলাই অন্যতম সজনীকান্তের পরেই তিনি স্থান জুড়ে বসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রীতিনিবেদ নিয়মিতভাবে চলেছে পত্রালাপের মধ্যে। দু-চারবার মতান্তরও ঘটেছে। অনেকদি নীরবও থাকি দুজনে। আবার একটা ডাক আসে, মনের দুয়ার খোলে।

একবার জামসেদপুরে চলন্তিকা-সাহিত্য-সম্মেলনের আসরে আমরা প্রকাশে কোমর বেঁধে লড়াই করেছিলাম। সে লড়াই কবির লড়াইয়ের মতো উপভোগ হয়ে উঠেছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। লোকে ভেবেছিল, দুই বন্ধুর বুঝি বিচ্ছে ঘটে গেল জীবনে। কিন্তু সভার শেষে দুজনকে গলা ধরে বেড়াতে দেখে তাঁদে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ফেরবার পথে ট্রেনে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বনফুল ে অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তার অনেকগুলি এখনও মনে আছে।

আর একবার ঘটেছিল, আমার 'কবি' উপন্যাস নিয়ে।

'কবি' উপন্যাসখানি বনফুলের কাছে ভাল্‌গার বলে মনে হয়েছিল। অবং আমি কোন বাদ-প্রতিবাদ করি নি।

আরও দু-চারবার ঘটেছে হয়তো। সে সব তুচ্ছ ঘটনা। মোটের উপ বনফুল আমার জীবনে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার অনে ঋণ। অদ্ভুত মানুষটিকে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কাছে যেতে সাহ করি না, ওই সবলদেহ মানুষটির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারব না—কি আহারে কি আড্ডায়, কি ঘোরায়, কি সাহিত্যালাপে।

বনফুলের ওখান থেকে অর্থাৎ ভাগলপুর থেকে গেলাম পাটনা। পাটনাতে এসে দেখলাম একজন বড় মানুষকে। কিন্তু তার পূর্বে একজন অতি সাধারণ মানুষের কথা আছে। পাটনা যাবার পথে একটি নগণ্য মানুষ মনে ঠাঁই করে নিয়ে বসে রয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য পরিচয়। পরিচয়ই বা কি! কয়েকটা কথাবার্তা, সামান্য কিছু অর্থ ও কর্ম বিনিময়। এতেই সে সেদিন এমন আনন্দ দিয়েছিল যার স্বাদ অমৃতের মতো, না হলে সে স্বাদের স্মৃতি আজও ভুললাম না কেন?

কিউল জংশনের ধর্মশালার পরিচারক। ওই দেশের দেহাতি মানুষ; সবল সুস্থদেহ, শান্ত, মিতভাষী। রাত্রি একটার সময় শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এলাম ধর্মশালায়। নদীর ধারে ফাঁকা স্টেশনে আমাকে জামা-জোড়া পরেও কাঁপতে দেখে কুলি এখানেই এনে তুলে দিলে। মধ্যে উঠোন, চারিদিকে খিলেনের বারান্দাওয়ালা সারি সারি ঘর; নদীর বাতাস নেই; উঠোনে ঢুকতেই আরাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রিকালে লোকটি এসে দাঁড়াল।

পরণাম বাবুজী!

জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি? উত্তর পেলাম—আপনাদের সেবক আমি। এই ধরমশালার নোকর। হাত জোড় করে বললে।

এ সংসারে কত মানুষ দেখলাম, বড় ছোট নিঃস্বার্থ স্বার্থপর ভদ্র-ইতর; কিন্তু এমন একটি মানুষ দেখলাম না বলেই আজ মনে হচ্ছে। অন্তত এই ধরনের এমন মানুষ।

আপনার কর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে করে গেল, এক বিন্দু বিরক্তি দেখলাম না, যে কাজগুলি করলে এতটুকু ত্রুটি তার চোখে পড়ল না।

এরই মধ্যে সে কিছু বাণিজ্যও করলে আমার সঙ্গে।

বললে—আঁধিয়ারা বাবুজী, তোমার বাতি না হলে তো অসুবিধে হবে। অন্ধকারে আলো কেউ ধরে না, এইটেই চিরন্তন দুঃখ এবং সত্য। ধরতে চাইলে নেব না? বললাম—নিশ্চয় চাই। এনে দাও। মনে মনে ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিলাম সুবিবেচনার জন্য। বললাম, তোমার যাবার পথে তুমি দেওয়ালীর সমারোহ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছ যে বিশ্বাসে, সে বিশ্বাস সত্য

হোক—সত্য হোক—সত্য হোক। লোকটি তিন ইঞ্চি লম্বা আঙুলের মতো সরু বাতির বাণ্ডিল এনে নামিয়ে দিয়ে বললে—নাও, কটা নেবে।

ভাবছিলাম স্বার্থপরের মতো বেশি নেওয়াটা কি উচিত হবে?

লোকটি সবিনয়ে বললে—দাম কিন্তু বাজার থেকে একটু চড়া। কত বলেছিল মনে নেই। আজকের দিনের অর্থাৎ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া বাজারের মধ্যে বসে সে বাজারের দর-দাম মনে করা অসম্ভব।

চমকে উঠে বললাম—দাম লাগবে নাকি?

সবিনয়ে সে হাতজোড় করে বললে—গরিব আদমী আমি বাবুজী—ধরমশালার নোকর, আপনাদের সেবক, এখানকার অতিথ আগন্তুকদের অন্ধকারে কষ্ট হয় দেখে বাতি এনে রেখেছি! বাজারে দাম অবশ্য কম। এত দাম। এখানে আমি এনে রাখি, তোমাকে কষ্ট করে যেতে হয় না, তার জন্য কিছু বেশি নিই! এই মাত্র। তা তুমি একটাই নাও; নিবিয়ে রেখে দাও, দরকার হলে ম্যাচিস ধরিয়ে জ্বালিয়ে নেবে। ভয় নেই, অন্ধকারে থাকলে কোন জিনিস তোমার চুরি যাবে না। আমি পাহারা আছি।

সঙ্গে আমার লোটা বা কোনো জলাধার ছিল না; উঠোনে একটি কুয়োতে শিকলে বাঁধা একটি বালতি আছে—সাধারণের জন্য। জল তুলে হাতে খেতে হয়। লোকটি লোটা ভাড়া দেয়, বালতি ভাড়া দেয়। মাটির ভাঁড় রাখে, বিক্রি করে। দাম বেশি সে কথা সে অকপটেই বলে; কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের কথা, লোকটিকে তবু কালোবাজারী বলে মনে হয় না। চড়াদামে কিনেও তাকে উপকারী বন্ধু বলে মনে হয়। এর মধ্যেও তার লোভ দেখতে পাই নি। তার সঙ্গে আলাপের মধ্যেই সে মুঠোভর্তি ভাঙা বাতি এনে দেখিয়ে বলেছিল—এরই জন্যে বাবুজী, এই লোকসান হয় বলেই দাম কিছু বেশি নিই। আর মাটির ভাঁড় কত ভাঙে, সে আর কি বলব? এই এত।

অবিশ্বাস করি নি। তাকে অবিশ্বাস কেউ করতে পারে কি না জানি না, যিনি করেন তিনি মহাপাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই। সকালবেলা সেই কুলি ডেকে দিলে, বিদায় নেবার সময় একটি আধুলি তার হাতে দিয়েছিলাম। সে পূর্বদিকে সদ্য-ওঠা সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, হে সুরযনারায়ণ, বাবুজীর মঙ্গল কর।

কুলি বললে—ওই ওর আশীর্বাদের এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা।

কথায় কতটা তাকে প্রকাশ করতে পারলাম জানি না, এই বিবরণ পড়ে তার সম্পর্কে কার কি ধারণা হবে বলতে পারি না, কিন্তু সে আমার অতীত কালের অন্ধকার চিত্তাকাশে দ্যুতিমান একটি নক্ষত্রের মতোই জেগে রয়েছে। ভাগলপুর থেকে পাটনা যাওয়ার পথে আর সবই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, কিন্তু কিউল স্টেশনের ধর্মশালা দেখতে পাচ্ছি তারই আলোতে।

পাটনায় এসে বনফুলকে লিখলাম এই কথা। বনফুল উত্তরে যা লিখলেন তার মর্মার্থ—ওর কথা সাহিত্যের মধ্যে ধরে রেখে দিন। স্বধর্ম পালন করুন। নিজের তন্ত্রে ওই নরদেবতাটির অর্চনা করুন।

আমি তার আগেই অর্থাৎ বনফুলকে পত্র লিখে তাঁর পত্র আসতে আসতে "ভ্রমণ-কাহিনী" নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলাম 'দেশ' পত্রিকায়। 'যাদুকরী' নামে গল্পসংগ্রহে গল্পটি আছে।

পাটনায় এলাম দীর্ঘকাল পর। বোধ হয় বছর আষ্টেক পর। শেষ এসেছিলাম উনিশ শো তিরিশ সালের মে মাসে কি জুন মাসের প্রথমে। জেলে যেতে হবে, আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণের দিন পড়েছে, তার আগেই এখানে এসেছিলাম আমার মাকে নিয়ে যেতে। দেশের ম্যালেরিয়ায় মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল। মা এসেছিলেন শরীর সারতে। তার পর এই। এই সময় আমার বড় ছেলে ওখানে থেকে কলেজে পড়ছিল। সেও ছিল পাটনায়।

পাটনায় এই প্রথম এলাম সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে। আমার বড় মামা ছিলেন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। পাটনার ওই পাড়ায় সকল কর্মের অগ্রণী, লাইব্রেরি, ক্লাব, থিয়েটার, সেবাধর্ম, সৎকার-সমিতি সর্বত্র ছিল তাঁর স্থান। ওইটিই ছিল তাঁর কর্ম এবং ধর্ম। সরল মানুষ, প্রেমিক মানুষ, পড়াশুনাও প্রচুর, কিন্তু তার সঙ্গে দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি আড্ডায়।

একটি মানুষ দেখলাম সেখানে।

কিউলে দেখে এসেছিলাম একটি মানুষ, আর এই এক মানুষ। ভাস্বর মহিমময় দিব্যকান্তি প্রসন্ন সহাস্য। ছ ফুটের উপর লম্বা, যাকে বলে—[illegible]

মহাভুজ। রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ সুগঠিত দীর্ঘনাসা, কৌতুকোজ্জ্বল ঝকঝকে চোখ, মজলিসের সকল মানুষের উপরে মাথা তুলে বসে আছেন—ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিকভাবে।

লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—এস ভাগ্নে এস।

একটি শব্দ উচ্চারণ করে একটু থেমে আবার একটি শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলেন। বর্ণনা শুনে চাল মনে হতে পারে—হয়তো এমন ধরনে কথা বলা তাঁর প্রথম যৌবনের কোন ফ্যাশন অনুযায়ী অভ্যাসও বটে, কিন্তু অন্তরের প্রসন্নতার মাধুর্যে কণ্ঠস্বর ও বাগ্‌ভঙ্গি এমনি অভিষিক্ত যে পুষ্পিত একটি গোলাপের ডালের মতো কাঁটার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ফুলের শোভায় চিত্তলোককে রঙের বাহারে রাঙিয়ে তোলে, রসসিক্ত করে দেয়, গন্ধে তৃপ্ত করে। গোলাপের ডালের উপমাটা আপনিই এসে গেল। কারণ, শচীমামার কথা বলতে গেলেই গোলাপ-বাগের কথাই মনে পড়বে তাঁর ছবির পটভূমি হিসেবে। গোলাপের শখ শচী-মামার বোধ করি এ জীবনের সব থেকে বড় শখ।

শচীমামা—শচীন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিস্টার। শচীমামাকে না দেখলে পাটনা দেখা সম্পূর্ণই হয় না বলেই আমি মনে করি। হাজার মানুষের মধ্যে প্রথম চোখে পড়বার মতো মানুষ। বাংলা দেশে এ কালে এমন সদৃশ রূপের একটি মানুষ মাত্র আমার চোখে পড়েছে। তিনিও অবশ্য যে-সে নন, ঠাকুর বংশের সন্তান শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীপ্তিতে শচীমামার কান্তি, সৌম্যেনবাবু অপেক্ষা আরও উজ্জ্বল। যেমন বাইরের কান্তি, তেমনই কান্তি অন্তরের। শুধু কান্তিই নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যও অফুরন্ত এবং সে ভাণ্ডার উদারতায় অকৃপণ, মাধুর্যে সুপ্রসন্ন প্রশান্ত। ভরাট কণ্ঠস্বর, তেমনি প্রাণ-খোলা হা-হা-হা হাসি।

পাণ্ডিত্যও অগাধ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কিন্তু তার স্পর্শ প্রখর কণ্টকতীক্ষ্ণ নয়। রস-রসিকতায় প্রদীপ্ত, কিন্তু উত্তাপ নেই। মানুষটির সমস্ত জীবনকে বেষ্টন করে বৈরাগ্যের একটি গৈরিক উত্তরীয় জড়ানো আছে। জীবনে এ মানুষের যা যা যতখানি পাওয়া উচিত ছিল তার কিছুই পান নি, কিন্তু তাঁর কামনা বাসনা যেন এক অপরূপ প্রসন্নতার স্পর্শে প্রশান্ত হয়ে নির্লিপ্ততায় পরিণতি লাভ করেছে। সুপ্রসন্ন বৈরাগ্যে তিনি মহিমান্বিত।

প্রথম যৌবনে হেডমাস্টার ছিলেন দেওঘর ইস্কুলে। তারপর উকিল হয়েছিলেন। ওকালতির কালে অসহযোগ আন্দোলনে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহকর্মী ছিলেন; তারপর কিছুকাল উদাসীর মতো দেশে দেশে বেড়িয়েছেন। এখন ব্যারিস্টার, কিন্তু সে দিকে তাঁর আদৌ রুচি নেই, অনুরাগ নেই। প্রথম বয়সে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মশায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে 'অমৃতবাজারে' লিখতেন।

সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি মনোরম আড্ডা বসত। সেখানে পাটনার বাঙালী সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আসতেন। শ্রীযুক্ত যোগীন ঘোষ—পাটনার বাঙালী সমাজের মুখোজ্জ্বল-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পাটনার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বা সহকারী অধ্যক্ষ; সাহিত্যে যত অনুরাগ তত পড়াশোনা, ঈষৎ বক্র তীক্ষ্ণ রসিকতার অনুরাগী হলেও সহৃদয় মানুষ; সত্যকারের বুদ্ধিবাদী ব্যক্তি। তার সঙ্গে তাঁর শখ বাগানের। যোগীনবাবু মিতব্যয়ী ব্যক্তি, জীবনে কোনখানে এক বিন্দু আতিশয্য অমিতাচার নেই কিন্তু ফুলের শখে যোগীনবাবু প্রচুর খরচ করেন—শুধু অর্থই নয়, তার সঙ্গে নিজের শ্রম এবং সময়। আর ছিল তাঁর ছেলেকে সত্যকারের মানুষ করে তোলার কামনা এবং তার জন্য অধ্যবসায়। যোগীনবাবুর ছেলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; হীরেমানিকের মতো উজ্জ্বল; তার সঙ্গে যোগীনবাবু মানুষের জীবন-গঠনে যা কিছু প্রয়োজন তা অর্জনে সাহায্য করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। নিজে ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন, ছেলেকে সাঁতার শেখাতেন। ছেলে গঙ্গাপারাপার করত, বাপ নৌকা নিয়ে পাশে পাশে চলতেন।

আর একজন আসতেন শ্রীশম্ভু চৌধুরী—পাটনা মেডিকেল কলেজের সান্যালদের আত্মীয়; বায়োলজির অধ্যাপক; লক্ষ্ণৌর লোক, লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বিজু সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যাল তাঁর আত্মীয়। পাটনাতেই বাড়ি কিনে পাকা বাসিন্দে হয়েছেন; লক্ষ্ণৌর ভদ্রতা-ভব্যতা সবই আছে এবং অন্য দিকে শ্রীযোগীনবাবুর সঙ্গে এক টোলের ছাত্রের মতোই সাহিত্য ও কুসুমবিলাসী। ফুলের বাগানে শম্ভুবাবুর খরচ অনেক।

এঁদের দুজনের বাড়িতে যে যেত এবং সম্ভবত এখনও যে যায়, তাকে

কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে শীতকালে, মরশুমী ফুলের মহাসমারোহের সময়। দেশ-দেশান্তর থেকে বীজ আনিয়ে চারা তৈরি করে যে ফুল তাঁরা ফোটান, তার শোভা দেখে যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ হতেই হবে—সে যত বড় রূঢ়প্রকৃতি বাস্তববাদী হোক না কেন! বাগানের এক প্রান্তে কোনো পাত্রে গোবর পচছে, কোনটায় চায়ের পাতা পচছে, কোনটায় কিছু, এবং সে সবই তাঁরা নাড়েন ঘাঁটেন। শচীমামা এঁদের নাম দিয়েছিলেন, বাগানিয়া। এই বাগানিয়াদের বাগান থেকে মরশুমী ফুলের কিছু চারা আসত শচীমামার বাড়ি। শচীমামার শখ ছিল শুধু গোলাপে। যশিডির বিখ্যাত গোলাপ-বাগানের মালিক তাঁর ছাত্র। শচীমামা প্রথম দিন ফুলদানি থেকে একটি গোলাপ ফুল তুলে আমায় দিয়েছিলেন।

আর-একজন এই আসরের নিয়মিত সভ্য ছিলেন। তিনি আসতেন সকলের শেষে, তাই শেষেই তাঁর নাম করছি—নইলে তিনি বৈশিষ্ট্যে খ্যাতিতে সংস্কৃতি-বানতায় কারও চেয়েই কম নন, বরং সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা একজন বড় অধিকারী। আমাদের রভীনদা অর্থাৎ শ্রীরভীন হালদার; বি. এন. কলেজের বাংলার অধ্যাপক। পাটনায় বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। আজীবন কুমার রভীনদা সাজে পোশাকে চালে চলনে যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনই পরিপাটি। সে আমলে থাকতেন বি. এন. কলেজের হস্টেলে; হস্টেলের অধ্যক্ষ হিসেবে; সে ঘরে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। রভীনদা সন্ধ্যার পর হস্টেলের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান সেরে আয়নার মতো পালিশ-করা গ্রেজকিডের আলবার্ট পায়ে, খদ্দরের দামী ধুতি, চমৎকার ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি ও সরুপাড় সাদা শালখানি গায়ে দিয়ে এসে হাজির হতেন—কোনদিন সাড়ে-আট, কোনদিন নয়, কোনদিন সাড়ে-নটায়। শচীমামার গেটের বাইরে রাস্তায় একখানি ফিটন এসে থামত। শচীমামা বসতেন হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে হাতের মুঠোটি রাখতেন, শব্দ শুনেই হাত তুলে বলতেন—ওঃই!

তারপর থেমে থেমে বলতেন, সে—এসেছে।

প্রথম দিন রভীনদা আসতেই শচীমামা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, ভায়ে, এইবার তোমার যাচাই হবে। এইবার বোঝা যাবে, তোমার

কত দর! কষ্টিপাথর এল! শঙ্কিত অবশ্যই হয়েছিলাম। এই পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এসে অবধিই নিজেকে অসহায় এবং সত্যই নগণ্য বলে বোধ করছিলাম। শুধু সস্নেহ পরিমণ্ডল অনুভব করে ভরসা পেয়ে পিপাসু চিত্তে তাঁদের মিলন-তীর্থের গোমুখী থেকে ঝরা জলধারা পানের প্রত্যাশায় বসে ছিলাম।

পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতও নই, যোগ্যতাও নেই। ভয় না পেয়ে উপায় কি? রঙীনদা কিন্তু আদৌ আমাকে যাচাই করেন নি। তিনি আমাকে স্নেহের বশেই খাঁটি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রঙীনদা এলেই উঠত তর্ক। সাহিত্যিক তর্ক। এক দিকে শম্ভুবাবু ও যোগীনবাবু, অন্য দিকে একা রঙীনদা। ভরাট মোটাগলা রঙীনদার কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠত। শচীমামা বসে বসে হাসতেন, উপভোগ করতেন। সর্বশেষে মুখ খুলতেন তিনি। তাঁর মতামত মেনে নিতেন সবাই, না মেনেও উপায় থাকত না। তাঁর বিচার ছিল নির্ভুল, অনুভূতি ছিল সূক্ষ্মতম; তাই বিচারের উক্তিগুলি হত অলঙ্ঘ্যনীয়—সে যেন প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলে দিত, সঙ্গে সঙ্গে মনে হত, তাই তো, এই তো ঠিক—এই তো সত্য।

পাটনায় আরও অনেক সুধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিমান-বিহারী মজুমদার অন্যতম। ঐতিহাসিক, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বোধ করি কোন প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য ঘরের সন্তান। তাঁর অন্তরে বংশগত বৈষ্ণব-সংস্কৃতির বীজ ছিল! কিন্তু তখনও তা উপ্ত হয় নি বলেই আমার মনে হয়েছিল সে সময়। এখনকার কথা জানি না। হওয়ারই কথা। একালের পাণ্ডিত্যের আধিক্যে, বৈষম্যের ফলে যদি সে বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে থাকে, তবে বলতে পারি নে।

বিমানবাবু এলে রঙীনদা সেদিন জেঁকে বসতেন, ভাবটা—যুদ্ধং দেহি! তুমুল এবং প্রবল তর্ক শুরু হয়ে যেত। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায় আসর ভাঙত।

বড় মামার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম স্তব্ধ হয়ে। মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কত শুনলাম, কত শিখলাম! শীতের রাত্রি দশটা সাড়ে দশটাতেই পথ হয়ে যেত জনবিরল—অন্তত এই অঞ্চলটা। মধ্যে মধ্যে পিছনে অন্ধকারের মধ্যে বেজে উঠত ঘোড়ার ক্ষুরের এবং গলার ঘণ্টার ধ্বনি। মনে হত কোন যেন মধ্যযুগ।

এক্কাওয়ালা হেঁকে উঠত, হট যাইয়ে, বচ যাইয়ে—বচ যাইয়ে।

রাস্তার ধার ঘেঁষেই আমরা চলতাম, আমাদের জুতোর শব্দ উঠত। কিন্তু সেসব কিছুই আমার আচ্ছন্ন চৈতন্যের ধ্যান ভাঙতে পারত না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতোই চলতাম। কোনো কোনো দিন কোনো বাড়ির বাগানের গাছের ছায়ার অন্ধকারের মধ্য থেকে রসিক পাগলের কণ্ঠস্বর বেজে উঠত—গাছ থেকে ফল পড়ল, সেই দেখে তুমি আবিষ্কার করলে মাধ্যাকর্ষণ, বেশ কথা, বড় আবিষ্কার করেছ—এ গ্রেট্ ম্যান তুমি। কিন্তু বলতে পার—কোন্ আকর্ষণে, কার আকর্ষণে মানুষের জীবনটা চলে যায়, দেহটা পড়ে থাকে? বলতে পার?

একদিনের কথা মনে পড়ছে। ওই কথাই আপন মনে বকছিল পাগল রসিক। বাঙালীর ছেলে, শিক্ষিত ছেলে ছিলেন, শচীমামাদের থেকেও বয়সে বড়ো; পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি বলছেন? কার সঙ্গে কথা বলছেন রসিকবাবু?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিন্তাকুল নেত্রে রসিকবাবু বলেছিলেন, কথা বলছি নিউটনের সঙ্গে।

নিউটনের সঙ্গে?

হ্যাঁ। এই যে ইটের থামটা দেখছ, এইটে—এইটেই কখনোও নিউটন হয়, কখনো শেক্স্‌পীয়র হয়, কখনোও গ্যালিলিও হয়, কখনোও মাইকেল হয়। মাইকেল মধুসূদন গো! তারা এসে থামের মধ্যে মিশে থাকে, কথা বলে। আবার চলে যায়।

কি জিজ্ঞাসা করছিলেন না?

হ্যাঁ।

যে প্রশ্ন করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন—দেহটা পড়ে থাকে আর জীবন কার আকর্ষণে কোথায় যায়? বলতে পার? তা পারলে না! পারলে না! জানো না।

রসিক পাগল এই সময়টায় আমাকে খুব অভিভূত করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে রসিকবাবু পাগল ছাড়া কিছুই নন। তাঁদের বংশেও নাকি এই ব্যাধি ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষের কথা জানি না; তবে তাঁর ছোট ভাইকে

দেখেছি, তাঁর মস্তিষ্কও সুস্থ নয়। রোগা লোক, খোনাটে সুরে কথা বলতেন। অত্যন্ত ভীতু, বিশেষ করে বড় ভাইকে প্রায় ভূতের মতোই ভয় করতেন। রসিকবাবুকে পথে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কারুর বাড়ি ঢুকতেন বা উলটো পথ কি পাশের গলি ধরে সরে পড়তেন। বলতেন, ওঁটা পাঁগল—বঁদ্ধ পাঁগল। বোধ করি এক ভগ্নীও পাগল ছিলেন। প্রথম দিকে রসিকবাবু ভয় করবার মতোই মানুষ ছিলেন। অনেক কাল আগে, বোধ করি ১৯১৫।১৬ সনে তাঁকে যখন প্রথম দেখি তখন আমিও ভয় পেয়েছিলাম। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মুখ, কৌপীনসার নগ্ন দেহ, সবল পেশীপরিপুষ্ট জোয়ান, কাঁধে কম্বল নিয়ে উন্মাদের মতো পথ হাঁটতেন, আর অনবরত বলতেন, ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ!

যেন ফুঁ দিয়ে কিছু উড়িয়ে দিচ্ছেন বা ঘৃণায় ফুৎকার দিচ্ছেন—ছুঃ! ছুঃ! মুখটা এদিকে ফিরত একবার, ওদিকে একবার। সব দিকেই যেন সেই বস্তুটা রয়েছে, যাকে উড়িয়ে দিতে চান বা যার উপর ঘৃণায় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করছেন।

লোকে বলত, কালী সাধনা করতে গিয়ে শবাসনে বসে পাগল হয়ে গেছেন।

হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ এ দেশে ও পদ্ধতিটা আছে, তখনোও ছিল, একেবারে ও-সাধনা বিলুপ্ত হয় নি এবং পাগলও বহুজন হয়েছে। এতে কেউ কোনো প্রতিবাদই করবেন না। সিদ্ধি পেয়েছেন, সাধনা পূর্ণ হয়েছে বললেই ঝগড়া হবে, কিন্তু রসিকবাবু তা থেকে রেহাই দিয়েছেন মানুষকে। তবে তাঁর কথাবার্তা আচার আচরণ অত্যন্ত বিচিত্র। সেই কারণেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন রসিকবাবু। যখন তিনি উন্মাদ পাগল, তখনকার একটি কথা মনে পড়ছে। তখনই তাঁর প্রতি মন প্রথম আকৃষ্ট হয়। মামাদের বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে একটা কুকুর ছানাকে একটা এক্কা চাপা দিয়ে গেল। কুকুর ছানাটা মরণ-যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ছুঃ! ছুঃ!—শব্দ করে রসিক পাগল যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, মুহূর্তে সেই শব্দ শুনে নিজেই যেন একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে বেঁকেচুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে উঠলেন—আঃ! মরণ। মৃত্যু আ গেয়া।

তারপর ছানাটা তাঁর চোখে পড়ল। পাগল ছুটে এসে পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখে, চিৎকার করে উঠলেন—জল! পানি! জলদি! ডাক্তার! ডাক্তার বোলাও! জলদি!

এর মধ্যেই কুকুর ছানাটা শেষ হয়ে গেল।

যে মুহূর্তে পাগলের তা উপলব্ধি হল, সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে সারা শূন্য-লোকটা খুঁজে চিৎকার করে উঠলেন—কাঁহা গয়া? কাঁহা? কিধর?

এর পর দীর্ঘকাল পরে রসিকবাবুকে দেখলাম—শান্ত পাগল। গভীর কোনো ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে আছেন। মানুষের সঙ্গে কদাচ কথা বলেন। কথা বললেও স্বল্প কথায় মৃদুস্বরে উত্তর দেন। তখন দুপুর হলেই কারুর বাড়িতে গিয়ে বসেন। তারা খেতে বললে খান, না বললে কিছুক্ষণ পর উঠে চলে যান। আমার মামাদের বাড়িতে তাঁর খুব খাতির ছিল। আমার দিদিমা-মাসীমারা বিশ্বাস করতেন যে, শবাসন ছেড়ে পাগল হয়েও আবার সাধনা করে রসিক সিদ্ধ হয়েছেন।

সিদ্ধ হোন বা না হোন, বৃদ্ধ বয়সে শান্ত নীরব রসিকবাবুকে সেই এক ভাবনাতেই মগ্ন থাকতে দেখেছি। যে উন্মাদ, উচ্চ চিৎকারে ওই কুকুর ছানাটার আত্মা বলুন, জীবন বলুন, প্রাণ বলুন সেটা কোন দিকে গেল খুঁজেছিলেন, সেই পাগলকেই শান্তভাবে শীতের রাত্রে রাস্তার ধারে বসে একটা গ্যাস-পোস্টকে নিউটন ঠাউরে তাকে যখন প্রশ্ন করতে শুনলাম—গাছ থেকে ফল পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ তো আবিষ্কার করলে তুমি; কিন্তু কই, বল তো মানুষের প্রাণটা কিসের আকর্ষণে, কেমন আকর্ষণে কোথায় যায়? কি হয়? তখন এ সন্দেহ আর থাকে না যে এই লোকটি—মৃত্যু কি, মৃত্যু কেন, মৃত্যু কোথায়—সেই আদিম মহাপ্রশ্ন নিয়েই পাগল হয়ে গেছেন ও আছেন।

রসিক-পাগলকে শান্তরূপে দেখি উনিশ শো তিরিশ সনের মে বা জুন মাসে। তখনও তাঁর মুখে এই প্রশ্নই শুনেছিলাম। আমি জেলে যাব, কোর্টের সমন হয়েছে হাজির হতে। আমার মা তখন পাটনায় ছিলেন; কোর্টের সমন পেয়েই তাঁকে আনতে গিয়েছি। বেলা সাড়ে দশটা এগারোটার সময় পাগল এসে বাড়ি ঢুকে বসলেন—কম্বল নামালেন, আপন মনেই বিড় বিড় করছে

লাগলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই সেই উন্মাদ পাগল রসিকবাবু। দিদিমা-মাসীমারা তাঁর সিদ্ধিলাভের কথাও বললেন। আমার কৌতূহল বাড়ল। বেশ তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ সহকারেই তাঁকে দেখতে শুরু করলাম। খুব কাছে বসে কথা শোনবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কাছে গেলেই পাগল চুপ করে যেতেন। একদিন কিছু যেন আলোচনা করছিলাম আমরা, সে আলোচনার মধ্যে 'বিষ' কথাটা ছিল, এবং 'মৃত্যু'ও ছিল। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ঠিক এই সময়েই পাগলের জন্য ভাতের থালা কেউ নিয়ে এলেন, এবং আসনের সামনে নামিয়ে দিলেন। আমরা আলোচনাই করছি, পাগলের দিকে দৃষ্টি কারোও ছিল না। হঠাৎ এক সময়ে আমার বড় মামার দৃষ্টি পড়ল তিনি বললেন, কি হল রসিকদা, খাচ্ছেন না যে?

এবার আমিও দৃষ্টি ফেরালাম; দেখলাম, পাগল ভাতের থালা সামনে রেখে আসনে বসে আছেন, ভাতে হাত দেন নি; হাত নেড়ে যাচ্ছেন আর বিড় বিড় করে বকছেন।

মামার কথার উত্তরে পাগল মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষ? না? বিষ যেখানে, মৃত্যু সেখানেই। তা হলে মৃত্যু যেখানে, সেইখানেই বিষ। মৃত্যু তো সর্বত্র। বিষও সর্বত্র। ভাতেও তা হলে বিষ!

আমি এমনি, বোধ করি, তাঁর বিষভীতি ঘোচাবার জন্যেই বললাম, সর্বত্র কি শুধু মৃত্যুই আছে? জীবনও যে রয়েছে সর্বত্র। ভাতেও কি শুধু বিষই আছে? জীবন নেই? নইলে ওতেই জীবন বাঁচে কেন? জীবনই তো অমৃত।

মুখের দিকে তাকিয়ে তারিফ করে পাগল বললেন, ভালো বললে তো! হ্যাঁ! তাও তো বটে! তাই তো! তা হলে ভাতটা বিষ নয় বলছ? উঁহু।

বললাম, বিষও বটে, অমৃতও বটে। বিষামৃত।

খুব খুশি হয়ে কথাটা বার বার যেন মুখস্থ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর খেলেন। যে কয়দিন সেবার ছিলাম, তার মধ্যে কয়েকদিন তিনি মামাদের ওখানে এসেছেন, রোজই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছেন পাগল—কি কথাটি হে? বিষামৃত, নয়?

হ্যাঁ। বিষামৃতেই সংসার সৃষ্টি হয়েছে।

হুঁ। ঘাড় নাড়তে শুরু করতেন পাগল।

শুধু তাঁর পাগলামির এই বিচিত্র একমুখিত্বই তার সবটা নয়, আরও একটু ছিল। পাটনার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে ভালো খাওয়াতে চাইতেন, ভালো পরাতে চাইতেন, ভালো স্থানে আরামে রাখতেও চাইতেন, কিন্তু পাগল তা চাইতেন না। জগৎবাবু উকিল শীতকালে পাগলকে গাড়ি করে দোকানে নিয়ে গেলেন, দোকানদারকে বললেন, খুব ভালো কম্বল দাও। দোকানদার বিলাতী র‍্যাগের গাঁটরি খুলে দিলে। পাগল একবার নেড়ে-চেড়ে বললে, উহু।

আবার অন্য গাঁটরি খুললে। পাগল ঘাড় নাড়লেন এবং শেষে আঙুল বাড়িয়ে যে কম্বল দেখিয়ে দিলেন, তা সামনের থাকে রয়েছে—একেবারে অতি সাধারণ, যার দাম সেকালে ছিল দু টাকা কি তিন টাকা।

রসিক পাগলই। কোনো সিদ্ধিযোগের বিভূতি তাঁর ছিল না; থাকলেও তার জন্যে আমি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হই নি, আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে পাগল হয়েছেন বলে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যারা ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড বলে পাগল হয়, সে পাগলেরা পাগল হয়েও যে শ্রদ্ধা পায়, রসিককে আমিও সেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। এ সংসারে দুনিয়ার মঙ্গল করতে যারা বদ্ধপরিকর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করে, যুদ্ধ বাধায়, ধ্বংস করে দুনিয়া, তাদের চেয়ে এ পাগল অনেক শ্রদ্ধার মানুষ আমার কাছে।

আত্মসর্বস্বতামূলক পাগলামি আর রসিক পাগলের পাগলামি কত স্বতন্ত্র! প্রথমটা আমাকে বেদনা দেয়, দুঃখ পাই, মর্মাহত হয়ে ভাবি—অহংত্বের কি শোচনীয় পরিণতি! শেষেরটায় জাগে বিস্ময় এবং মুগ্ধও হতে হয় এই ভেবে যে, এই মহাতত্ত্বটা যে এমন দিশাহারা হয়ে ভাবলে, সে মানুষটার মধ্যে সম্ভাবনা তো কম ছিল না!

রসিক পাগল আমাকে এমনই প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছি সে সময়। গল্পটির নাম "প্রতিধ্বনি"। পাগল মূর্খ ছিলেন না। কলেজে পড়েছেন, তবে কতদূর পড়েছেন আজ ঠিক মনে পড়ছে না। এবং প্রথম দিকে নাকি সে আমলের ইয়ংবেঙ্গলদের মতই রীতিমত ইংরেজীনবিস ছিলেন। যাঁরা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙালী-সমাজের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন এমনিতেই প্রবাসী বাঙালী-সমাজ কতখানি ইংরেজীভক্ত ছিলেন। সে আমলে ইংরেজের রাজ্য-

বিস্তারের সঙ্গে ইংরেজীতে রাজকার্য সুগম করে দেবার জন্যই বাঙালী দেশ ছেড়ে ভারতের বড় বড় শহরে গিয়ে বাস করেছিলেন। ইংরেজীতে দখলটাই ছিল জীবনে জীবিকা উপার্জনের মূলধন। এর উপর মডার্ন বা ইয়ংবেঙ্গল হবার ঝোঁক চাপলে সে মানুষ কেমন ধাবার ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয়, সে মানুষ এই ধারায় ঘুরল কি করে ভেবে।

পাটনায় আর-একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী বঙ্গবাণীর প্রবীণ সেবক। সেকালের পশ্চিমী হাওয়ার মানুষ, ডাল রুটি ও ব্যায়ামে সবল দেহ—মথুরবাবু। আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তবুও বঙ্গ-সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে যে কোন অনুষ্ঠান হোক, বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হতেন। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, এবং অনুরাগ দেখে শ্রদ্ধানত চিত্তে ভাবতাম, প্রবাসী বাঙালী-সমাজে জন্মে, মানুষ হয়ে, কি করে সে আমলে এত বড় অনুরাগ তিনি অর্জন করেছিলেন! সে আমলে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংলার চেয়ে ইংরেজীটাই ছিল বেশি রপ্ত। বাংলাতে একখানা সে আমলের ছোট আকারের পোস্টকার্ড লিখতে হলে তাঁরা বেশ একটু কষ্ট এবং মনে মনে তিক্ততা অনুভব করতেন।

এই ভাবটা খানিকটা কেটেছে জাতীয় আন্দোলনে, খানিকটা কেটেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির গৌরবে।

অবশ্য সর্বস্থানেই সর্বকালে ব্যতিক্রম থাকে, পাটনার বাঙালীসমাজে মথুরবাবুর কালেও ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন এই ব্যতিক্রম। এবং ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার।

আরও একজন ছিলেন। স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়। এঁদের পর কিন্তু পাটনার বাঙালী-সমাজে দীর্ঘকাল এঁদের মত নিষ্ঠাবান বাংলাসাহিত্যের সেবকের আর আবির্ভাব হয় নি। এই দীর্ঘ ছেদের পর ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ আমি যখন গেলাম, তখন একদল বাঙালী তরুণ নতুন করে সাহিত্যসাধনার আসন পেতেছেন পাটনায়। এঁদের সকলেই কৃতবিদ্য। কেউ এম. এ. পাস করেছেন,

কেউ এম. এ. পড়ছেন, কেউ বি. এ. পড়েন এবং সকলেই ছাত্র হিসাবে কৃতী। অবশ্য এর আগেই বর্তমান কালের বাঙালী সাহিত্যরথীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট রথী শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় পাটনায় কয়েক বৎসরের জন্য এসেছিলেন। তিনি কোন আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন বলে শুনি নি। তবে তাঁর ছাত্র-জীবনের অসামান্য সাফল্যের গল্পের মধ্যে বাংলাভাষায় দখলের কথা শুনেছিলাম। তারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে শ্রীযুক্ত রায়ের বাংলা ভাষা ছিল না। তিনি নাকি ওড়িয়া ভাষা নিয়ে পাস করেছিলেন। পাটনায় কলেজে পড়তে এসে তাঁকে বাংলাসাহিত্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় তিনি বাংলা-ভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তারপর আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে বিলেত গিয়ে যখন 'পথে প্রবাসে' লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর অসামান্য সাফল্য পাটনার তরুণ-সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। একজন আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি এবং আই. সি. এস. খ্যাতি অপেক্ষাও সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্যের তারতম্য পাটনার ছেলেদের মনে নূতন প্রভাব বিস্তার করেছিল—এতে সন্দেহ নেই।

এই ছেলেদের দলের মধ্যমণি ছিলেন যিনি, তাঁর নামও ছিল মণি। বাংলা-সাহিত্যের সেবায় অনুরাগে এবং অধিকারে জন্মগত সূত্রে তাঁর উত্তরাধিকার ছিল। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জন্মাধিকারে থাকে না; দুনিয়ার বিষয়গত জাতিগত উত্তরাধিকার আইন এখানে অচল। তবুও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এ উত্তরাধিকার সার্থক হয়। মণির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। মণি—মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ছোট ছেলে। মণির বড় ভাইয়েরা সরকারী চাকুরে। এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এ আমার মনে আছে। মণি এম. এ. পাস করে চাকরির চেষ্টা না করে সাহিত্যসাধনার বাসনা পোষণ করত। তাকেই কেন্দ্র করে নবেন্দু ঘোষ, শিশির ঘোষ, শিশিরের দাদা, যোগীনবাবুর ছেলে প্রভৃতি একদল বাঙালী তরুণ "প্রভাতী সংঘ" নাম দিয়ে একটি সংঘ স্থাপন করেছিল এবং হাতে লিখে 'প্রভাতী' নামে একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্রে লেখার সাধনা শুরু করেছিল তখন।

এঁরাই এলেন একদিন আলাপ করতে, ওঁদের সংঘে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ

জানাতে। সকলেই প্রায় আমার বড় ছেলের সমবয়সী—দু বছর চার বছরের বড়। লাজুক ছেলের দল, চোখে মুখে স্বপ্নের ছাপ, এবং সংকোচও আছে। সে সংকোচ আমাকে নয়; সংকোচ, প্রতি বাড়িরই অভিভাবকদের কাছে। তাঁরা তো এই সাধনাকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, কারণ সাহিত্যসাধনা যতই ভালো বস্তু হোক, ওটা মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার পক্ষে স্বাস্থ্য নষ্টকারী ডিস্‌পেপসিয়ার মতোই দুরারোগ্য এবং কুটিল ব্যাধি। ধরলে বড় একটা ছাড়ে না এবং চোঁয়াঢেকুর ও অগ্নিমান্দ্যের মতো নিরীহ উপসর্গে শুরু হয়ে বৎসর কয়েকের মধ্যেই যখন পেড়ে ফেলে, তখন আর উপায় থাকে না। সাহিত্যসাধনাকে তাঁরা মানসিক ডিস্‌পেপসিয়া বলেই মনে করতেন।

'প্রভাতী সংঘ' পাটনার বাঙালীসমাজে সত্যকারের সাহিত্যরুচি সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি। মণীন্দ্র শক্তিশালী সম্পাদক ও সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। 'প্রভাতী সংঘে'র নবেন্দু ঘোষ বাংলা-সাহিত্যে শক্তিমান লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিশির ঘোষ আজ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক, বর্তমানে তিনি শুনেছি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের পথে সাধনা করেন, অন্যথায় তিনিও বাংলা-সাহিত্যে সম্পদ যোজনা করতে পারতেন। মণীন্দ্র অকালে মারা গেছেন। মণীন্দ্রের হাতে লেখা 'প্রভাতী' বৎসর কয়েকের জন্যে ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রভাতী' স্বল্পকালের মধ্যেই বিশিষ্ট একটি ছাপ রেখে গেছে। 'প্রভাতী'র দাবিতেই "বনফুলে"র বিখ্যাত উপন্যাস 'রাত্রি' প্রকাশিত হয়েছে। আমার 'কবি' উপন্যাসও 'প্রভাতী'তে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন নবীন লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও 'প্রভাতী'ই হাতে তুলে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেছে।

চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী-গলা মণি সমাদ্দারের মুখে হাসি লেগেই থাকত। তাঁর বাড়িতেই ছিল 'প্রভাতী সংঘে'র স্থায়ী আসর। আর তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমাদের রভীনদা। অকৃতদার রভীনদা নিজের ঘরদোর গোছগাছ করতে এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন পবিত্র রাখতেই সারা জীবন এমনই ব্যস্ত থেকে গেলেন যে, নিজে আর সাহিত্যসাধনার সময় পেলেন না, কিন্তু এই উদারচরিত্র সাহিত্যানুরাগী মানুষটি যেখানেই এবং যার মধ্যেই

সাহিত্য-সাধনার সন্ধান পেয়েছেন, সেইখানেই ও সেই জনকেই অকৃপণ স্নেহে সাহায্যে সমৃদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

উনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যেও হে তারাশঙ্কর, ওদের উৎসাহ দিও। বুঝলে হে, বড় ভালো ছেলে ওরা।

আমি একদিন গেলাম মণির বাড়ি।

গিয়েই মনে হল, এ কোথায় এলাম? এ যে সাধকের সাধনপীঠ! স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মশায়ের লাইব্রেরি-ঘর। রাশি রাশি বই চারদিকে, মাঝখানে এবং আলমারিগুলির ফাঁকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি—সে এক বিচিত্র সংগ্রহশালা! এক জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার!

বুঝলাম, মণির উত্তরাধিকার কিসের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অল্পবয়সে পিতৃহীন ছেলেটি, এই ঘরের চারপাশে ঘুরেছে আর স্বপ্ন দেখেছে। পৈতৃক সাধনার মূল্য উপলব্ধি করেছে দেহের প্রতি রোমকূপে-কূপে, আবেগময় রোমাঞ্চের মধ্যে বুকের মধ্যে বাসনা পোষণ করেছে বাবার আসরে বসবে।

সেদিন মণি আমাকে তার বাবার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'সমসাময়িক ভারতে'র কয়েক খণ্ড উপহার দিয়েছিল। স্বর্গীয় সমাদ্দার মশায়কে প্রণাম জানিয়েই তা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আরও কয়েক দিন গেলাম ওদের আড্ডায়। সকলেই ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, রাশি রাশি ইংরেজী বই পড়েছে। আমি তার কিছুই পড়ি নি। ওরা আলোচনা করত, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে হত, এই পড়ে ইউরোপের সাহিত্য এবং ওই দেশের বিচিত্র জীবনধর্ম সম্পর্কে যা ওরা জেনেছে তাই যদি এ দেশে মানুষের জীবনধর্ম সম্পর্কে সত্য বলে মনে করে, কি প্রয়োগ করে, তবে কিন্তু ভুল হবে।

যেমন মনে হয়েছে, এ কালের দু-একজনের তখনকার লেখা পড়ে। তাঁরা শক্তিমান লেখক। কিন্তু লেখা পড়ে তার মধ্যে এ দেশের জীবনের সন্ধান পাই নি। ভাষা পড়ে তারিফ করতে হয়—যেমন মাজা-ঘষা, তেমনি চোখা, চমৎকার বাংলা। কিন্তু তবু এ কথা অবশ্যই বলব যে, এ ভাষা তো বাঙালীর ভাষা নয়। পাত্র-পাত্রীগুলির দেশী কাপড়জামা বেশভূষা সত্ত্বেও মনে হয় এরা

কারা ? বাঙালী ? ইংরেজ ? মানুষ ? তাই যদি হয়, তবে জীবন কোথায় ? তার স্পর্শ কই ?

যাই হোক, ওরা আমাকে কিছু কিছু বই পড়ালে। তারপর একদিন বললে, ওরা একটি উৎসব-অনুষ্ঠান করবে। 'প্রভাতী সংঘে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমি আছি এখানে, আর ওরা নিমন্ত্রণ করেছে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, বনফুলকে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রডীনদা উৎসাহিত করেছেন। শচীমামা বলেছেন, খুব ভালো, আন, আন। জমিয়ে তোল আসর। আমি সেদিন শচীমামার সান্ধ্যমজলিসে যাওয়ামাত্র বললেন, ওগো ভাগ্নেকে ভালো করে খেতে দাও। ওকে সারিয়ে তোল। এবার আসরে গাওনা গাইতে হবে। গায়ে জোর না হলে গাইবে কি করে ?

প্রভাতী সংঘের এই অধিবেশনের কথার আগে এক বেহারী ভদ্রলোকের কথা বলব।

পাটনাতে শচীমামার ওখানেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনিই বাঙালীর সম্পর্কে আমার কাছে কঠিন অভিযোগ করেছিলেন। ওই শচীমামার ওখানেই তিনি আসতেন। শচীমামার উদার প্রসন্ন সাহচর্য শুধু বাঙালীকেই মুগ্ধ করে নি ও-দেশের গুণীজনদেরও মুগ্ধ করেছিল।

ভদ্রলোকটি নাম ছিল খুব সম্ভব অম্বিকাপ্রসাদ। রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রবল। ইংরিজী পড়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু কতদূর তার পরিচয় দেওয়া আমার মতো স্বল্প-ইংরিজী-জানা লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং পড়াশুনার ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। অম্বিকাপ্রসাদ জীবিত নেই। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পূর্বেই বা পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দু বছর আগে কলকাতায় প্রান্তীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে পাটনার খ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রসিদ্ধ হিন্দী-সাহিত্যসেবী বেণীপুরীজী তাঁর সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন, অম্বিকাপ্রসাদের অভাবে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তখন কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই অম্বিকাপ্রসাদকে ভালো চক্ষে দেখতেন না। শচীমামার কথা ছাড়া অবশ্য। অম্বিকাপ্রসাদকে বাঙালী-বিদ্বেষী বলতেন

অনেকে। অম্বিকাপ্রসাদ একদিন আমাকে আমার 'জলসাঘর' গল্পসংগ্রহখানি এনে বললেন, এ শব্দটা কেন আপনি প্রয়োগ করেছেন তারাশঙ্করবাবু ?

শব্দটি 'খোট্টা' শব্দ। "টহলদার" গল্পে এক জায়গায় ছিল, "বাবুদের খোট্টা চাপরাশীটা ভোরের আমেজে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।" অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, কথাটার অর্থ কি বলুন তো ?

চমৎকার বাংলা বলতেন। তেমনি বুঝতেন। তাঁর কথায় প্রশ্নটা প্রথম মনে জাগল, তাই তো, অর্থ কি ? ঠিক অর্থ বুঝে তো লিখি নি। দেশপ্রচলিত শব্দ। আমাদেব রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলে হিন্দীভাষী লোকেদের 'খোট্টা' বলে থাকে। শব্দটার অর্থ কি, কি হিসেবে ব্যবহার করে, তা সত্যিই ভাবি নি। আমাদের দেশে এই রকম কয়েকটা কথাই আছে। একটা 'ভোজপুরে'। 'ভোজপুরে' শব্দটার অর্থ স্পষ্ট—ভোজপুবেব অধিবাসী। কিন্তু ব্যবহার করি যখন, তখন মনে ভাসে একটা বলশালী দুর্দান্ত জোয়ান—যে হয় লাঠি না হয় কুস্তিগীরের কাজ করে। 'খোট্টা' শব্দটার অর্থ বা ব্যঞ্জনা আরও নীচুস্তরের। কাঠখোট্টা আমরা তাদেরই বলি, যারা কাঠের মত নীরস কিন্তু নীরস তরুবর নয়, গড়া-পেটা মুগুবও নয়, সাদা কথায় খেঁটে। অর্থাৎ একেবারে অসংস্কৃত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যা দিয়ে আঘাতই করা যায়। সেই অর্থে খোট্টা শব্দের অর্থটা দাঁড়ায়—বর্বর, হৃদয়হীন বা নিষ্ঠুর।

কথাটা নিয়ে খানিকটা তর্ক উঠেছিল, কিন্তু আমিই সে দিন প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে বলেছিলাম, প্রচলিত শব্দ বলে না বুঝেই ওটা আমি প্রয়োগ করেছি। পরে ওটা সংশোধন করে দেব।

অম্বিকাপ্রসাদ বলেছিলেন, তারাশঙ্করবাবু, বাঙালী সাহিত্যিকরা সকল দেশ থেকে এগিয়ে আছেন আজ। তাঁদের খুব সাবধান হতে হবে। এগিয়ে আছেন তাঁরা ইংরিজীর জোরে। এই ইংরিজীর জোরেই তাঁরা সব প্রভিন্সে গিয়ে মাতব্বরি করেছেন ; সেখানে তাঁরা অনেক কিছু করেছেন—সে অবশ্যই বলব। কিন্তু তাঁরা সব প্রভিন্সের লোকদের এত ছোট নজরে দেখেছেন, এত অবজ্ঞা ঘৃণা করেছেন যে, সবার অন্তরেই দগদগে ক্ষত হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, ইংরিজীনবিশ বাঙালী বাংলা দেশের দেহাতী বাঙালীকেও

ঠিক এমনি আঘাতই দিয়েছে। ইংরেজ থাকবে না তারাশঙ্করবাবু। তাকে যেতে হবে। সে যেদিন যাবে, সেদিন এদের বিপদ ঘটবে। তার সঙ্গে ইংরিজী ভঙ্গির এবং ভাবনার সাহিত্যেরও বিপদ আসবে।

তখন বেশি কেউ ছিল না আড্ডায়। সময়টা দুপুরবেলা। সেদিন শচীমামার ওখানেই নিমন্ত্রণ খেয়েছি। অম্বিকাপ্রসাদও নিমন্ত্রিত ছিলেন। শচীমামার বাড়িতে এসেছেন শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর ছোট বোন—শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী, বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সতী দেবীর মা। এককালে শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবীর স্বামী পাটনায় ওকালতি করতেন। পাটনার বাঙালী-সমাজে এবং কিছু বাংলা-জানা বেহারী-সমাজে তাঁর একটি পরম প্রীতির স্থান ছিল। অম্বিকাপ্রসাদ ছিলেন সেই প্রীতি-মুগ্ধদের একজন। দুপুরে খাওয়ার পর বাইরের ঘরে অম্বিকাপ্রসাদ কথাগুলি বললেন। শচীমামা শুনছিলেন।

আমি বলেছিলাম, অম্বিকাবাবু, কথাগুলির মধ্যে সাবধান-বাণী যা উচ্চারণ করলেন তা আমার মনে থাকবে। কিন্তু ইংরিজীনবিশদের কথা এবং ইংরিজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সাহিত্যের কথা যা বললেন তার সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। কারণ ইংরেজ গেলেও ইংরিজী যেতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে এ দেশের লোককে সম্বন্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়া ইংরিজী শিক্ষা ও সভ্যতার মারফত যে বিজ্ঞানবাদ ও বোধ এসেছে তাকে দূর করে কার সাধ্য?

অট্টহাসি হেসেছিলেন অম্বিকাপ্রসাদ।

এই দেশের কোটি কোটি লোক, যারা মাটির মানুষ, তারা এই ইংরিজী চাল আর চালিয়াতিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। তারা নিজের বুকের ভাষা আর ভাবকে গঙ্গার ধারার মতো ঢেলে দেবে। বস্তুবিজ্ঞান দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তার ভয়ই বা তারা কেন করবে? তাকে তারা নেবে। আপনার মতো করে নেবে। দেখে নেবেন। তারাশঙ্করবাবু, এ দেশে তুলসীদাসজীর 'রামচরিত-মানস'ই এ দেশের লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনার দেশে কৃত্তিবাস কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত কত চলে খোঁজ নেবেন। আপনি বা আপনারা তার কাছে মক্ষি।

পরের দিন, বোধ করি কি দু-একদিন পর অম্বিকাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের একখানি বই হাতে করে এলেন। সে দিনও অপরাহ্নবেলা। শচীমামা বাগানে কিছু

করছিলেন। আমি একা বসেছিলাম। আমার হাতে বইখানি দিয়ে তিনি বললেন, পড়ুন। এই শেষটা পড়ুন। দাগ দেওয়া আছে।

পড়লাম—"ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, 'পিতামহ আমাদের মন্ত্র দাও'।"

পাটনার কথায় অম্বিকাপ্রসাদকে মনে পড়ে গেল। তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেছে।

পর পর কয়েক বৎসর পাটনায় গিয়েছি। তিন বৎসর তাঁকে দেখেছিলাম।

অম্বিকাপ্রসাদের কথা এইখানে থাক।

এর আগে মণি-মণ্ডলের 'প্রভাতী সংঘে'র উদ্যোগে সাহিত্য-সভার আয়োজনের কথা বলেছি। যে বৎসর আমি সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে প্রথম গেলাম, সেই বৎসরই এর শুরু হল। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সভাপতি হিসেবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওখানে ছিলাম। আর নিমন্ত্রিত হলেন ভাগলপুরের বনফুল, মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুবাবু। বাঙালী-সমাজে বেশ সাড়া পড়ে গেল।

পাটনায় আরও একটি সাহিত্যিক-সংঘ ছিল। তাঁরা ছিলেন একটু অভিজাত-শ্রেণীর। একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। এবং সে আলোচনার আসরও ছিল অতি অল্প কিছু লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তাঁদের দু-একজন আমার মামার বাড়ির সম্পর্কে আত্মীয় হলেও তাঁরা এগিয়ে আসেন নি। আলাপও হয় নি। পরে হলেও সেকালে হয় নি।

সজনীকান্ত, বনফুল এসে উঠলেন মণি সমাদ্দারের ওখানে। স্বর্গত যোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘরে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল। মনে পড়ছে, বনফুল এরই মধ্যে অর্থাৎ আমি তাঁর ওখান থেকে পাটনা আসার পর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই একখানি উপন্যাস—তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' লিখে শেষ করেছিলেন। সকালবেলায় গেলাম, বনফুল পড়া শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস, তার উপর সুস্থ সবলদেহ বলাইচাঁদ। সতেজকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে পড়ে গেলেন।

'তৃণখণ্ড' কেমন বই, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সেদিন লেগেছিল অপূর্ব। কাব্যে এবং গদ্যে রচনার টেকনিক তাঁর সেই প্রথম। পরে তিনি আরও লিখেছেন। এর সঙ্গে নাটকীয় টেকনিক মিশিয়ে 'মৃগয়া' লিখেছেন। টেকনিকের দিক দিয়ে মধুদাদার অক্ষয় ভাণ্ডের অধিকারী তিনি। সেই দিন তার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমরা যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। বনফুলের ভিতরের কবি-সাহিত্যিক সেই দিনই যেন বলেছিল, ওই মানসীর হাতছানিতেই আমার জীবনতরী চলবে, ভাসবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাইরেটা নিতান্তই খোলস।

বই শেষ হতে বাজল দুটো।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমন সময় খবর এল, যে বেহার ন্যাশনাল কলেজ হলে সম্মেলন হওয়ার কথা, সেখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পাঠিয়েছেন— তারাশঙ্করবাবু রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকে কলেজ-হলে বক্তৃতা করতে দিলে কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে; সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া হোক অথবা আই. বি. পুলিসের কাছে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হোক।

সজনীকান্ত, বনফুল, শরদিন্দু বললেন, তারাশঙ্করকে যোগ দিতে না দিলে আমরা যোগ দিতে পারি না।

মণি সমাদ্দারের দলটি ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি হবে?

রঙীনদা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, এ হতে পারে না। প্রিন্‌সিপ্যালের কাছে কেউ গিয়ে নানা ভুয়ো সংবাদ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এবং কে করেছে সে আমি জানি।

টেবিলটার ওপর তিনি প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

বেশ গরম হয়ে উঠল বাঙালী-সমাজ। বিপদে পড়ল তরুণ ছেলে কয়টি। আমি নিজে হলাম বিব্রত। আমার বড়মামার রাগ সবচেয়ে বেশি। ওই শচীমামাই তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ নিয়ে এত রাগারাগি কর কেন? হৈ-চৈ কেন? চল, আমরা কজন যাই প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি!

আসল প্রিন্‌সিপ্যাল স্বর্গীয় ললিতবাবু তখন অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁর জায়গায়

কাজ চালাচ্ছেন ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল জনাব মৈনুদ্দিন সাহেব। ললিতবাবু, যতদূর মনে পড়ে, শচীমামাদেরও শিক্ষক ছিলেন। শচীমামা ও আর দু-তিন জন গেলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব গণ্ডগোল মিটিয়ে ফিরে এলেন। সেই স্বকীয় ভঙ্গিতে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, এইবার কি বলে—আসর পাত। শুরু করে দাও গাওনা!

গাওনাই বটে। সে এক জমজমাট আসর। আজ যত দূর মনে হচ্ছে, তাতে হলখানা ছিল মস্ত বড় এবং ঘরখানার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লোকে ঠাসা। লোকগুলি প্রবাসী-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ছাত্র-সমাজের ভালো ছেলের দল। সত্যিকাবের তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে বলাটা বাহুল্য হবে না যে, লোকের কাছে সেদিন সবচেয়ে বড় ঔৎসুক্য ছিল সজনীকান্ত সম্পর্কেই। 'শনিবারের চিঠি'র তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তখন আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্র প্রায় ছিন্নভিন্ন, তিনি তখন সপ্তযুদ্ধজয়ী বীরের মতোই গৌরবান্বিত। তখন 'কল্লোলে' শুরু আধুনিক সাহিত্যের অভিযান প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' 'ধূপছায়া' উঠে গেছে; এমন কি শনিবারে বের-হওয়া চিঠির প্রসার রুখতে রবিবারে যে লাঠি বেরিয়েছিল সে লাঠিতে ঘুণ ধরে ভেঙে গেছে। ওই সময়ের লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং প্রবোধ সান্যাল ছাড়া সকলেই যেন সাময়িকভাবে কলম থামিয়েছেন। সজনীকান্ত তখন সম্মুখবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পিছনের রথীদের আক্রমণোদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

সত্যিকথা বলতে কি, লোকে দুঃখও অনুভব করে, আবার 'শনিবারের চিঠি'র মারের চাতুর্য দেখে তারিফ করে না হেসেও থাকতে পারে না। সেই সজনীকান্ত কি বলবেন! এক দল তাঁকে বলে—কালাপাহাড়, সব ভেঙে-চুরে দিলে, বিগ্রহ-গুলোর নাক কেটে বিকৃত করে ফেললে। বলে অবশ্য গোপনে। তবে মারের তারিফ করে। হ্যাঁ, মার বটে!

আর এক দল বলেন—হ্যাঁ, বলশালী সংস্কারক বটে।

যাই হোক, সে দিন সজনীকান্তের বক্তব্য শুনতে লোক ভিড় করে এসেছিল; প্রবীণ মথুরবাবু থেকে মণি-দলের পরের দল পর্যন্ত।

সজনীকান্ত আধুনিক-সাহিত্যকে গাল দিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সুকঠোর মন্তব্য

করে বসলেন। তাঁর সেই সময়ের লেখা 'পথের দাবি,' 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি ওই ধরনের লেখাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—পল্লীসমাজের দাদাঠাকুর মুদির দোকানে বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে পল্লীজীবনের গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু যেই তিনি থেলো হুঁকা ছাড়িয়া ও মুদির দোকান ফেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে সোফা-সেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন অমনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, নাজেহাল হইয়াছেন, গল্প অল্প না হইয়াও মাঠে মারা গিয়াছে।

কথাগুলি ঠিক এই কথাই নয়, আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিলাম। স্মৃতির উপর বিশ্বাস আছে।

সজনীকান্তের এই উক্তির সঙ্গে সে কি হাততালি! ঘরখানা যেন ফেটে পড়েছিল। আশ্চর্যের কথা, কেউ তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। উল্লসিতই দেখেছিলাম সকলকে। আমি সে দিন একটি ছোট লেখা পড়েছিলাম। লেখাটির উল্লেখযোগ্যতা কিছুই ছিল না। তখন প্রবন্ধ বা অভিভাষণ জাতীয় কিছু লিখতে হলে বিব্রত হতাম। কেন না, সেকালে ইংরিজী কোটেশন কিছু না থাকলে এবং মতামত ইংরিজী-সমালোচনা-সাহিত্য-সম্মত না হলে সেটা গ্রাহ্যই হত না। লেখাটি বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

আমি কিন্তু একটু আঘাত পেয়েছিলাম সজনীকান্তের এই উক্তিতে। বিষণ্ণ হয়েছিলাম। পরের দিন আসর মাত করলেন বনফুল ও শরদিন্দু। বনফুল হাসির কবিতা পড়ে হাসির হুল্লোড় বইয়ে দিলেন, শরদিন্দু পড়লেন 'তিমিঙ্গিল' নামক হাসির গল্প। আমি পড়েছিলাম 'জলসাঘর' গল্প। লোকে জুতো ঘষতে লাগল। আমার বড়মামা রেগে আগুন। আমি কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে ঢাকা পড়ে জুতো-ঘষার আওয়াজ পাই নি। শেষ পর্যন্ত পড়ে তবে ছেড়েছিলাম।

পাটনাতে এই বছরেই কিছুদিন পর এলেন বাংলা-সাহিত্যের রসিক-চূড়ামণি "পরশুরাম"—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মশায়। এবং ঠিক তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন 'অমৃতবাজারে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ।

পরশুরামকে দেখবার পরম আগ্রহ ছিল। না জানি, এই লোকটি কি বিচিত্র ঢঙে কথা বলবেন! হয়তো বা কথায় কথায় হাসির তুফান উঠবে! আমার

তখন শরীরের যে অবস্থা তাতে হয়তো জিজ্ঞাসা করেই বসবেন, কৌন বা? কারিয়া পিরেত?

শরীর দেখে অসুখের কথা উঠলে হয়তো বলবেন, এই উপসর্গ হয়?

হয়তো সে উপসর্গ নেই--সে কথা বললে বলে বসবেন, হয়, জানতি পার না।

হয়তো বা 'কচিসংসদে'র উত্তরখণ্ডে কোনো ডিস্‌পেপসিয়াগ্রস্ত গাল্পিকের চরিত্রই দেখতে পাব। নানা শঙ্কায় শঙ্কিত আগ্রহ নিয়েই দেখতে গেলাম। রতীনদা তাঁর সম্মানে বি. এন. কলেজের মাঠে একটা চায়ের মজলিসের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে তিনি আমাকে একেবারে রাজশেখরবাবুর টেবিলেই সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

ইনিই পরশুরাম? 'গড্ডলিকা'-'কজ্জলী'র স্রষ্টা রসসাগর ব্যক্তিটি!

শান্ত স্নিগ্ধ স্বল্প এবং মৃদুভাষী প্রসন্ন একটি মানুষ; স্থির ধীর। এমন মানুষের কাছে গেলে মনটি জুড়িয়ে যায়; পবিত্র হয়; জীবনে গভীরতার সন্ধান পায়। বুঝলাম, হাস্যরসের সৃষ্টি এঁর খেলা। আসলে গভীর ভাবের ভাবুক। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার মতো খেলা করেন।

শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবু প্রথম জীবনে বা কৈশোরে পাটনার ওদিকে ছিলেন। পাটনা কলেজে কিছুদিন পড়েও ছিলেন। তাঁর মা বলতে গেলে দানাপুরের মেয়ে; তাঁর বাবা দানাপুরের সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। শ্রীযুক্ত বসুর মায়ের বয়স যখন মাসখানেক কি মাস দুয়েক তখনই হয় মিউটিনি। দিদিমার কাছে মিউটিনির অনেক গল্প তাঁরা শুনেছেন। 'যুগান্তরে' বর্তমানে তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু তার অনেক কাহিনী লিখেছেন।

সেবার পাটনা কলেজে ছেলেরা তাঁকে একটি অভিনন্দন দিয়েছিল। স্বল্প কথায় একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন লেখার কথা আলাদা, কিন্তু বক্তৃতা দিতে তিনি ঠিক পারেন না। সেই সভায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঘোষ মশায় চতুর বক্তা। কি যেন একটি সরস গল্প বলে বক্তৃতা শেষ করে আসরটা খুব জমিয়ে দিলেন।

পাটনায় আর একজন বড়মানুষকে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্যও হয়েছিল—শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশ মশায়।

শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশ মহাশয় সেকালে পাটনার সাধারণ বাঙালী-বেহারী সমাজে গল্পের মানুষ ছিলেন। আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর যোগ্যতা, তাঁর দানশীলতা, তাঁর বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগ, তাঁর উপার্জন—সবই ছিল বিস্ময়কব। তাঁর যুক্তি-তর্কে সওয়ালে-জবাবে দিনকে রাত্রি করতে চাইলে তাই হয়, রাত্রিকে দিন বলে প্রমাণ করতে উঠলে কোন প্রতিপক্ষই রাত্রিকে রাত্রি বলে কায়েম করতে পারেন না। তিনি উপার্জন করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাঁর দান এমনি, খবচ এমনি যে, মধ্যে মধ্যে বা মাসেব শেষে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েন। সকালে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে খোল-করতালের বাজনা শোনা যায়, কীর্তনগান শোনা যায়—কীর্তনগান শুনতে শুনতে দাশমহাশয় বিভোর হয়ে যান। আবার বিকেলবেলা বাড়ির সামনে যখন টেনিসের আসর পড়ে, তখন দাশমশায় আর-এক মানুষ;—নিজে খেলেন না, কিন্তু বেতের চেয়ারে বসে খেলা দেখেন, প্রতিটি মারের সমালোচনা করেন। খেলে ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা, বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়েরা। খেলার মাঠের সঙ্গে সংস্রব আমি তখন অনেক দিন ছেড়েছি। প্রতিজ্ঞা করে ছেড়েছি। ও-পথ হাঁটি না। এবং পথ-হাঁটা ছাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ও-দিকের খবর রাখাও ছেড়েছি। সে সেই মোহনবাগান-কুমোরটুলির মধ্যে সেমিফাইনালে মোহন-বাগানের এক গোলে হারের খেলার পর। সে যে কি দুর্ভোগ আর আমাদের নিজেদের দীনতার কি পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তা আজও মনে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পায়। সে যে কি হাস্যকর ঘটনা, সে আর কি বলব! বর্ণনা করে বোধ হয় সে দৃশ্য পাঠক-মানসে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে তাব সম্পর্ক অবশ্য অতি ক্ষীণ। তবে তারই ফলে আজও মাঠের সামনে খেলার সময় খেলাফেরত কর্দমাক্ত ছিন্নবস্ত্র উন্মত্তপ্রায় লোকগুলিকে যখন বাড়ি ফিরতে দেখি, তখন লজ্জা অনুভব করি, বেদনাও পাই। একবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার শেষে ট্রামে যে কদর্যতা দেখেছি, তার নমুনা আমার খাতায় লেখা আছে। এই নিয়ে একটি গল্পও লিখেছিলাম সেবার। সে কি মুখভঙ্গি করে পরস্পরকে ভ্যাংচানো, কি ইঙ্গিত, কি গালাগাল! সে সব সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায় না। তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে এমন বোলচালও শোনা যায় যে, তারিফ না করে পারা যায় না। সব ভুলে হাসতেই হবে সেই মুহূর্তে। ছুটো

কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। কোন দলের জানি না, খেলোয়াড়েরা বল প্রতিপক্ষের গোলের কাছে নিয়ে গিয়েও গোল করতে পারে নি, বলটা গোলের সামনে গিয়ে গড়িয়ে চলে গেছে সীমানার বাইরে, কেউ ছুটে এসে ধরে নি বলটা, গোল লক্ষ্য করে মারে নি, বিবরণটা এই। এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে বক্তা বলে উঠল, আর বাবা, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে দিলাম, ওরে, যা যা যা। তা নড়ল না একপা! কপাল চাপড়ে তারপরই বললে, তখন কি জানি মাইরি, ও জা নয়, ননদ। রাধা নয়, কুটিলে।

কথা অসংলগ্ন তবুও প্যাঁচ আছে বইকি।

আর-একবার এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বলছে, ক্যায়সা হয়েছে! একেবারে দই বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল, ঘাঁটালের দই বাবা। ঘাঁটিয়ে ঘোল করো না। খাওয়া যাবে না, মাথা চেঁচে মাথায় ঢালতে হবে!

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে খেলার কথা এসে পড়েছে। তবুও কিছু না বলে থামতে পারছি না। 'কল্লোল-যুগে' বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত খেলার কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, মোহনবাগান তখনকার দিনে গোরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে খেলার মাঠে বাঙালীর জাতীয় চেতনার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মোহনবাগানের জিত হলে বাঙালী জাত ভাবত, এ তার জাতীয় জয়।

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। খেলার মাঠেই যেন জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ভবিষ্যৎ একেবারে ভবিষ্যৎচিত্রের মতো ফুটে উঠেছিল। মহমেডান স্পোর্টিং-এর আবির্ভাব, তার কয়েক বছরের দুর্দান্ত খেলা, মুসলিম দর্শকদের সম্প্রদায়গত উল্লাস—ছেচল্লিশের দাঙ্গার এবং বঙ্গদেশ-খণ্ডনের পূর্বচিত্র। শুনেছি, সেকালে ওদের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের কোনো শটের বা কোনো পাসের প্রশংসা করে কোন হিন্দু যদি বলত—ওয়াণ্ডারফুল খেলছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে তার মাথায় চাঁটি পড়ে যেত এক সঙ্গে দু-তিনটে কি তারও বেশি। এবং ঘাড় ফেরালে সে দেখতে পেত, কয়েকটি দাড়িশোভিত মুখমণ্ডল দন্তবিকাশ করে তার দিকে চেয়ে আছে আর বলছে, আরে রসিদ খেলবে না তো তোর বাপ খেলবে! এখন বাংলা ভাগ হয়ে ওদের খেলাও পড়েছে, তার দম্ভও নেই, এমন কি জিতলেও নেই। কিন্তু এখন বাঙালী দলের মধ্যে, বিশেষ করে সমর্থকদের

মধ্যে, যে কদর্য কলহদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তাতেই এখন আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে বেরুচ্ছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে ঝগড়া ক্রমবর্ধমান। ওটার মধ্যে কোন ইঙ্গিত আছে কি না বিশেষজ্ঞরা বলবেন। থাক। এবার মোহনবাগান-কুমোরটুলির সেই স্মরণীয় খেলার কথা বলি।

তখন আমি শ্বশুরকুলের কলকাতার কয়লা-আপিসে কাজ শিখি। ওঁরা পাকড়ে এনে কাজে লাগিয়েছেন—কাজের মানুষ তৈরি হচ্ছে! রীতিমত কোট পেণ্টালুন টাই পরি, মাথায় হ্যাট পরি। দুর্ভাগ্যের কথা, সে অপরূপ বেশের ছবি নেই। বেড়াল-বাচ্চার চোখ ফোটানো পদ্ধতিতে কয়েক মাসে কয়লা, হার্ডওয়ার—দুটো ডিপার্টমেণ্টের চার-পাঁচটা ব্রাঞ্চ ঘুরিয়ে এক অভিনব ডিপার্ট-মেণ্টে দিয়েছেন। কোম্পানির নাম—এন, মিটার অ্যাণ্ড কোম্পানি। লিমি-টেড অবশ্যই। এন, মিটার কলকাতার কোন প্রাচীন মিত্র-বংশের সন্তান, এখানে লেখাপড়ায় কি অসুবিধে হয়েছিল বলতে পারি না, ফার্স্ট ক্লাসে বা ফার্স্ট আর্টস অর্থাৎ আই. এ. পড়তে পড়তে বিলেত চলে যান। যে ভাবে বাঙালীর ছেলেরা পালিয়ে বিলেত যায়, সেই ভাবেই যান এবং বছর আট-দশ সেখানে থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এক বেলজিয়ান পত্নীসহ কলকাতায় ফেরেন। এ দেশে তখন নিজের গণ্ডিতে নেটিভ স্টেট্‌সের প্রতাপ এবং প্রমোদ-স্পৃহা পুরোদমে বজায় আছে। মিত্রমশায় সন্ধান করে গোয়ালিয়রের মহারাজার এক প্রমোদতরণী—হাউসবোট তৈরির কন্‌ট্রাক্ট সংগ্রহ করে ফেললেন। বিশ হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট। খরচ খুব জোর বারো হাজার। মাস কয়েকের মধ্যে আট হাজার মুনাফা। এই টোপ নিয়ে লালবাজার অঞ্চলে তিনি ঘুরছিলেন। সেই টোপ গিললেন আমার শ্বশুরকুল। সায়েব-মিত্তির বেলজিয়ান পত্নীসহ গেলেন গোয়ালিয়রে, সঙ্গে চীনে মিস্ত্রী কাঠ বোল্ট নাট প্রভৃতি। এখানে রইল হেড অফিস। এখানে তিনি তাঁর তরফে বসিয়ে গেলেন তাঁর এক ভাইকে, এবং আমাকে বসালেন আর-এক পক্ষ। মিত্তির সাহেবের ভাইয়ের নাম বোধ হয় ডি. এন. মিটার। একখানি খাঁটি কলকাতার ছেলে। কথা-বার্তায়, চালে-চলনে, ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরায় শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার মতো কলকাতার মহিমা ঘোষণা করেন। তবে এটা ঠিক যে, দর্জিপাড়ার দাদার মতো

অবজ্ঞা ছিল না। কথাবার্তা শোনবার মতো। তুবড়ির মতো ফুলঝুরি ফোটাতে পারতেন ভদ্রলোক। দুনিয়ায় জীবনটাকে সাবানের মতো ঘষে ফেনায় পরিণত করে রঙিন ফানুসের মতো উড়িয়ে উড়িয়ে শেষ করে দেওয়ার আইডিয়া ছিল তাঁর। কথায় কথায় বলতেন—দি আইডিয়া! কলকাতার কত গল্প যে করতেন! কাজ আমাদের খুব কম ছিল। গোয়ালিয়রের দু-তিনখানা চিঠির জবাব আর বরাত থাকলে জিনিস কিনে পাঠানো। বাকি অধিকাংশ সময়টাই ওই বাক্‌চাতুর্য এবং গল্প চলত। আমার সাহিত্যপ্রীতির কথা জেনে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, মাই গুড লাক্! বলেন কি? আমি নিজে অথর। ড্রামাটিস্ট। মিলবে ভালো! ট্রা লা ট্রা লা।

এই ধরনের মানুষ। তাঁর 'মৎকরাক্কা' বলে একখানি প্রহসন আমাকে দিয়েছিলেন। তার বাক্‌ভঙ্গি ভালো লেগেছিল। সত্যিই ভালো ছিল।

তিনটে সাড়ে-তিনটে বাজতেই মিত্তির আমাকে টেনে নিয়ে চলতেন খেলার মাঠে।

মোহনবাগান সেবার ফার্স্ট বা সেকেণ্ড রাউণ্ডে দুর্ধর্ষ ডি. সি. এল. আই. কে বেকুব বানিয়ে হারিয়ে দিলে। খেলার শেষে মিত্তির ফেল্টহ্যাটখানা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বিচিত্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অভ্যাস-করা সুকৌশলে মাথায় পরে নিয়ে বললেন, ইন দিস ওয়ে, ব্যানার্জি, জাস্ট ইন দিস ওয়ে, মোহনবাগান উইল উইন দ্য শিল্ড্ দিস ইয়ার।

'ইয়ার'টা অবশ্য 'ইয়া' বলেই শেষ করলেন।

এই এঁর সঙ্গে সেদিন একটার সময় গেলাম ক্যালকাটা মাঠে—মাঠের ধারে চেয়ারের টিকিট কিনে বাক্স চারেক সিগারেট পকেটে নিয়ে বসলাম। তার তিন দিন আগে আপিস থেকে মিত্তির সে আমলের অয়েলস্কিনের ওয়াটারপ্রুফ আদায় করেছেন, সেইটে তাঁর কাঁধে, আমার কাঁধেও একটা। সিগারেট ফুঁকি, মিত্তির গল্প করে যান, সময় চলে যায় হাওয়ায় উড়ে। তিনটে নাগাদ এল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! আমি বললাম, ওরে বাপ, এ যে মুষলধারে নামল!

মিত্তির বললেন, লাইক ক্যাট্‌স্ অ্যাণ্ড ডগ্‌স্, আঁ! পকেটে পুরুন।

ভিজে একেবারে চুপসে গেলাম। শুকনো খটখটে মাঠ জলে ভরে গেল।

এরই মধ্যেও লোকের চাপ বাড়তে শুরু করল। সাড়ে চারটে নাগাদ অবস্থা হল, দুই বাঁধের মাপের মধ্যে কানায় কানায় ভর্তি জলের আবর্তের মতো। সে জল মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে। ওদিকে গ্যালারির সামনে গ্রাউণ্ড ঘেরা দড়ির সীমারেখা। অবস্থা দেখে বাঁধ রক্ষা করতে সারি সারি পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাটন হাতে। পিছনের গ্যালারির ওপর থেকে গ্রাউণ্ডের ধার পর্যন্ত সকলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। পিছন থেকে চাপ আসছে সামনের দিকে—সামনের উদ্যত-ব্যাটন পুলিসের ঠেকায় ধাক্কা খেয়ে সামনের মানুষ দিচ্ছে পেছনে ঠ্যালা। মানুষ পড়ে যাচ্ছে, পাশের মানুষের জামা আঁকড়ে ধরছে—সে ছিঁড়ুক আর থাক, যাই হোক, তাকে বাঁচতে হবে। মাঠের মাটির ওপর গোড়ালি-ঢাকা জল পায়ে পায়ে তলতলে কাদায় পরিণত হয়েছে, ছিটে লেগে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করেছে, মুখে কাদা লাগছে, চোখে কপালে লাগছে, পা পিছলোচ্ছে। শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। সমগ্র জনতা চাপবন্দী হয়ে একবার সামনে, একবার পিছনে অহরহ যেন টলমল করছে। আজও মনে করতে পারি যে, সেদিন মনে হয়েছিল, বোধ করি পড়ে গিয়ে মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে যাব অথবা দম বন্ধ হয়ে যাবে। মিত্তির আমার পাশে, তার টুপিটা কোথায় চলে গেছে, টাইটা বেচারা নিজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে খুলে ফেলেছে। অয়েলস্কিনের ওয়াটারপ্রুফটা কাদায় ভরে গেছে, ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে, লম্বা ভিজে চুলগুলো চোখে নাকে এসে পড়ে আছে—সে হাঁপাচ্ছে। আমিও তাই। তবে আমি এতখানি অধীর হই নি। মিত্তির অধীর হয়ে গেছে—তারই বুকে একটা হাত রেখে সামনে পুলিশ ঠেলছে। সে হঠাৎ বলে উঠল সেই পুলিশ কন্স্টেবলটিকে, একেবারে খাঁটি মাতৃভাষায় সরল সহজ অকৃত্রিম ভঙ্গিতে, বাবা, দয়া করে এখান থেকে বার করে দাও বাবা।

সে লোকটা ভেঙিয়ে ভাঙা বাংলায় বলে উঠলো, হ্যাঁ, আভি বলছে বা-বা, দয়া কর্কে হিঁয়াসে বাহার করে দাও বাবা! ঘুষথা কাহে? আঁ? হাম বোলা ঘুষনে লিয়ে? বাহার করকে দাও বাবা! হটো—হটো—পিছু হটো। চলো।

মিত্তিরের পিছনে কেউ পড়ে যাচ্ছিল, সে তার জামার কলার ধরলে চেপে। মিত্তির এবার পড়ল, তার সঙ্গে আমিও পড়লাম। পুলিশ মারলে ব্যাটন।

তারপর খেলা শুরু হতে জনতা একটু স্থির হল। আমার পাশেই উত্তর দিকের গোলপোস্ট, পাঁচ হাত তফাত। সেকেণ্ড হাফে মোহনবাগান ও-দিকে খেলছে। একটা বল এসে ধপ করে পড়ে কাদায় বসে গেল এইট্টিন ইয়ার্ডের লাইনের উপর। কুমোরটুলির খেলোয়াড়েরা অন্তত বিশ-পঁচিশ গজ দূরে। মোহনবাগানের গোষ্ঠ পাল ছুটলেন মারবার জন্যে। পা তুললেন, পড়লেন, পিছলে চলে গেলেন গজ দশেক, তারপর ছুটলেন পরামানিক। তিনিও পা তুলতে গিয়ে পড়ে ঠিক এমনি ভাবে চলে গেলেন গজ পনের। গোল-কিপার ছুটলেন, কিন্তু বলের কাছে পৌছুবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়লেন। গজ বিশেক দূরে ছিল হুইটলে—কুমোরটুলির সেণ্টার ফরোয়ার্ড। সে এবার বেড়াতে বেড়াতে বেড়াতে এল, টুপ করে মারলে, বলটাও এসে জালে পড়ল—কাতলা মাছের মতো। বাস, দেহের নির্যাতনের ওপরে মনের উৎসাহ-আশার মস্তকে একখানি ছিন্ন পাদুকার চাঁটি। আমাদের দেশের একটা প্রচলিত কথা মনে পড়ছে—মারকে মার তার উপর পাঁচ সিকে জরিমানা। খেলার মাঠ থেকে বেড়িয়ে মিত্তির কান মলেছিলেন, সত্যি সত্যি, আর যদি খেলা দেখতে আসি তো—

আমি কান মলি নি, তবে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, খেলা আর দেখব না। সে সঙ্কল্প রক্ষা করেই এসেছি। বোধ করি সমগ্র সাহিত্যিক-জীবনে দিন চার-পাঁচ পাল্লায় পড়ে গেছি। এর মধ্যে একদিনের কথা মনে আছে, শ্রীযুক্ত নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই বোধ হয় শুনেছিলাম যে, শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর দেশে ফিরেছেন, তিনি মাঠে আসবেন। সেদিন গিয়েছিলাম সৌম্যেনবাবুকে দূর থেকে দেখতে।

আর একদিন শৈলজানন্দের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

আর একদিন, এই সেদিন ১৯৫০।৫১ সনে কমনওয়েলথ ক্রিকেট টীমের সঙ্গে ভারতীয় টীমের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। ক্রিকেট ম্যাচ দেখা সেই প্রথম, সেই শেষ।

নিজে এককালে উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল হকি খেলেছি। টেনিসও খেলতে চেষ্টা করেছি। ব্যাডমিণ্টন ভালো খেলেছি। ফুটবল খেলার ঝোঁকের

জন্যে ইস্কুল-জীবনে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়েছি। আমাদের ওখানকার কীর্ণাহার ফুটবল টীমকে ম্যাচ খেলায় নেমন্তন্ন করে ভালো করে খাওয়াতে পারি নি বলে তারা না খেলে চলে গিয়ে আমার নামে আমাদের হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছিল। হেডমাস্টার-মশায় জরিমানা করেছিলেন, তাঁকে না জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে। এই ঝোঁক আমার জীবন থেকে ওই একটি ঘটনায় মুছে গেছে।

তাই পাটনায় গিয়ে যখন মজলিসে পি. আর. দাশ মশায়ের বাড়িতে আগন্তুক বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম শুনতাম, তখন তাদের ঠিক চিনতাম না। আজও সে সব নাম মনে করতে পারি না। তবে দুটো নাম মনে আছে, একজন ওয়াই সিং। আর একজন ফরাসী দেশের খেলোয়াড়—ক্রোচে কি ক্রোসে। দাশ-মশায়ের দুই ভাইপো তখন বালক। একজন ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, একজন টেস্ট দিয়েছে—খসু সেন ও নসু সেন।

এই নসু সেন ও খসু সেনকে বাংলা পড়াবার ভার আমাকে দিলেন দাশ-মশায়। প্রথম দিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। গৌরবর্ণ, শুক্লকেশ, সুস্থদেহ মানুষ, সরল সরস বাক্যালাপ। চোখ দুটি তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এক কথায় বললেন, এক শো টাকা মাসে দেব আমি। ওদের বাংলার সঙ্গে পরিচয় করে দিন। এই টাকা থেকে আমার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম ফাউণ্টেন পেন কিনেছিলাম। সেটি আজও রয়েছে।

সেবার পাটনায় তিন মাস ছিলাম। মধ্যে মধ্যে দাশমশায় এক-একদিন ডাকতেন। একটি ছোট ঘরে বসে আলাপ করতেন। আমার কখানি বই তাঁকে দিয়েছিলাম। 'রাইকমল' তাঁর ভালো লেগেছিল। একদিন বলেছিলেন, আমার সময় থাকলে আমি ইংরাজীতে অনুবাদ করতাম আপনার এই বইখানি। এতে বাংলার অপরূপ প্রাণের পরিচয় আছে।

আর বলতেন, আমার এক সময় কিছু লেখবার ইচ্ছা ছিল। এখনো মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয়। প্লটও তৈরি করি। কিন্তু সে আর লেখা হয়ে ওঠে না। আমার লেখার ইচ্ছে নাটক। আপনি নাটক লেখেন না কেন?

আমি 'মারাঠা তর্পণের' কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, নাটক এই জন্যেই আর লিখি না।

দাশমশায় বলেছিলেন, তা হলে আর একবার লিখুন নাটক। আমার একটা প্লট আপনাকে দেব আমি।

প্লটটির কালের পটভূমি বৌদ্ধযুগ। বলতে শুরু করলেন তিনি। অল্প কিছুদূব বলার পরই সেদিন দু-তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। পাটনাব বাঙালী। একজন তার মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের জজ (তখন রিটায়াব করেছেন) অমর মুখোপাধ্যায়। তাঁরা এসে বেহারে বাঙালীদের সমস্যা তুলে আলোচনা শুরু করলেন। সেই দিন সেই ঘরে আমার সামনেই, বেহার-বেঙ্গলী-সেটলারস্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন হল। স্থির হল, সভা আহ্বান করা হবে। এবং সমিতি তৈরি হবে। তার মুখপত্র থাকবে। কর্মী সন্ধানের কথা উঠল। আমি সেই সভায় মণি সমাদ্দারের নাম করেছিলাম। মুখোপাধ্যায়-মশায় বলে-ছিলেন, দেখি সন্ধান করে কেমন ছেলে! অল্পস্বল্প জানি। তবু ভালো কবে জানি, সকলকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু দাশমশায় বলেছিলেন, দরকার নেই। এঁরা হলেন সাহিত্যিক, তরুণ-সমাজের খাঁটি পরিচয় ওঁরাই জানেন নির্ভুল ভাবে। বুঝলেন, এঁরা ছেলেদের খুব প্রিয়জন। মণিকেই নিন। মাথার ওপবে শচী বোস আছে।

পি. আর. দাশমশায় পৃথিবীর নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করেন না। উদার হৃদয়বান মানুষ। একটি বিশিষ্ট যুগের জীবন-দর্শনের প্রতীক। সব থেকে ভালো লেগেছিল মানুষটির সবলতা।

পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন হল। তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়। দাশমশায় সহকারী সভাপতি। সানন্দে পদ গ্রহণ করলেন, পাঁচ শো কি বেশি টাকা চাঁদাও দিলেন। অপর্ণা দেবী তাঁর কীর্তনের সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, নিজের বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। এরই মধ্যে কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দিলে, এতে আপনার মর্যাদার হানি হয়েছে। দাশমশায় তাই বুঝে গেলেন এবং আয়োজন শুরু করলেন এই সময়টায় যাবেন রাজগীরে। তাঁবুর বরাত হল, আয়োজন হল। এখানকার বাঙালীরা রবীনদার নেতৃত্বে গিয়ে বললেন—সে কি করে হয়? আপনি থাকবেন না, সম্মেলন হবে কি করে?

দাশমশায় ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। সে হয় না। আমাকে যেতেই হবে।

একেবারে সরল ছেলেমানুষের মতো।

লোকে তাঁকে দাম্ভিক বলেছিল।

কিন্তু আমি মানুষটিকে যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে ওই অভিমান বা দাম্ভিকতার মূলে দেখেছিলাম একটি সারল্য।

দাশমশায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি ছেলে—গরিব, পড়বে, সাহায্য চাই।

বেরিয়ে এসে অসহিষ্ণুর মতোই প্রশ্ন করলেন, কি, কি চাই?

সাহায্য।

নেই। নেই। আমাকে কে সাহায্য করে ঠিক নেই।

ঢুকে গেলেন ভিতরে। আবার বেরিয়ে এলেন, কিসের জন্য সাহায্য?

পড়ব।

পড়বে? কী পড়বে? কোথায় বাড়ি? কত সাহায্য চাই?

উত্তর শুনলেন। বললেন, আচ্ছা মাসে মাসে এসে নিয়ে যাবে। যাও। এখন যাও। যাও।

ভিতরে চলে এলেন।

ঘটনাটি আমারই সামনে ঘটেছিল।

দাশমশায়ের সঙ্গে পরিচয় পাটনায় যাওয়ার ফলে—যা পেয়েছি—যা লাভ করেছি তার মধ্যে অন্যতম।

(১৫)

পাটনার কথা এখানেই প্রায় শেষ। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে আছে। এ পর্যন্ত ওখানেই ছেদ পড়েছে।

পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কথা একটু আছে। সেখানে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সে নিয়ে একটা বড় বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কিছু

অসৌজন্য-জ্ঞাপক মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু সেই অভিভাষণে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর দূরদৃষ্টিতে যে ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর বিরোধী দলের মধ্য থেকে একজন তরুণও যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলেন বা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা স্মরণ করলে আজও লজ্জায় মাথা হেঁট করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোহিতলাল সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র রাগে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছিল, তাঁর হাতটা ধরবার চেষ্টা করলে, বারেকের জন্য ধরেওছিল। সেদিন বিক্রম এবং সাহস দেখেছিলাম সজনীকান্তের। সজনীকান্ত মোহিতলালের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং সে সময়ও পাশেই ছিলেন। সজনীকান্ত মুহূর্তে ছেলেটির সম্মুখীন হয়ে কঠিন প্রতিবাদে তাকে আত্মস্থ এবং নিরস্ত করেছিলেন।

মোহিতলালের সেদিনের অভিভাষণে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ। তা নিয়ে আজও দ্বন্দ্ব রয়েছে। আজ আবার সেকালের দুই শিবির ভেঙে তিন শিবির হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শিবিরের কথা বলার প্রয়োজন নেই; তৃতীয় নূতন শিবির যেটি হয়েছে—তার সংকল্প প্রগতি হলেও সে যুগের প্রগতি সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই; এ প্রগতির অর্থ হল—মার্কসবাদ অনুযায়ী সাহিত্য। তাঁর কথা ছিল, বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীর জীবন থাকবে, বাঙালীর বাংলা-ভাষা থাকবে, মানবজীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখ হাসি কান্না থাকবে; পটভূমিতে বিশেষ কাল এবং বিশেষ ভৌগোলিক গণ্ডী থাকতেই হবে। এই রচনা রচনাগুণে রসোত্তীর্ণ হলে তবেই হবে সার্থক সাহিত্য; এবং তাই হবে সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। ইংরেজীতে মনে মনে বাক্য রচনা করে সেই ভঙ্গিতে বিন্যাসে সুমার্জিত বাংলা-শব্দ বসিয়ে রচনার পদ্ধতিকেও তিনি মারাত্মক ভ্রম এবং অনিষ্টকর মনে করতেন। ভাব ও ভাবনার কথা এ ক্ষেত্রে বলাটাই বাহুল্য হবে। এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে প্রকৃতিবৈচিত্র্যের বিশেষ প্রভাবে জীবিকানির্বাহের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের ফলে মানুষ এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়—এই ধারণাই ধ্যানযোগে পরিপুষ্ট হয়ে পরিণত হয়েছে মানসিকতা গঠনের ধাতুতে। তার মনোজগতের তাই উপাদান। ক্ষেত্র এবং বাতাবরণের পার্থক্যে ফসলের পার্থক্যের মতো ভাবজগতের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী। তাই এই বিংশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে ইউরোপের দিকে তাকিয়ে তার সাধনায় সিদ্ধিফলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যখন খুঁজতে যাই, তখন সর্বাগ্রে দুটি আবির্ভাব চোখে পড়ে। একজন কার্ল মার্কস, অপর জন লেনিন। হিটলারও এই সাধনার ফল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চোখে পড়বে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সুতরাং ভাবগত পার্থক্য অস্বীকারের উপায় কোথায়?

ভারতবর্ষের রূপ যদি কেউ আকাশ-পথে ঘুরে এসে ছবি আঁকে তবে তাকে আঁকতে হবে, অসংখ্য দেউল মন্দির আকাশ-পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের কথা, রঘুপতি-যদুপতির উত্তর কোশল মথুরায় প্রাসাদ নেই, বিক্রমাদিত্যের স্বর্ণপুরী নেই, কিন্তু মন্দির আছে। অসংখ্য মন্দির। তার আকাশমুখী চূড়ার সূক্ষ্মাগ্র যেন মনোলোকের উর্ধ্বমুখী বাসনার প্রতীক। বিচিত্র গঠন-কৌশলে মনে হয় সে যেন সত্যই আকাশ ছুঁয়েছে।

ইউরোপের বস্তুবাদতত্ত্ব যখন এসে এর উপর সংঘাত হানলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারতথ্য যখন ডিনামাইটের মতো তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইলে, বাইরের বহু উপকরণে তখনই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল এবং ইউরোপীয় ভাববাদ ও তার ভাবনা-রস আকণ্ঠ পান করে গঠিত হল নব-ভারতের ভাব ও ভাবনা। যা ছিল বাইরে তাকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাইরের ভারত ভারত-জীবনের অন্তরলোকে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হল। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে সেই সনাতন ভারতের পরমোপলব্ধির অপরূপ নবীন প্রকাশ। মনোলোকে মন্দির গড়া হয়েছে, দেবতা সেখানে নবীন প্রকাশে মহিমান্বিত, সেখানে শঙ্খ বাজে, আরতি হয়, প্রদীপ জ্বলে, ফুল আছে, চন্দন আছে, বাইরের ভারতের সব কিছুই আছে সেখানে। ইউরোপীয় শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মঠ-মন্দিরের চারিদিকে বস্তুপুঞ্জ পাহাড়ের মতো জমে উঠল, তার ইয়ার্ডের বৈদ্যুতিক আলোর জ্যোতিতে মন্দিরের আলোক নিষ্প্রভ হল; কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হল না। ভিতরের আয়োজন বাইরের সংঘাতকে প্রতিহত করে ব্যর্থ করে দিলে। সে আয়োজনের ফল যখন আবার বাইরে রূপ পরিগ্রহ করলে গান্ধীজীর সাধনায়, তখনকার ভারতের রূপের কথা, মহিমার কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? নেই।

তাই আজ এ দেশের ইউরোপীয় ভাববাদীদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রচেষ্টা হয়েছে, এই দুই ভারত-জীবনের প্রতীককে অস্বীকার করবার। ভারতের জীবন-ক্ষেত্রে এই দুই সিদ্ধমূর্তি যতক্ষণ স্থান জুড়ে আছেন ততক্ষণ ইউরোপের ওই দুই মূর্তিকে এনে অধিষ্ঠিত করা অসম্ভব। গান্ধীজীর নাম এবং তাঁর ছবি প্রগতি সাহিত্যের আসরে বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে সাহস নেই। যদিও একখানি বামপন্থী পত্রিকায় দেখেছি যে, এঁরা ভিতরে রবীন্দ্রনাথকে কদর্য অভিধানে অভিহিত করে থাকেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-মেলায় রবীন্দ্রনাথকে এ-যুগে অচল বলে আসার মধ্যেও এরই প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে এ ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। এবার কিন্তু তিনি কৌতুক অনুভব করেন নি। তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃতির সংকট নামক মহাবাণীর মতো প্রবন্ধে তিনি পশ্চিমী-সভ্যতার উপর নিঃশেষে শ্রদ্ধা হারানোর কথা ব্যক্ত করেছিলেন। দেখেছিলেন বাহিরের রিক্ত ভারতের চেয়েও অন্তরে রিক্ত ভারতের আগামী অন্ধকারকে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র যুগে একবার যখন তারুণ্যের বিদ্রোহ হয়েছিল তখন তিনি শঙ্কিত হন নি—কৌতুক অনুভব করেছিলেন।

'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের পকেট থেকে খেরো বাঁধানো খাতায় নিবারণ চক্রবর্তীকে আমদানি করে বৃদ্ধ পিতামহের মতো কিঞ্চিৎ পরিহাস করেছিলেন। তার বেশী কিছু না। সকলেই ছিল তাঁর স্নেহের পাত্র। তিনি জানতেন যে, তারুণ্য তো চিরস্থায়ী নয়; প্রবীণতায় পৌছানো তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাতে একদিন পৌছুতেই হবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুব্ধও হয়তো হতেন। শুনেছি এক আধুনিক কবির কবিতার দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করে তিনি তাঁকে বলেছিলেন—তোমাকে লজ্জিত হতে হবে একদিন; লজ্জিত হবে তুমি। কাকে লিখেছিলেন—এই···কবির কবিতা যদি তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার তবে তোমাকে শিরোপা দেব। এর বেশী কিছু না। কাগজে-কলমে শঙ্কা প্রকাশ করেন নি এসম্পর্কে। কিন্তু এই তৃতীয় শিবির সম্পর্কে হয়েছিলেন শঙ্কিত। তখনও এ শিবিরের প্রকাশ্য স্কন্দাবার স্থাপিত হয় নি, স্কন্দাবারশীর্ষে রক্তপতাকাও ওড়ে নি, তখন শুধু দু-চারজন এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে তাঁবু খাটাবার জায়গা-জমি

খুঁজছেন। এদিক ওদিক চাইছেন। মধ্যে মধ্যে দু-চার কথা ফিস-ফাস করে বলছেন; সে ফিস-ফাস কথা তাঁর কান এড়ায় নি। এবং ফিস-ফাস কথার সঙ্গে এঁদের নাসিকা ও ওষ্ঠের বক্রভঙ্গিমাও তাঁর চোখ এড়ায় নি। ১৩৪৬ সালে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে তিনি কাগজ-কলমে লিখে গেলেন—আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে···মধ্যবিত্ততার অভিমান অত্যন্ত মেতে উঠেছে। (তখনও সর্বহারা কথাটা জোরালো হয়ে ওঠে নি, তত আওয়াজের জোর ছিল না এবং ইংরেজের শাসন তখনও কড়া) আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না।······

আমার আশঙ্কা হয়, একসময়ে "গল্পগুচ্ছ" বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গ দোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখ মাত্র হয় না···।···ভয় এই, এই আগাছাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

দুবার তিনি 'আশঙ্কা' এবং 'ভয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং এই বিচার পদ্ধতি ও মনোভাবকে আগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এখানে বর্তমানে এই তৃতীয় শিবিরের সাহিত্যবুদ্ধির বীজ উপ্ত হয়ে কেমন আকার ধারণ করেছে তার ফসল অবশ্য আজও জন্মায় নি তবে বন্ধ্যা ফুল অনেক ধরেছে, তার পাপড়ির বর্ণরেখায় কি কথা লেখা হচ্ছে তার একটু নিদর্শন দিলে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তৃতীয় শিবিরের এক লেখক রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মাধুর্য উপলব্ধি ও স্বীকৃতি রয়েছে বলে, বলছেন···প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় বুর্জোয়া চিন্তাধারার একটি প্রধান অংশে পরিণত। রবীন্দ্র-সাহিত্য অঙ্গে অঙ্গে তার প্রমাণ বহন করছে। অচলায়তন নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইনি বলেছেন—অচলায়তন নাটকখানি একখানি 'নতজানুবিদ্রোহ' নাটকে পরিণত হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত (অচলায়তনের) দাওয়াই কি পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে, কি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়, একথা সব মার্কস-বাদীই স্বীকার করবেন। অথচ এই পরামর্শ (অর্থাৎ ভারতীয় অহিংসা ও সংযমের ব্যক্তিমানস-সাধনা) দিয়েই অচলায়তন নাটকের উপসংহার—সংহার ?—হয়েছে। তবে অচলায়তনকে বিপ্লবী চিন্তার বাহন বলে মেনে নেব কেমন করে ?

এ আলোচনা থাক। এখন ঘটনার কথা বলি।

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পাটনার কালের মধ্যে জীবনের চার বছর সময় জুড়ে রয়েছে।

এই চার বছরে কলকাতায় আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে এই সময়ের [illegible] দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছে—সেকথা পরে বলব। তার আগে কলকাতায় এই চার বছরে আমার জীবনের কয়েকটা কথা বলে নি। 'বঙ্গশ্রী' থেকে সজনীকান্ত জবাব দিয়ে চলে এসেছেন। আমি দক্ষিণ কলকাতার সেই পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘর ছেড়ে এসেছি বউবাজারে একটি মেসে। সেখান থেকে হ্যারিসন রোডে একটি বোর্ডিংে।

বউবাজারের মেসটি ছিল একটি অতি বিচিত্র স্থান। এমন বিচিত্র সংস্থান কদাচিৎ ঘটে জীবনে। বাড়িটি কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে বউবাজার স্ট্রীটের উত্তর ফুটপাথের উপর। সামনেই একটি গির্জে আছে। এবং উত্তর দিকের ফুটপাথে বাড়িটার ঠিক একখানা বাড়ির পরেই আছে ফিরিঙ্গী-কালী। চীনেম্যান, দেশী কৃশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মুসলমান নিয়ে পাড়াটা। শুধু তাই নয়, বড় বড় বাইজীদের বাসা এখানে। যে বাড়িটায় আমাদের মেস ছিল, সেই বাড়িতে এককালে ছিল বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'সারভেণ্ট' পত্রিকার আপিস। একদিন পবিত্র গাঙ্গুলী মেসে এসে সে কথা বলে গেলেন। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। নিচের তলায় চামড়ার গুদাম; সামনেটায় ফার্নিচারের দোকান। একটা গলি-পথে ঢুকে পূর্বমুখী দরজার উপরতলার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটাই বাড়িটাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। সামনের ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণে বউবাজারের রাস্তার দিকটায় দোতলা এবং তিনতলায়

চারখানা বড় বড় ঘরে পশ্চিমদেশীয়া বাইজীরা থাকে। উত্তরে চারখানা চারখানা আটখানা ঘরে চারটে মেস। দুখানা করে ঘর এক-একটি মেস। এক-এক ঘরে দশ-বারোজন থাকে, যাত্রার দলের আসামীই বলুন আর ধর্মশালার যাত্রীই বলুন —যা বললেন উপমায় বেমানান বেখাপ্পা হবে না। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম—লোক সব জায়গারই আছে। আমি যে মেসটায় গিয়েছিলাম, সে মেসটা ছিল লাভপুরের নির্মলশিববাবুদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন কর্মী একটি বীমা-প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি হাতফিরে তখন নির্মলশিববাবুর ছোট ছেলে নিত্যনারায়ণের হাতে এসেছে। তাঁরাই তার সর্বেসর্বা। শান্তিনিকেতনের কর্মীরা দূবে পড়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় কর্মীরা সেই শান্তিনিকেতনের কর্তৃত্বের আমলেব। চট্টগ্রা[illegible]দেব মধ্যে এক দিকে এক কথা হচ্ছে, এক দিকে ঢাকাই কর্মীরা চালাচ্ছেন তাঁদের জেলার কথাবার্তা, ওদিকে চলেছে বাঁকুড়া ও বীরভূঁইয়াদের ঝগড়া। এরই মধ্যে খাস কলকাতাব একটি প্রিয়দর্শন তরুণ, সে লাভপুরের থিয়েটারে এবং কলকাতার অ্যামেচারে নারীভূমিকায় অভিনয় করে, সেই সূত্রেই তার এখানে চাকরি, সে মিঠে গলায় গান ধরে—

"আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে
দাও না, দাও না দেখা কি তাই বারে বারে!"

এরই মধ্যে হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে একখানি কচিমুখ উঁকি মারে—

ছেলেটিকে শরৎবাবুর 'শ্রীকান্তের' সেই রেঙ্গুন-প্রবাসী চতুর বাঙালীর ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করব না, যে নাকি বর্মী মেয়েকে বিয়ে করে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে আসবার সময় কান্নার সুরে তাকে বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ করেছিল—হায় রে, আর তোর কিছু নেই যে নিয়ে যাই। ওঃ, এই যে হাতে একটা চুনীর আংটি রয়েছে, ওটাই দে রে! তবে এটা বলব যে সে হৃদয় নিয়ে কৌতুকবশে হৃদয়হীন খেলা খেলতে গিয়েছিল। আমাদের মেসের গায়ে সিঁড়ি; তার ও-ধারে দুটি ঘরে থাকত দুটি বাইজী—দুই বোন, লক্ষ্ণৌ কি এলাহাবাদ তাদের দেশ। এটি ছোট বোন। বয়স আঠারো কি উনিশ। সুন্দরী বলব না। তবে প্রিয়দর্শিনী তাতে

সন্দেহ নেই। আমাদের মেসের আটাশ-তিরিশ জন এবং পাশের মেসের জন পঁচিশেক—সবশুদ্ধ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জনের একশো একশো দশটি চক্ষু অহরহই উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরত তার সন্ধানে। মেয়েটি কৌতুকে মধ্যে মধ্যে উঁকি মেরে কটাক্ষ হেনে বক্র হেসে আবার মুখ টেনে নিত। সন্ধ্যায় সাজ-সজ্জা করে বারান্দায় বেড়াবার অছিলায় এক পাক ঘুরে পঞ্চান্নটি যুবকের হৃদয় জর্জরিত করে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসত। তারপর আসত মলমলের পাগড়ী, আদ্দির পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম, হীরের আংটি-পরা শেঠের দল। ও-দিকে ঘরে তবলা বাঁধা হত; চাকর ঘন ঘন উঠত নামত, পান পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করত, খুসবাইয়ের গন্ধ ছুটত। গান শুরু হত—শুনু যা শুনু যা পিয়া—

ঘুঙুরের ধ্বনি উঠত। এরা এ ঘরে বিছানায় শুয়ে বুক বাজাত। কেউ তারিফ করত, কেউ করত—হায় হায়! এখানে বলা ভালো যে, পূর্ববঙ্গের ছেলেদের শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল কুমারের দল। রাজসাহীর দুই ভাই থাকত। তাদের একজন ছিল মুগুর-ডাম্বেল-ভাঁজা ছেলে। সে এই সময়েই মুগুর ঘোরাতে শুরু করত।

কলকাতার এই থিয়েটার-করা ছেলেটি মেসে থাকত না। তবে আসত যেত। এদের এই অবস্থা দেখে সে হাসত, কৌতুক করত। একদা এই নিয়ে তকরার হয়; এবং সে বাজি রাখে যে, সে যদি এখানে এক মাস থাকে তবে ঐ তরুণীটি—যার পায়ে নাকি পঞ্চান্নটি হৃদয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওর ঘুঙুরের প্রতিটি দানার ঘায়ে আহত হচ্ছে, তাকেই সে জয় করে ওঠাতে পারে, বসাতে পারে, হাসাতে পারে—কাঁদাতে পারে, এমন কি ওর যে ঘরে বসে গান শুনতে পঞ্চাশ বা একশো টাকা লাগে, সেই ঘরে তাদের বিনা দক্ষিণায় সমাদর করে ডেকে বসিয়ে ওর নাচ-গান শুনিয়ে দিতে পারে।

বাজি হয়েছিল। কি বা কত বাজি তা আমি জানি না। এ সব আমি ওখানে যাবার আগের ঘটনা। আমি যখন গেলাম, তখন ছেলেটি বাজি জিতে বসে আছে। এবং বোধ করি বাজি জিতেও নিজের অগোচরে নিজে দেউলে হয়েছে। সাধারণ কথায়—মরেছে।

ওদিকে মেয়েটির দিদি প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার এ মোহের কাজল মুছতে।

ছেলেটির প্রাণপণ চেষ্টা বন্ধন কাটতে। কিন্তু তা কি হয়? সেও কাঁদে, ওদিকে মেয়েটিও কাঁদে। কেঁদেই সে ক্ষান্ত থাকে না, গানের সাড়া পেলেই বংশীরব-মুগ্ধা কুরঙ্গিণীর মতো দীর্ঘবেণী দুলিয়ে এসে উঁকি মেরে ডাকে—বাবুজী!

কখনোও কখনোও মধ্যরাত্রে পানীয়ের প্রভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত নটবর শেঠমহারাজদের দু-একজন এসে ভুল করে বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে মোড় ফিরে আমাদের বারান্দায় ঢুকে পড়ে ডাকত—কাঁহা হো পিঁয়ারী?

পঞ্চাম্নটি কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠত মুক্ত আগ্নেয়গিরির মতো—কৌন রে?

কেডা?

পাকড়ো হালার পোকে!

মধ্যে মধ্যে এক আধজন ভয়ে আছাড় খেত।

আরও একটা বিচিত্র সংস্থান ছিল। সরু মিহি গলায় চিৎকার উঠত ছাদে বা সিঁড়িতে—ঈ—ওল্‌ড্‌ হ্যাগ—

উত্তরে আরও একটা গলা চেঁচাত—হোয়থ? ইউ বিচ্‌!

উপরের ছাদে এই ফ্ল্যাটেই বলুন আর ঘরেই বলুন এগুলির জন্যে কাঠের রান্নাঘর ছিল। বোধ হয় খান তিনেক রান্নাঘর খালি ছিল, সেখানে থাকত দুটি ক্রীশ্চান মেয়ে।—একটি যুবতী একটি বুড়ী। ওদের দুজনে ঝগড়া বাধত। বুড়ী ওই যুবতীটির রান্নাবান্না করত। তার সঙ্গেই খেত-দেত। যুবতীটি বিকেলে সাজসজ্জা করে বের হত, রাত্রে প্রায়ই মাতাল হয়ে ফিরত। তখনই বাধত ঝগড়া। মধ্যে মধ্যে সঙ্গে আসত ফিরিঙ্গী ছোকরা। খানিকটা দাপাদাপি করে শেষে গালাগাল করতে করতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাত। মাতাল যুবতীটা তাড়া করত ভাঙা বাজু বা মশারির ডাণ্ডা নিয়ে।

বুড়ীটা মধ্যে মধ্যে কাঁদত। হিন্দীতেই বলত, ছোকরী সেও এককালে ছিল।

বাবুরা অনেকে তাকে ডাকত 'ম্যাগী' বলে।

সে কিছু বলত না। কিন্তু একদিন আমাকে বলেছিল, দেখ, আমি ম্যাগীর মানে জানি।

বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে ছিল খানিকটা পতিত জায়গা, সেখানে ছিল

রিকৃশার আড্ডা। আর তার পাশেই ছিল চীনেম্যানদের বাসা। ছাদে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর সারি সারি নীল কাপড়ের জামা পেণ্টালুন ক্লিপ এঁটে শুকুতে দিত আর একপাল ছেলে নিয়ে—সে যে কি বকাবকি সে আর কি বলব?

রবিবার দিন সকলে ছাদে উঠে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকত উত্তর-পশ্চিম দিকের একখানা বাড়ির ছাদের দিকে। কি? কানে কানে চুপিচুপি একজন বললে,—এর বাড়ি। ওই যে ফুলের টবওয়ালা ছাদ।

নামটা একজন বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রীর।

রবিবার দিন তিনি নিজে হাতে গাছগুলিতে জল দেন এবং পরিচর্যা করেন। তাই রবিবার সকালে ছাদে সকলে ভিড় করে দাঁড়ায়।

আমাদের একজনের নাম ছিল রাজেনবাবু, চাটগাঁয়ের ছেলে। ছিমছাম অবিবাহিত যুবক। তাঁর বাই ছিল এই সিনেমা-স্টার দেখে বেড়ানোর। এবং মধ্যে মধ্যে এমন সব খবর নিয়ে আসতেন যে সকলে থ মেরে যেত।

একদিন বললেন,—দেবীকে দেখে এলাম, এই দু-হাত পাশ থেকে শাড়িটা ছুঁয়ে দেখেছি। লোকে বলে—কালো, আমি দেখলাম গোলাপী সাটিনের মতো চকচকে গায়ের রঙ আর তেমনি কি চামড়া!

এই আসরের মধ্যে আমার আসর পাতলাম।

সুবিধে ছিল দুপুরের সময়। খাঁ-খাঁ করত সব মেসগুলি। ওদিকে বাই-জীরা নিদ্রামগ্ন। উপরে ফিরিঙ্গী মেয়ে দুটিও ঘুমোত। আমি লিখতাম।

(১৬)

এই বিচিত্র বাসাটির স্মৃতি বিচিত্র। কত বিচিত্র মানুষ বিশেষ করে এই মহানগরীর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সমাবেশ এখানে দেখেছি তার হিসাব দিতে গেলে—সে হবে অন্য গ্রন্থ। তবে একটি বৈচিত্র্যের কথা বলব। সে ফিরিঙ্গী কালী ও কালী-তলার কথা। এই কালীস্থানটি বহু পুরাতন। কলকাতার তথা ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনে এই দেবতাটির ভূমিকা ঐতিহাসিক বললে অতিশয়োক্তি হবে না। সেকালে সমাজের অবহেলিত বর্ণের যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল—ওই আমাদের মেসের ছাদের বাসিন্দে ম্যাগী-লুসির পূর্বপুরুষদের আরাধ্যা দেবী।

ক্রীশ্চান হয়েও বিপদে আপদে শোকে তারা মেরী ও ক্রাইস্টকে ডেকে সান্ত্বনা পেত না। তাই ওই দেবীটিকে স্থাপনা করেছিল। এখানে তারা পূজা দিত সেকালে। প্রণাম করে কাজে বের হত। এইকালেও দেখতাম, ক্রীশ্চানরা এসে দাঁড়াত—মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। যেই দেখত বিশেষ লোকজন নেই অমনি পয়সা দিয়ে টুপ করে একটি ছোট্ট প্রণাম নিবেদন করে চলে যেত। সন্ধ্যের পর থেকে এইটে ঘটত বেশী। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মধ্যে মধ্যে দেখতাম—ম্যাগী বুড়ী হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কিছু বলছে।

রিকশাওয়ালাদের ঝগড়া দেখেছি; চীনেম্যানদের কর্মতৎপরতা দেখেছি। আমাদের গলির মধ্যে অন্ধকারে সওদা হত।

এই বিচিত্র স্থানটিতে থাকতেই মহাকবির সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিবরণে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা বাদ পড়ে গেছে। প্রথম সাক্ষাতের সময় কথাবার্তার মধ্যে তিনি আমাকে বলেছিলেন—তোমায় একটা কাজের কথা বলি, শোন। কলকাতা থেকে মধ্যে আমার কাছে এসেছিলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভালো নাটক পাচ্ছেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমার তো এখন রঙ্গমঞ্চকে দেবার মত তৈরী কিছু নেই। কি দেব? তবে তুমি তারাশঙ্করের 'রাইকমল' নাটক করে নিয়ে দেখতে পার। আমার ভালো লেগেছে। বাংলার খাঁটি মাটির জিনিস। সত্যিকারের রস আছে। তাঁকে বইখানাও পড়িয়েছি এবং তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাবার কথাও দিয়েছি। তুমি কলকাতা গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী। রঙ্গমঞ্চে যাঁর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের নারায়ণ নারদের বীণার ঝঙ্কারে গঙ্গার মতো বিগলিত হয়ে যায়! বাংলার তথা ভারতবর্ষের মনোহারিণী যাঁর প্রতিভা, তিনি আমার 'রাইকমল' অভিনয় করবেন! মনে পড়ল 'মারাঠা তর্পণে'র লাঞ্ছনার কথা। কবিগুরু অন্তর্যামীর মতো আমার অন্তরের অন্তরে লুকানো বেদনার সন্ধান জেনে সেই বেদনাই উপশম করার ব্যবস্থা

করেছেন আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই! শিশিরকুমার তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর বইয়ের জন্যে, তিনি আমার বই অভিনয় করতে বলেছেন!

তখনকার আমার মতো একজন সামান্য লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায় বাংলার রঙ্গমঞ্চে নূতন ভগীরথ, নবসঞ্জীবনের ব্রহ্মার মতো স্রষ্টা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন?

এতবড় সৌভাগ্য আমার!

কলকাতায় সে সময় থাকতাম মনোহরপুকুরে। সেই ষষ্ঠীচরণের সস্নেহ সেবার মধ্যে।

কবির কথায় আশাভরা বুক নিয়ে কলকাতায় এলাম। বন্ধুবান্ধব কাউকে বললাম না কথাটা। কি জানি শিশিরকুমার কি ভাবে নেবেন বা নিয়েছেন কথাটা! কোথায় দেখা করব তাঁর সঙ্গে? বাসার ঠিকানা জানি না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? অবশেষে একদিন স্টার থিয়েটারের দরজায় এসে হাজির হলাম। ওখানে তখন নাট্যাচার্যের অভিনয়ের আসর বসে।

একে কলকাতা, তায় থিয়েটারের কাণ্ডকারখানা। সকলেই অপরিচিত, সকলকে দেখেই ভয় করে। এঁরা বিচিত্র জগতের মানুষ বলে মনে হত। কথাবার্তার ঢঙে ভঙ্গিতে শঙ্কিত হতে হত, এবং সেই 'মারাঠা-তর্পণে'র স্মৃতি থেকে আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছিল। স্টার থিয়েটারের টিকিট-আপিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাকে জিজ্ঞাসা করি? কাকে বলি? অনেক সাহস করে টিকিটের ঘুলঘুলি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, নমস্কার।

হাতের পেনসিলটা কপালে ঠেকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আমি একবার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কার সঙ্গে?—ভদ্রলোকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে।

মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখা হবে না।

আমি—

হবে না মশায়। তিনি অভিনয় করছেন। এ সময় দেখা তিনি করেন না।

দয়া করে আমার নামটা—

না মশায়, না। যা নিয়ম নেই, তা পারব না।

কি করব? চলে এলাম। পথে আপসোস হল, ওঁর বাসার ঠিকানাটা জেনে এলাম না কেন?

পরদিন আবার গেলাম।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর পেলাম—সে দেবার হুকুম নেই মশায়। তাঁর শরীর ভালো নয়।

পরের দিন এলাম। সেদিন অভিনয় নেই, সব খাঁ-খাঁ করছে, ফিরে গেলাম। এইভাবে দিন আষ্টেক ফেরার পর সেদিন স্টার থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে মনে সংকল্প নিচ্ছিলাম, নাঃ, থিয়েটার-জগতের দরজা আর মাড়াব না।

ঠিক এই সময়টিতেই সাড়া পেলাম—তারাশঙ্করবাবু!

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, আবার সাড়া এল—সামনের ফুটপাথে, আমি পবিত্র গাঙ্গুলী।

তখন কলকাতা এমনতর ঘন জনারণ্য হয়ে ওঠে নি, সামনের ফুটপাথের দিকে তাকাতেই পবিত্র গাঙ্গুলী মশায়কে দেখলাম। হাতের তালুতে তামাকের পাতা কচলাচ্ছেন চুন সহযোগে।

এ পারে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, এখানে? থিয়েটার দেখতে না কি?

না ভাই, এসেছিলাম শিশিরবাবুর কাছে।

বলে সকল বিবরণ প্রকাশ করে বললাম, তা হল না। আর হয়েও কাজ নেই। এ দরজা আর মাড়াচ্ছি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের হুকুমে এসেছেন, ফিরে যাবেন কি? আসুন, দেখি আমি।

তিনি উঠে গেলেন, দোতলায়। তারপর একজন সুদর্শন ব্যক্তিকে ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ভিতরে পাঠালেন। বোধ করি মিনিট তিন-চারের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, চলুন, ভিতরে চলুন।

শিশিরকুমার বোধ হয় আলমগীর সেজে বসে ছিলেন, অভিনয় হচ্ছিল। আর বসে ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি শিশির-কুমারের মামা।

আমরা ঢুকতেই শিশিরকুমার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এস পবিত্র। আপনি তা হলে তারাশঙ্করবাবু।

আমি নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার করতে করতেই তিনি বললেন, আরে, মশাই, আমি আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

পবিত্র হেসে বললে, কিন্তু বাইরে যে আপনার অনুচরেরা পথ বন্ধ করে বসে আছে! উনি দিন আষ্টেক ঘুরে প্রবেশ-পথ না পেয়ে 'আর আসব না' বলে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন মুহূর্তে আমাব সঙ্গে দেখা তাই, আমার কথাই শোনে না কি আপনার দ্বারপালেরা! অনেক বলে-কয়ে—তবে।

শিশিরবাবু হেসে হাত নেড়ে বললেন, ওদের দোষ নেই—ওদের দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের। থিয়েটাবের দেনা হয়ে গেছে। কে পাওনাদার, কে পাওনাদার নয়—ওরা চেনে না; কাজেই একধার থেকেই ফিরিয়ে দেয়।

এমন সুন্দর কথা বলা শুনি নি।

তারপর বললেন—আমাকেই বললেন, নইলে পবিত্র জানে, কারও ভালো লেখা পড়লে, শিশির ভাদুড়ী তাকে খুঁজে বের করে আলাপ করে আসত। আমার থিয়েটারে নতুন লেখকদের দ্বার ছিল অবারিত। কত আনন্দ গেছে তখন! আজ আমাকে দেখছেন, আমি আমার কঙ্কাল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন 'রাইকমল' কিনে পড়ে নিয়েছি। ভালো জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস। ভালো হবে। হ্যাঁ। আমি ওই বগ বাবাজীর ভূমিকাটা নেব। একটু অদল-বদল করে নেব। বগের বদলে ব্যাঙ করলেই মানিয়ে যাবে। ছোট কমলের ভূমিকাটা প্রভার মেয়েকে দিয়ে চালিয়ে নেব। তারপর প্রভা। বইটা আমাকে শিগগির করে দিন। খুব শিগগির। আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।

মাসখানেকের মধ্যে বই দেব বলে নমস্কার করে পরিপূর্ণ মন নিয়ে বিদায়

নিলাম। ভারি ভালো লেগেছিল এই প্রাণ-খোলা প্রতিভাশালী মানুষটিকে। বার বার মনে পড়েছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের রচিত রামেন্দ্রসুন্দর-প্রশস্তি—তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর—

পরের দিনই বাড়ি চলে এলাম 'রাইকমল'কে নাট্যরূপ দেবার জন্যে। একখানা গানও রচনা করে ফেলেছিলাম, প্রথম দৃশ্যটাও লিখে ফেললাম। গানটি এবং আরম্ভ দুই-ই চমৎকার হয়েছিল। ওতে করেছিলাম রসিকদাস বাউল ঘুরতে ঘুরতে রাইকমলের গ্রামে এসে পড়ল এবং কমলরঞ্জন এদের রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে, গাঁয়ের লোকের চৈত্রসংক্রান্তির পর্ব দেখে, ওইখানে দুদিন চারদিন থাকতে গিয়ে থেকেই গেল। গানটার গোড়াটা ছিল—

"হায় কোন্ মহাজন পারে বলিতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে।"

সে যাক। আমি তখন ভাবিও নি, শিশিরবাবু গান গাইবেন কি করে? কিন্তু সব ভাবনাব হঠাৎ সমাপ্তি ঘটল একদিন কাগজ পড়ে। দেখলাম, শিশির-কুমার স্টার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন, এবং হয়তো বা আর রঙ্গালয়ের সংস্রবেই আসবেন না।

দুঃখ খুবই হয়েছিল। তবে শিশিরকুমারের সেদিনের সহৃদয়তা, তাঁর পরিচয় আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রইল।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের কথা বলব। তখন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-ভবনে এসেছেন। সেই ইরিসিপ্লাস হয়ে কবি যেবার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হন—সেইবারের কথা। কবি তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এসেছেন—নিউ এম্পায়ারে অভিনয় হবে।

আমার দ্বিতীয় গল্পের বই 'জলসাঘর' তখন কিছুদিন—কয়েক মাস হল বেরিয়েছে। কবিকে প্রণাম করে তাঁকে বই নিজে দিয়ে আসব এই বাসনা ছিল। কিন্তু যাই-যাই করে যাওয়া হয় নি। এবার কলকাতায় এসেছেন জেনে একদিন দুপুরবেলা 'জলসাঘর' বইখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম নব্য বাংলার তীর্থভূমির মত পবিত্র ঠাকুরবাড়ির সামনে। ও-বাড়ি ঠাকুরবাড়িই বটে বাংলা দেশের। সেই আমার প্রথম যাওয়া ঠাকুর-

বাড়ির এলাকায়। এর আগে চিৎপুরের ট্রামে যেতে বড় বড় থামওয়ালা—খুব উঁচু বড় সিঁড়িওয়ালা বাড়িটিকে দেখে ভাবতাম, এইটিই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। সেদিন ঠাকুরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখে—কোথায় যাব, কোন দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় পুরনো বাড়ির বারান্দায় দেখলাম শান্তিদেব ঘোষ যাচ্ছেন—বিচিত্রা ভবনের দিকে। আমি তাঁকে ডাকলাম।

শান্তিদেব আমাকে চিনতেন। আগেই বলেছি তাঁর পিতার স্নেহাস্পদ ছিলাম আমি। শান্তিদেব মানুষটিও বড় স্নিগ্ধ এবং মধুর। যা দেখে ভয় পাই, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁকে ডাকলাম। তিনি নেমে এলেন। অভিপ্রায় শুনেই বললেন, দাঁড়ান দেখি, কি করছেন।

দেখে ফিরে এসে বললেন, আসুন। একা রয়েছেন, আপনার ভাগ্য ভালো।

বিচিত্রা-ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ছোট ঘরখানিতে মহিমান্বিত কবি বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। সে দিন সেই তাঁর আকাশ-দেখা দৃষ্টি দেখে আমার জন্ম ধন্য হয়েছে। আমি সেই দিন ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, মুহূর্তে আমার মন বলে দিয়েছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো, এই তো সেই কবি, যে কবির মনে আকাশের, মেঘের, গোধূলির আলোর স্পর্শ সুরঝঙ্কার তুলে দেয়, ধ্যানপুলকমগ্ন কবিকণ্ঠে আপনি স্ফুরিত হয়—

> আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
> আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে ॥

সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল। আমি দেখলাম, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখে তার ছায়া পড়ছে। এই কবির মনেই আসতে পারে এবং আসে বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ়ের গান। আকাশে বকের পাঁতি উড়ে চলে যায়, নীলনভোপটে তাদের সারির শুভ্র লাবণ্য, তাদের পাখার শব্দ কবিচিত্তকেই আত্মহারা করে দেয়, গানের ঘরের দুয়ার আপনি খুলে যায় সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যার চোখের পাতার মতো।

শান্তিদেব আমার হাত ধরে আকর্ষণ করলেন। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন। বোধ করি মিনিট দুয়েক, কি তারও বেশি সময় পরে কবি দৃষ্টি ফেরালেন।

শান্তিদেব ঘরে ঢুকলেন, কবি নিজেই প্রশ্ন করলেন, কই তারাশঙ্কর?

শান্তিদেব বিনাবাক্যব্যয়ে সরে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর সম্মুখীন হলাম। প্রণাম করলাম। হেসে বললেন, বস।

শান্তিদেব চলে গেলেন।

আমি বইখানি তাঁর পাশের ছোট টেবিলটার উপর রেখে দিলাম।

বললেন, বই? গল্পের? 'জলসাঘর'! জলসা দেখেছ? গান বোঝ?

আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, পড়ব। সময় পেলেই পড়ব। তোমার লেখা আমার ভালো লাগে। কলকাতায় কি কাজে এসেছ? বৈষয়িক?

বললাম, বিষয় সামান্য আমাদের। আর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। এই লেখা-টেখার কাজ নিয়েই আসি যাই।

তা ভালো। যদি একেবারে আঁকড়ে ধরতে পার তো ভালো করবে। তবে তাতে দুঃখ পাবে। অনেক দুঃখ। সে দুঃখকে জয় করতে হবে।

আমি বললাম—সংকল্প আমার তাই।

—দুঃখকে ভয় কোরো না, হার হবে না।

তার পর বললেন, আমাদের নৃত্যনাট্য দেখেছ তুমি?

—আজ্ঞে না।

—কেন? শান্তিনিকেতন বাড়ির কাছে, এসে দেখ না কেন? এস এস। আমি বলে দেব তোমাকে জানাতে। কালীমোহনকে বলে দেব।

—তার পরই বললেন, তোমাদের ওখানে তো অভিনয়ের খুব সমারোহ! দীনু দেখেছেন, গান শিখিয়েছেন। কালীমোহন দেখেছেন, খুব প্রশংসা করেন। আমিও একবার বলেছিলাম, দেখব তোমাদের অভিনয়। কিন্তু তোমরা দেখালে না আমাকে।

কথাটা সত্য। আমাদের লাভপুরের অভিনয়ের মান খুব উঁচু ছিল, সত্যিই অভিনয় ভালো হত। কবির 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখে অনেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকে ভালো হয়েছিল বলেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে দল বেঁধে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কি একটি উপলক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতার বর্তমান দীপক সিনেমায়—তখনকার

অ্যালফ্রেড থিয়েটারে—লাভপুরের সম্প্রদায়কে অনুরোধ ক'রে অভিনয় করিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরাই আমাদের মঞ্চসজ্জা করে দিয়েছিলেন। সেই অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা কবির কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি সত্যই বলেছিলেন, ওদের একবার শান্তিনিকেতনে ডাক। আমি দেখব ওদের অভিনয়।

কথা অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু কি যে হয়েছিল, কি বাধা যেন হয়েছিল। যত দূর মনে পড়ছে, কবিরই সময়ের অভাব ঘটেছিল। সেই কথা তুলে হেসে কৌতুক করে বললেন—তোমরা আমাকে দেখালে না। তা'র পর প্রশ্ন করলেন—তুমি? তুমি পার অভিনয় করতে?

—পারি একটু আধটু।

—পার? অনেক কিছু পার তুমি। স্বদেশী, অভিনয়, লেখা। তা হলে ভালোই পা'র। নইলে আমার কাছে স্বীকার করতে না। তুমি আমাদের এই নৃত্যনাট্য দেখ। কলকাতাতেই দেখ। শান্তিদেবকে আমি বলে দেব। তুমি এসে একখানা প্রবেশপত্র নিয়ে যেও।

আমি অভিভূত হলাম তাঁর স্নেহের স্পর্শে।

দোরের ও-পাশে সিঁড়ির মাথায় পায়ের শব্দ উঠল। অনেকগুলি একসঙ্গে। দেখলাম, গানের মহলার জন্যই বোধ হয়, যন্ত্র হাতে শিল্পীর দল উঠে এসে বড় হলে ঢুকছেন। শান্তিদেব এসে দাঁড়ালেন।

কবি বললেন—তোমার বই আমি পড়ব। বইখানি সরিয়ে তুলে রাখলেন।

আমি প্রণাম করে চলে এলাম। দু-তিন দিন পর শান্তিদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু দেখা হল না। তিনি ছিলেন না।

আমি ছায়া 'মঞ্চে' নৃত্যনাট্য দেখে এলাম।

সে কি দৃশ্য!

মঞ্চের বেদীর উপর আসনে কবি বসেছেন, সে যেন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। তার পরেও দেখেছি শান্তিনিকেতনের নৃত্যনাট্য। কবির আসন অপূর্ণ থাকে, তাতেই যেন সব অপূর্ণ। কবিকে নিয়ে যারা সে নাট্য দেখেছে, তাদের চোখে সব ম্লান ঠেকবে।

কবির সেই আবৃত্তি—দে দোল—দোল, প্রিয়ারে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল।

তারই সঙ্গে শান্তিদেবের নাচ। আর সেই আমার প্রথম দেখা। আমার মনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

কবি কদিন কলকাতায় ছিলেন, অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত। লোকজনের সমাগমের তো কথাই নেই। তারই মধ্যে কিন্তু তিনি 'জলসাঘর' পড়ে শেষ করেছিলেন এবং আগন্তুক অনেক জনের কাছে বলেছিলেন। তারই দু-চার টুকরো আমার কানে আসতে লাগল।

এর পর কবি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যার ট্রেনে গেলেন। তখন ইরিসিপ্লাসের আক্রমণ শুরু হয়েছে; বোলপুর পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে কাগজে কাগজে তাঁর অসুখের কথা প্রচারিত হল।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললাম, কবিকে তুমি বাঁচাও। রক্ষা কর। আয়ু কর। কবি সেরে উঠলেন। তার পরই শান্তিনিকেতন থেকে এক সঙ্গে শ্রীসুধীর কর ও শ্রীরথীন্দ্রবাবুর পত্র পেলাম—'জলসাঘর' বই পাঠাবার জন্য। কে যেন বইখানি নিয়ে গেছে। কবি বইখানি চান। রাগ করছেন না পেয়ে। এসব কথা আগেই লিখেছি। কবির সঙ্গে পরের দেখার কথাও লিখেছি।

এদিকে আমার জীবনের যে অস্থির গ্রহটি আমাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ক্রমাগত তাড়িত করে নিয়ে ফিরছিলেন, তিনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

এমনই একটি অপবাদ আমার ঘাড়ে এসে চাপল যে, আমার পক্ষে এই মেসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই মেসটির সঙ্গে আমার মামাশ্বশুরদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। অপবাদটা তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার অপবাদ—দিলেন যিনি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সত্যকে তিনি বিকৃত করলেন। আমাকে আঘাত দিলেন আমার মামাশ্বশুরেরা।

আমি ওই মেস ছাড়লাম। এবার এসে উঠলাম হ্যারিসন রোড মির্জাপুর স্ট্রীট জংশনে 'পূরবী' সিনেমার সামনে শান্তিভবন বোর্ডিঙে।

সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি দুজনে সামান্য জিনিসপত্র কটা নিয়ে এসে উঠে গেলাম শান্তিভবনে।

শান্তিভবন বোর্ডিঙে এসে পরম আরাম অনুভব করেছিলাম। জীবনে প্রমোশন পাওয়ার স্বাদ পেলাম। এ কাল পর্যন্ত সাহিত্য-জীবনের মধ্যে আহার বাসস্থানের সুখের দিক দিয়ে এর থেকে সুখে (অঙ্কফলা ফলের মতো সুখে) ছিলাম না এমন নয়; অর্থাৎ এর থেকে ভালো বাড়িতে আহার্যের ব্যবস্থায় ভালোতর ব্যবস্থা অবশ্যই পেয়েছি। যে সব আত্মীয়দের বাড়িতে এসে অতিথি হিসেবে থেকেছি তাঁরা আমাকে পরম যত্ন করেছেন, তাঁরা আমাদের বাঙালী সমাজে ধনী পর্যায়ের মানুষ; এবং তাঁদের আতিথেয়তা তাঁদের ব্যবহার যত্ন সবই তাঁদের শিক্ষা এবং শ্রীর উপযুক্ত। এবং আমার প্রতি স্নেহের মধ্যে কোন কৃত্রিমতাও ছিল না—এ সত্য অন্তর দিয়েই অনুভব করেছি। তাঁরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার সুখদুঃখের সমান অংশ চিরকাল গ্রহণ করে আসছেন। আজও সেই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মনে পড়ছে তাঁদের স্নেহ সমাদর। স্বর্গত রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই কন্যা এই দুই আত্মীয় বাড়ির গৃহিণী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় মেয়ে আমার সাহিত্যের প্রতি মতি-গতি দেখে এই পথে আমার সুবিধা করে দিতে তাঁর বাবাকে একটি চাকরি দেবার অনুরোধ করেছিলেন। রায়বাহাদুরের হাতে ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা। তিনিই ছিলেন সরোজনলিনী স্মৃতি সমিতির সম্পাদক। কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন বড়মা অর্থাৎ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। তাঁর অধীনে আমাকে একটি কাজ দেবার কথা বলেছিলেন। রায়বাহাদুর আমাকে ভালো করে জানতেন; স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে রায়বেঁশে নিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল তাও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, তা হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে কাজ কি সে করবে?

তিনি ভুল ধারণা করেন নি। আমি সবিনয়েই বলেছিলাম—না বউদি, ওখানে চাকরি আমার সইবে না।

রায়বাহাদুরের মেজ মেয়ে—তাঁর বাড়িতে মায়ের মতো সহোদরার মতো যত্ন করেছেন সে কথা আগে বলেছি। মনে পড়ছে 'বঙ্গশ্রী' গল্পের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে, মাসের তিরিশ তারিখ—আমি 'জলসাঘর' লিখছি; বলেছি রাত্রে খাব না। রাত্রির মধ্যেই গল্প শেষ করব সংকল্প নিয়ে বসেছি। তিনি নিজে অন্ন

কিছু খাদ্য নিয়ে এসে বলেছেন—আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না খেলে নড়ব না। না খেয়ে লিখলে শরীর থাকবে কেন? লিখতেই বা পারবে কেন?

খেতে হয়েছে। তারপরও খাবার রেখে গেছেন, হিটার দিয়ে গেছেন, ফ্ল্যাস্কে চা রেখে গেছেন; বলে গেছেন খিদে পেলে যেন খাই।

সুতরাং সুখ ও যত্নের দিক দিয়ে পরম আরামের কথা বলি না। মনের দিক দিয়ে এসব সুখ যত্ন সত্ত্বেও যে সংকোচ কাঁটার মতো খচ খচ করত, নিজেকে অক্ষম এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে করে যে অশান্তি অনুভব করতাম তাই থেকে নিষ্কৃতি, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং বেশ ভালো সুখসুবিধে দুটো একসঙ্গে পেয়ে আরাম অনুভব করলাম। অনেক আগেই—প্রায় বৎসর তিনেক—আত্মীয়বাড়িতে থাকা ছেড়েছি কিন্তু সুখসুবিধে পাই নি।

শান্তিভবনে এসেছিলাম হোলির কাছাকাছি—সালটা ১৩৪৪ সাল, ইংরিজী ১৯৩৮। জায়গাটি এত ভালো লেগেছিল যে এখানে এসে লেখা গল্পের প্রথম গল্পটিতে শান্তিভবনের উল্লেখ এবং ছাপ না পড়ে পারে নি। গল্পটির নাম 'হোলি'। ১৩৪৪ সালের 'শনিবারের চিঠি'র ফাল্গুনেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্যারাগ্রাফেই লিখেছিলাম—

"রাস্তা হইতেই বাড়িটা বেশ পছন্দ হইল, মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের জংসনের উপরেই তিনতলা বাড়ি। সামনে দক্ষিণে পার্ক; দক্ষিণের বাতাস খানিকটা পাওয়া যাইবে। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাড়িখানি বেশ ঝরঝরে, এমন কি নীচের তলাতেও ধরিত্রীগর্ভের ভোগবতীর করুণা বেগবতী নয়। দোতলায় উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না, বারান্দাটাই মন হরণ করিয়া লইল;—শুধু আরামপ্রদই নয়, বেশ একটা আভিজাত্যও আছে। বসন্তকাল—সন্ধ্যায় একখানা ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিলেই স্বর্গসুখ না হউক—ত্রিশঙ্কুলোকের সুখটাও অন্তত পাওয়া যাইবে।"

সেদিন সুবল যা বলেছিল—তাও আছে কয়েক লাইন পরে। সুবল বলেছিল—নামটা কিন্তু শান্তিভবন না হয়ে শান্তি-কুঞ্জ হলেই ভালো ছিল।

এখানকার সব থেকে আরামের ছিল প্রত্যেকের জন্য এক-একখানি কুঠুরির

ব্যবস্থা। লম্বায় ১২।১৪ ফুট, চওড়ায় বড় জোর ৮ ফুট। তার বেশী না। কিন্ত তাতে অসুবিধা ছিল না। একটা মানুষের থাকতে কতটা জায়গা লাগে ? ঋষিকল্প লেখক মহাত্মা টলস্টয়ের গল্প মনে পড়ে এ কথায়।

এরপর লিখেছিলাম—বেশ জায়গা; একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও দরজায় তালা পড়ে পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁডিতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা না বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখাশুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানেও হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলাও চলে না—করমর্দন করাও হয় না। কয়টি প্রাণী মাত্র সর্বজনপরিচিত —কালী, নরেন, ভজ এবং লোচন, সকলে ইহাদের বিশ্বাসও করে; সে অবশ্য বাধ্য হইয়া, কারণ উহাদের দুইজন চাকর, অপর দুইজন ঠাকুর। আর একটি প্রাণী—একটি লাল রঙের বিড়াল—সে সব ঘরেই যায়, আপন ভাষায় দুই-একটা কথাও বলে, কখনো কখনো কাপ-ডিশও ভাঙে, কোনো কোনো দিন পাশে শুইয়া গলা ঘড়ঘড় করিয়া আদরও জানায়। আমি উহার নাম দিয়াছি— 'রাঙা-সখি'।

শান্তিভবনের কথা এত করে বলছি এই কারণে যে আমার সাহিত্য-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে এইখানে। জীবনের পটপরিবর্তনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই শান্তিভবনে থাকতেই। এখানে প্রায় দেড়বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই 'ধাত্রীদেবতা' রচনা আরম্ভ এবং শেষ; 'কালিন্দী' এখানেই আরম্ভ করি। প্রথম ছ-মাসের লেখা এখানেই লিখেছি। এখানে থাকতেই ক্রমশ প্রকাশিত লেখাগুলি কিস্তীতে কিস্তীতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি। এ একটা অভ্যাস অবশ্য। কিন্তু সে অভ্যাস সাধনা-সাপেক্ষ। 'ধাত্রীদেবতা'র শেষ ছ-মাস এবং 'কালিন্দী'র প্রথম ছ-মাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এক সঙ্গেই দুখানি উপন্যাস কিস্তীতে কিস্তীতে লিখেছি তখন। লেখার তখন নেশা চেপেছে। 'ধাত্রীদেবতা' কিছুদিন প্রকাশিত হতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। বড় উপন্যাস লেখার কৌশল যেন আয়ত্ত হয়ে এসেছে আপনার অজ্ঞাতসারেই। সেই নেশাতে দেহের প্রতি চরম অবহেলা করে শুধু লিখেই গিয়েছি। সব দিন ভাত খাই নি। স্নানেরও সময় নির্দিষ্ট থাকে নি। সমস্ত দিন শুধু লিখেছি এবং চা খেয়েছি; মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে দু-এক টুকরো পাঁউরুটি, কখনও বা একটা ডিম। দিনে ৩০।৩৫ কাপ চা খেয়ে ক্ষিদে অনুভব করতেই পারতুম না। পরবর্তী কালে চায়ের বিজ্ঞাপনে আমার নাম ও ছবি বের করেছিল। সেটা আমি সাহিত্যিক দাবিতে দিই নি, ওই 'চাতাল' দাবিতে দিয়েছি। আমাদের ও অঞ্চলে মাতালের সঙ্গে মিল রেখে 'চাতাল' শব্দটা প্রচলিত আছে।

এই সময়ে আমার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মশায়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই মানুষটির স্নেহে এবং অন্তরের উদার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন মাটির বাংলার খাঁটি মানুষ আর আমি দেখি নি। বাংলার সমাজ বাংলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় তাঁর বাক্যে ব্যবহারে ও সৌজন্যে মূর্তি ধরে দেখা দিয়ে সেকেলে মিষ্টি হাসি হেসে সম্ভাষণ জানাত। এই মানুষ বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রথম সার্থক ইতিহাস। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া ঘটনাটিও আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই ঘটনায় হাঁ ও না-এর উপর পরবর্তী কালের জীবন নির্ভর করেছে। ঘটনাটির কথাই বলি।

একদিন ভৃত্য কালী এসে ডাকলে, আপনার ফোন এসেছে!

শান্তিভবনে ফোন ছিল। ফোন ধরলাম, দেখলাম 'শনিবারের চিঠি'র আপিস থেকে সুবল ফোন করছে। বললে—ওহে, তোমাকে ডাঃ দীনেশ সেন মশায় একবার ডেকেছেন।

বিস্মিত হলাম—ডাঃ দীনেশ সেন মশায়?

—হ্যাঁ। 'আনন্দবাজার' আপিস থেকে ফোন করে খবরটা তোমাকে দিতে বললে। তোমার ঠিকানাও জিজ্ঞেস করলে।

ফোন ছেড়ে দিলে সুবল। আমি ভেবেই পেলাম না কি জন্যে তিনি ডাকবেন আমায়। ঘণ্টাদুয়েক পর আবার ফোন এল, এবার এল 'আনন্দবাজার'

থেকে।—আপনাকে ডাঃ দীনেশ সেন মশায় খুঁজছেন। আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আমরা ওবেলা 'শনিবারের চিঠি'তে জানিয়েছিলাম। উনি এসেছিলেন আমাদের এখানে। আবার এখন ফোন করেছেন—আপনার কোনো জবাব পেয়েছি কি না। আপনি ওঁকে ফোন করে জানান কখন যাবেন। গাইডেই পাবেন ওঁর নাম্বার। উনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন।

সত্য বলতে-কি আমি বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লাম। ডাঃ সেন এমন ভাবে খুঁজছেন কেন? কোনো লেখা ভালো লাগলে অবশ্য রসিক সাহিত্য সাধক ব্যক্তি খোঁজ করে থাকেন। কিন্তু এমন ব্যস্ত হবার কথা তো নয়।

যাই হোক ফোন করলাম। তিনি আমার নাম শুনেই বললেন, আরে বাবা আপনাকে খুঁজে হায়রান, বৃদ্ধবয়সে 'আনন্দবাজার' পর্যন্ত ছুটে গিয়েছি। তা ওরা বলতে পারলে না ঠিকানা। 'শনিবারের চিঠি'তে ফোন করলে, তারা বললে কোন বোর্ডিং-এ আপনি থাকেন। বললে, খবর দেবে। আমি আর ঘুরতে পারলাম না। আমার ঘোড়াটাও দুর্বল। বেহালা পর্যন্ত ফিরতে দম থাকবে না বলে আর এগুতে সাহস করলাম না। আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। কখন আসছেন বলুন।

বললাম—কাল যাব।

—নিশ্চয় কাল। যেন ভুল না হয়।

পরের দিন—'শনিবারের চিঠি'তে গিয়ে—সেখানে রাস্তার হালহদিস জেনে, ফড়েপুকুরের মোড়ে ট্রামে চড়লাম, সঙ্গে সজনীকান্তও ছিলেন, তিনিও এসপ্লানেডে নেমে কোথাও যাবেন। ট্রামে একটু গিয়েই পেলাম শৈলজানন্দকে। তিনি উঠলেন শ্যামপুকুরের মোড়ে। যাচ্ছেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো। ওখানে তিনি তখন চাকরি নিয়েছেন গল্প ও সংলাপ লেখক হিসেবে। ট্রামে ভিড় ছিল না; সময়টা এগারটার পর। গল্প জমে উঠল। শৈলজানন্দই তাঁর স্টুডিয়ো জীবনের গল্প করলেন। সে গল্প দুঃখজনক। অনেক অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়।

এসপ্লানেডে এসে তিনজনের ছাড়াছাড়ি হল। আমি বেহালার ট্রামে চড়লাম।

সেন মশায়ের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসিমুখে আমাকে গ্রহণ করলেন—আসুন আসুন, বাবা আসুন।

এই সম্বোধনেই আমি অভিভূত হলাম। মনে হল যেন দেশকাল পালটে গিয়ে মহানগরীর থেকে, ১৯৩৮ সাল থেকে—বাংলার পল্লীতে ১৩৪৪ সাল এসে পৌঁছে গেছে। এ ভাষা হারিয়ে গেল বাংলা দেশ থেকে—এ হৃদয় হারিয়ে গেল। সকল বাংলা থেকে গেল কি না জানি না—মহানগরী থেকে এবং বাংলা-সাহিত্য থেকে গেল।

বাংলা-সাহিত্যে কথোপকথনের ভাষা আশ্চর্য রকমের মার্জিত হয়েছে। ধারালো হয়েছে—ঝকঝকে হয়েছে কিন্তু মধু হারিয়েছে—প্রেম হারিয়েছে—নিরাভরণ লাবণ্যের মাধুর্য হারিয়েছে এ কথা বলতে আজ দ্বিধা করব না। আজকের কথোপকথনে, প্যাঁচ মেরে কথা কাটাকাটির পালা জমাবার পথ প্রশস্ত হয়েছে কিন্তু আত্মীয়তা স্থাপনের সোজা সরল রাস্তাটা হারিয়ে গেছে। সম্বোধনের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। এ কালে—'বাবা আসুন' এ কথা শিক্ষিত মানুষের রসনা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারবে না। কিন্তু কী নিবিড় স্নেহ এর মধ্যে। অথচ এর মধ্যে কী যে আপত্তিজনক তা কেউ বোঝাতে পারবেন না। ইংরিজী আমি ভালো জানি না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির অল্প বয়সীকে my son বলে সম্বোধন ইংরিজীতে অচল বলে মনে হয় না। এখন মশায় ছাড়া সম্বোধন নাই।

ঘরের মধ্যে সে দিন খ্যাতিমান সাহিত্যিক আমাদের অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসে ছিলেন। বোধ করি এম-এ পরীক্ষার বাংলা খাতা দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিনলেও তিনি আমাকে চিনতেন না। চিনিয়ে দিলেন ডাঃ সেন। এবং মুখোপাধ্যায়কে বসতে অনুরোধ করে বললেন—এঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, সে কথাটা সেরে নি। আপনি (কি তুমি আমার ঠিক মনে হচ্ছে না) একটু বসুন।

বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে পিছন দিকে ছোট্ট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরখানির চারিপাশে স্তূপীকৃত পুঁথি এবং পুরোনো বই, মেঝেতে টেবিলে চেয়ারে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। আমাকে বললেন—ঘরে ধুলো আছে বাবা। মা সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পদরজ। এ সব এই পুঁথির ধুলো। কার যে কত বয়ঃক্রম তা বলতে পারব না। তবে পাঁচশো বছর বয়স দু-একখানার আছে গো। এ

ঘরে আমি কাউকে হাত দিতে দিই নে। নিজে হাতে মাঝে মাঝে ঝাঁটপাট দি। বস্থন, এখানেই বস্থন কোনো রকমে।

তারপর বললেন—বম্বের বম্বে টকীজের হিমাংশু রায়কে জানেন? সে আমার শ্যালকপুত্র। আর ডাঃ স্থরেন্দ্র দাশগুপ্তের সম্বন্ধী। সে আমাকে চিঠি লিখেছে। আপনাকে বম্বে যেতে হবে বাবা।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন—সেখানে তারা একজন বাঙালী গল্প লেখক নেবে। আপনার লেখা পড়ে ভালো লেগেছে। আপনাকে চায় সে।

—আমাকে চান তিনি?

—হ্যাঁ। লিখেছে, আবার কাল স্থরেনকে তারও করেছে। আপনি চলে যান সেখানে। তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট হবে আপনার সঙ্গে—প্রথম বছর ৩৫০ দ্বিতীয় বছর ৪৫০ তৃতীয় বছরে ৫৫০ পাবেন।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি এখানে মাসে চল্লিশ টাকা নিয়মিত উপার্জন করতে পারি না। পথে আজ শৈলজানন্দের মুখে শুনে এসেছি—নিউ থিয়েটার্স তাঁকে দেড়শো কি দুশো দেয়। সেন মশায়ের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

সেন মশায় বলে গেলেন—তিন বছরের পর আবার কণ্ট্রাক্ট হতে পারবে। হবেও। তবে সে তো আর লেখাপড়া কথা নয়! আপনি চলে যান, যেতে টাকাকড়ি দরকার হলে আমি দেব আপনাকে।

কি ভেবেছিলাম, কোন তর্ক, কোন হিসেব মনের মধ্যে সেদিন উঠেছিল—মনে নেই, তবে এইটুকু ভুলি নি এবং কোন দিন ভুলব না যে—আমার মন সায় দেয় নি, মনে আমি কোন উৎসাহ অনুভব করি নি, বরং বেদনাই অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল—এ যাওয়া আমার সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যাওয়া হবে।

সেন মশায় সস্নেহে বলেছিলেন—তা হলে কবে যেতে পারবেন বাবা? আমি তার করব।

আমি অভিভূত ভাবেই বলেছিলাম—আজ আমি এ কথার উত্তর দিতে পারব না। আমাকে সময় দিন।

সেন মশাই হেসে বলেছিলেন—মা ঠাকরুনের মত নেবেন?

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর।

আমি সলজ্জভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম—আমার মা আছেন, তাঁর অনুমতি চাই—

—বাবার মা বেঁচে আছেন? ভাগ্যবান গো আপনি। নিশ্চয় তাঁকে লিখুন—বউমাকে লিখুন। নিশ্চয় তাঁদের মত চাই বই কি। যারা চায় না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আপনার নিজের মত আছে তো?

—সেও আজ বলতে পারব না। ভেবে দেখতে সময় দিন।

—ক দিন?

—এক সপ্তাহ।

—না। সে সময় হিমাংশু দেবে না। তিন দিন। তিন দিন পর রবিবার। সকালে আপনি আসবেন এখানে।

আমি প্রণাম করতে গেলাম, তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—না।

অদ্ভুত একটা মনের অবস্থা তখন। ঠিক বুঝানো যায় না। যেন একটা মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কিছু ঘটবার উপক্রম হয়েছে—আমার চারিপাশে আমাকে ঘিরে ফেলেছে এমন অবস্থা। ফেরবার পথে মাঠে বসে থাকলাম রাত্রি পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ ফিরে পেলাম মনের জোর। স্থির করে ফেললাম না যাব না। এই পথের সাধনা ছেড়ে আমি যাব না। তাতে আমার যা ঘটে ঘটুক।

পরদিন বাড়িতে চিঠি দিলাম মত জানাতে। সঙ্গীদের বললাম। সজনীকান্ত প্রথমেই বলে উঠলেন—চলে যাও। কি করবে এ করে?

আমি বললাম—না। আমি যাব না ঠিক করেছি।

সজনীকান্ত আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—তোমার জয় হোক।

বাড়ি থেকে চিঠিও পেলাম—পিসীমা, মা, স্ত্রী সকলেই আমাকে সমর্থন করেছেন। মনে কোনো কিন্তু রইল না, প্রসন্নতায় তৃপ্তি অনুভব করলাম।

দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম—আশীর্বাদ অভিশাপ যা তোমার ইচ্ছা তাই দিয়ো আমাকে—তোমার পূজা করার অধিকার থেকে শুধু আমাকে বঞ্চিত করো না।

তিনদিন পর তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন—মন ঠিক হয়েছে বাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যেতে পারব না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—মায়েদের মত হল না?

আমি মায়ের চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম। আমার মায়ের হাতের লেখা সেকালে ছিল অতি সুন্দর। সোজা সারিতে নিটোল মুক্তার মতো হরফগুলি নিপুণ গ্রন্থনে তারেগাঁথা মালার মতো সাজানো মনে হত; দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। তিনি বললেন, আপনার মায়ের লেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ততক্ষণে তিনি পড়েছেন মায়ের চিঠির প্রথম পংক্তি। মা লিখেছিলেন—তুমি এমন প্রলোভন জয় করিয়াছ জানিয়া আমি পরম তৃপ্তি পাইয়াছি। সুখী হইয়াছি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি।

এরপর আরও ছিল।

তিনি চিঠি থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তা হলে যাওয়ার পক্ষে মত চান নি, যাবেন না এরই পক্ষে মত চেয়েছিলেন?

—আমি আমার মত লিখেছিলাম।

—কেন বাবা? আপনার অমত কিসে? চরিত্র চরিত্রবানের উপর নির্ভর করে। ভয় করলেই ভয়, সাহস করলেই ভয় জয় করা যায়।

আমি আমার মনটাকে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, এ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না, আমার মনে হচ্ছে সব হারিয়ে যাবে আমার।

—সব হারিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে আমার।

—আপনি তো কোথাও চাকরি করেন না?

—না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর অকস্মাৎ তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে আকর্ষণ করে বললেন, কাছে আসুন আমার।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ছেলে—তৃতীয় ছেলেকে ডাকলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, শোন এঁর কথা।

তারপর বললেন, গাড়ি আনতে বল।

তাঁর ব্রুহাম গাড়িখানির কথা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। সেই গাড়িতে আমায় নিয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

নিয়ে প্রথমেই গেলেন তাঁর বড়ছেলের বাড়ি। পৌত্র কবি সমর সেনকে ডেকে আমার পরিচয় দিয়ে সেই কথা বললেন। সমর সেন সেকালে খ্যাতিমান আধুনিক কবি ; কাব্যে তাঁর আধুনিকতার উগ্রতা তাঁর সম্পর্কে কোন কল্পনা করতে গেলেই সে কল্পনাকে ঝাঁঝালো করে তুলত। কিন্তু তাঁকে দেখে ভারি ভালো লেগেছিল। সুন্দর মিষ্টি চেহারা, কথাগুলি মিষ্টি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বয়সে তখন তরুণ, তখন তাঁর পাণ্ডিত্য কাঁটাভরা ডালের মাথায় বর্ণাঢ্য গোলাপ ফুলের মতোই হওয়া ছিল স্বাভাবিক। সেই ভয়ও ছিল আমার। কিন্তু কিছুক্ষণের আলাপেই দেখেছিলাম না–তা নয়। শুভ্র স্নিগ্ধ সৌরভময় যুঁই ফুলেরই সন্ধান মিলেছিল। প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন বলি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এঁদের মধ্যেও এই মাধুর্য দেখেছি।

ওখান থেকে আরও দু-তিন জায়গায় তিনি আমাকে সেদিন দেখিয়ে আমার কথা শুনিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে কবি কালিদাস রায় দাদার বাড়িও ছিল। কালি-দার সঙ্গে তখন পরিচয় স্বল্প।

সে যে তাঁর কী আনন্দ সে প্রকাশ করতে পারব না।

তিনি শেষে আমাকে আশীর্বাদ করে কালিঘাটের মোড়ে ট্রাম ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে শান্তিভবনে ফিরেছিলাম।

সেদিন আমার দেবতাই আমাকে যেতে দেন নি—তাঁরই আকর্ষণে আমি থাকতে পেরেছিলাম।

এরপর আরও একবার লোক এসেছিল। এবার লোক পাঠিয়েছিলেন ডাঃ স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়।

এসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্র মিত্র। এবার বেতনের হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ৪৫০৲ থেকে ৬৫০৲। কিন্তু তাতেও না বলতে আর আমার দ্বিধাই ছিল না।

এরই ঠিক দিন তিনেক পরে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হল। তিনি বললেন—আপনি নিলেন না—আমি নিলাম ও কাজ। বম্বে যাচ্ছি আমি।

আমার জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল সেই দিন।

দুঃখে আমার মৃত্যু হয় হোক আমি এ সাধনা ছাড়ব না। এখানে থাকতেই 'ধাত্রীদেবতা' পুস্তকাকারে বের হল। সজনীকান্ত মনোরম প্রচ্ছদপট করে 'ধাত্রী-দেবতা' প্রকাশ করলেন। শান্তিভবন আমার সাহিত্য জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। ওইখানটি ছাড়বার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু চায়ের নেশা ছাড়বার জন্যেই আমাকে শান্তিভবন ছাড়তে হল। জেলখানা থেকে পেটের গণ্ডগোল অজীর্ণ ব্যাধি নিয়ে ফিরেছিলাম। সেটা পাটনায় গিয়ে এসে সেরেছিল। শান্তি-ভবনে চায়ের অত্যাচারে আবার চাড়া দিয়ে উঠল। তাতেও সাবধান হই নি। কিন্তু একমাসে চায়ের দাম দিলাম ছাপ্পান্ন টাকা। অবশ্য সবই আমি খাই নি। তখন আমার বড় ছেলে এসে আমার কাছেই রয়েছে, এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবে। বন্ধুবান্ধবও আসেন। কিন্তু তবু ছাপ্পান্ন টাকা চায়ের দাম? তখন দু-পয়সা চার-পয়সা চায়ের কাপ।

ছাড়লাম শান্তিভবন।

কোথায় যাব? সজনীকান্ত আহ্বান জানালেন—আমার এখানে এস উপস্থিত। একখানা ঘর এখানে আছে। উপস্থিত খাও আমার বাড়িতে। তারপর যা হয় ব্যবস্থা হবে। ছাপ্পান্ন টাকার চায়ের অর্ধেক খেলেও সে তো কম নয়। মরে যাবে তুমি।

এলাম মোহনবাগান রোয়ে।

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যে বাড়িতে থাকতেন, তার নিচের

তলায় সজনীকান্তের একখানি ঘর নেওয়া ছিল। সেই ঘরে এসে আড্ডা পাতলাম।

সজনীকান্তের স্ত্রী শ্রীসুধা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন মিষ্টভাষিণী মধুর চরিত্র সচরাচর দেখা যায় না। এখানে এসে তাঁর হাতের সযত্ন রান্নায় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ চায়ের ব্যবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলাম। কোন মাসে এসেছিলাম ঠিক মনে নেই—তবে পুজোর আগে।

সেবার পুজোয় 'পিতাপুত্র,' 'বেদেনী' এ-গল্পদুটি এখানেই লিখেছিলাম। 'প্রবাসী'তে 'কালিন্দী' চলছে। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আসেন বাইশিক্ল চেপে; বলেন, ভালো হচ্ছে মশাই। খুব ভালো। 'কালিন্দী'। চালান চালান।

এখানে থাকতেই নূতনকালের শক্তিশালী লেখক শ্রীমান নারায়ণ গাঙ্গুলীকে প্রথম দেখলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর গল্প তখন চকিত করেছে সকলকে। মনে মনে শুনতে পাই নূতন জনের পদধ্বনি।

একদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসেব বাড়িতেই স্নান করে ঘরে যাচ্ছি, শুনলাম শ্রীমান নারায়ণ এসেছেন। ভিজে কাপড় রেখে মাথায় চিরুনি দিয়েই খালি গায়েই বোধ করি ব্যগ্রতাভরে দেখতে এসেছিলাম। শুনেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেবার বোধ হয় পরীক্ষা দিয়েছেন কি দেবেন। অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। এই তো—একেই তো চাইছে দেশ।

এসে দেখলাম আমারই মতো ক্ষীণতনু অথচ ধারালো চেহারা সুকুমার একটি তরুণ। মুখে চোখে প্রসন্নতা। অন্তরে জ্যেষ্ঠদের জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। কোমল মন, তাতে বিনয় যেন পুষ্পশোভার মতো বিকশিত। তার রূপে গন্ধে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রথম দিনই।

এদের মতো লোকই তো দরকার। আমার নিজের কথা আমি তো জানি—অভিজ্ঞতার সম্বল আমার যাই থাক—যতই থাক, দেশকে আমি যেমনই জানি, আমার মধ্যে যে পাণ্ডিত্যের অভাব রয়েছে। নারাণের যে সম্পদ আছে। এরপর 'ভারতবর্ষে' যেদিন নারাণের উপন্যাস—'উপনিবেশে'র শুরু পড়লাম সেদিন আর সন্দেহ রইল না। নারায়ণ তখন কোথায় থাকতেন জানি না,

ভারতবর্ষের ঠিকানাতেই অভিনন্দন জানিয়ে তাকে চিঠি লিখেছিলাম। মনের কথা সব লেখা যায় না। সব লিখতে পারি নি। মনে মনে বলেছিলাম—ষোল কলায় পরিপূর্ণ হও তুমি।

এখানে এসে সব থেকে বড় লাভ হয়েছিল—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শ। তাঁকে ভালো করে জানার সৌভাগ্য। এর আগেই তাঁর সংস্পর্শে অনেকবার এসেছি কিন্তু একবাড়িতে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে যা দেখলাম যা জানলাম তা আগেকার পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

* * *

অনেক কাল আগে তখন আমার প্রথম যৌবন, সেই সময় বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর 'মোগল-বিদুষী' এবং 'বেগম সমরু' ভি-পি-তে কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়েছিলাম। মধ্যে মাঝে মাসিকপত্রে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দু-একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম। ভারি ভালো লেগেছিল একটি প্রবন্ধের কাহিনী। তাতে সেকালের এক চৌকিদারের মৃত্যুর পর তার সহায়হীন বিধবা স্ত্রী দুটি ছেলে নিয়ে বিব্রত হয়ে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিল—স্বামীর পদের অর্থাৎ চৌকিদারির জন্য। জানিয়েছিল, যোগ্যতার সঙ্গেই সে এ দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার দরখাস্ত মেয়েছেলের দরখাস্ত বলে ফেলে দেন নি, কৌতূহলী হয়ে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার যোগ্যতার কথা। মেয়েটি জানিয়েছিল যে, সে লাঠিয়ালের কন্যা, লাঠিয়ালের স্ত্রী, নিজেও লাঠি ধরতে পারে, চোর হোক ডাকাত হোক, তাদের বাধা দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন যে, সে পরীক্ষা দিতে সম্মত আছে কি না? আবক্ষ ঘোমটা টেনেই মেয়েটি কথা বলছিল। ঘোমটাসুদ্ধ মাথা নেড়েই সে সম্মতি জানালে। লোকে হাসলে। সাহেব কিন্তু হাসলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা হবে এবং পুলিস সাহেবকে বললেন, তিনি যেন কনস্টেবলদের মধ্য থেকে ভালো দু-তিন জন লাঠিখেলোয়াড় বাছাই করে রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে কালেক্টরী বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সেই লোকারণ্যের মধ্যে অবগুণ্ঠন-বতী বিধবা এসে তার স্বামীর বাঁশের লাঠি সামনে রেখে সাহেবকে এবং জনতাকে প্রণাম করে উঠে গাছকোমর বেঁধে কাছা এঁটে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দেখা

গেল লজ্জাশীলা বাংলার বাগ্‌দীবধূটির চেহারা পালটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে হয়ে গেল আর এক মেয়ে, বলা চলে ভীমা ভয়ঙ্করী। লাঠিখেলা আরম্ভ হল। সে খেলা—খেলা নয়, মারাত্মক যুদ্ধই। এক দিকে পশ্চিমদেশী সিপাহীদের মর্দানার ইজ্জৎ, অন্য দিকে এই মেয়েটির অন্নসংস্থানের দায়। জিতেছিল সেই মেয়েটিই এবং শুধু চাকরিই পায় নি, পুরস্কারও পেয়েছিল।

এই কাহিনীকে যিনি উদ্ধার করেছিলেন পুরাতন কাগজ ঘেঁটে, তাঁকে সেদিন দূর থেকেই নমস্কার জানিয়েছিলাম ; অবশ্য তাঁর কাজের সম্পূর্ণ মূল্য তখন বুঝতে পারি নি, বুঝবার যোগ্যতা হয় নি। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর কর্মের পূর্ণ মূল্য বুঝতে অনেক দেরি লেগেছে। বুঝতে যেন চাই নি ইচ্ছে করে। তার একটু কারণও ছিল। মনে হত আধুনিক কালের কবি এবং কথাসাহিত্যিকদের তিনি যেন খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। কথাটা অসত্যও নয় ; এই মনোভাবের মূলে 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ানে'র লেখক শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর প্রভাব ছিল। আরও কিছু ছিল। সে হল আমাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত আচার আচরণ। কবি এবং গল্পলেখকদের মনোভাব তাঁর প্রতি সেকালে প্রসন্ন দেখি নি। তাঁর নিজের আচার-আচরণ এমনই সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন এবং মর্যাদাপূর্ণ ছিল যে, তাঁর পক্ষে আচার বা মর্যাদা-ভ্রষ্টতা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার পত্রযোগে। আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' সর্বাগ্রে আমি 'প্রবাসী'তেই পাঠিয়েছিলাম, আট মাস পড়ে ছিল 'প্রবাসী'র দপ্তরে ; এর মধ্যে অন্তত আট জোড়া রিপ্লাই-কার্ড অবশ্যই আমি লিখেছিলাম এবং প্রত্যুত্তরে একই বাঁধা-গৎ 'গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে' জবাব পেয়েছি। নীচে সই থাকত তাঁরই—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একটু বাঁকা লাইন, অক্ষরগুলির গোড়ার দিকটা মোটা, তার পর ক্রমশ সরু এবং জড়ানো হয়ে যেত। তারপর একদা কলকাতায় এসে 'প্রবাসী' আপিসে গেলাম। দেখলাম, ছোট-করে-চুল-ছাঁটা, সবলদেহ, নির্ভীকদৃষ্টি, একটি মানুষ দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন। বাকি সকলে দক্ষিণমুখী, একজন তাঁর দিকে মুখ করে বসে আছেন। গিয়ে বললাম, আমার লেখা ফেরত নিতে এসেছি।

গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—লেখার নাম ? আপনার নাম ?

উত্তর দিতেই বিনাবাক্যব্যয়ে ফাইল বের করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেখাটি দিয়ে দিলেন। তার পর আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

তার পর 'বঙ্গশ্রী'র আপিসে তাঁকে দেখলাম। সজনীকান্তের আহ্বানে তিনি এলেন। সেই দিন তাঁর প্রতি 'বঙ্গশ্রী'র লেখকগোষ্ঠীর যে সম্ভ্রম দেখলাম, তাতে একটু সচকিত হলাম। বন্ধু কিরণ রায় সেদিন প্রথম আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব। এবং সেই দিনই শুনলাম, আচার্য যদুনাথ সরকারের তিনি একনিষ্ঠ এবং অতিপ্রিয় শিষ্য।

আচার্য যদুনাথ আমার কাছে আমার প্রায় শৈশব থেকেই আদর্শ পুরুষ এবং ঋষিতুল্য পণ্ডিত। আমার মা প্রায়ই তাঁর নাম আমার কাছে বলতেন সেই ছেলেবেলা থেকে। আচার্য যদুনাথ পাটনায় ছিলেন দীর্ঘকাল—আমার মাও পাটনার মেয়ে; বাঙালী সমাজে যদুনাথের ছাত্র-জীবনের খ্যাতি, তাঁর 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ'-বৃত্তিপ্রাপ্তি বিপুল গৌরবের কথা ছিল। তার উপর ছিল তাঁর আদর্শ দৃঢ় চরিত্রের খ্যাতি। সেই কথা মা আমাকে প্রায়ই বলতেন। বলতেন, সে আমলে নন্দলাল বলে একজন যদুনাথের সহপাঠী এবং প্রতিযোগী ছিলেন—বুদ্ধিতে তিনি কম ছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধি প্রতিভা ও চরিত্রের অভাবে তৈলহীন প্রদীপের মতো। যদুনাথের সাধনা, তাঁর চরিত্রবল তাঁকে নিয়ে চলেছে সিদ্ধির পথে, চরিত্রবলহীন নন্দলাল বুদ্বুদের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। যদুনাথ নাকি অশুচি অশুদ্ধ কিছুকে সহ্য করেন না।

ঠিক এই কারণেই সেদিন কিরণের কথা অগ্রাহ্য করি নি।

তারপর সেবার পূজার সময় সজনীকান্ত বললেন, একটি গল্প 'প্রবাসী'তে দিয়ে আসুন।

আমি ইতস্তত করে 'রসকলি'র অভিজ্ঞতার কথা বললাম। তিনি বললেন, এখন আর তা হবে না। আগের ব্যাপারে চিঠিতে সই করে ব্রজেনদা সব দায়টা ঘাড়ে করলেও দায়ী তিনি নন। কারণ গল্পনির্বাচন করেন অন্য লোকে। এখন সে ধারার খানিকটা বদল হয়েছে।

'ঘাসের ফুল' গল্পটি হাতে নিয়ে গেলাম 'প্রবাসী' আপিসে।

ব্রজেনদা গল্পটি খুলে আমার নাম দেখে বললেন—বসুন। আপনি তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্জে? পরশু, চা দাও।

তার পর কাজে মন দিলেন। চা খেয়ে সভয়ে বললাম, কবে খবর নেব?

—খবর? একটু হাসি তাঁর মুখে যেন খেলে গেল।

—মানে, পুজো-সংখ্যার জন্যে দিচ্ছি তো—

নেবেন। আবারও একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু তুললেন; এটি ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। লেখাটি সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল।

তার পর 'প্রবাসী'তে অনেক লেখা বের হল। কত বার গেলাম—প্রুফ দেখতে, দক্ষিণা আনতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে, ব্রজেনদা চা খাইয়েছেন, মধ্যে মধ্যে গল্প করেছেন। পরিচয় গাঢ় হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি পড়েছি। শ্রদ্ধাও বেড়েছে।

হঠাৎ ঘটনাচক্রে এর পর এসে পড়লাম মানুষটির একেবারে অত্যন্ত সন্নিকটে। একেবারে এক বাড়িতে। উপরতলায় তিনি, নীচের তলায় আমি।

১৯৩৯ সালে "ভাগ্যকুল ম্যান্‌সন" থেকে তিনি এলেন মোহনবাগান রো-র একখানি বাড়িতে। আমি তার নিচের তলায় এলাম।

ঘরখানি ছিল সজনীকান্তের। তিনি বই রাখবেন বলে ঘরখানা ব্রজেনদার কাছে ভাড়া নিয়েছিলেন একথা আগেই বলেছি। প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে গম্ভীব ব্রজেনদা এসে বললেন, ভালো, হল ভায়া। খুব ভালো হল। মধ্যে মধ্যে গল্পগুজব করা যাবে। তোমারও ভালো হল, 'প্রবাসী'র লেখা দিতে যেতে হবে না তোমাকে। আমি নিয়ে যাব।

বাড়িতে ব্রজেনদা হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি পরনে, খালি গা, গলায় পৈতে—খাঁটি এ দেশের মানুষ। হাতে কাগজের তাড়া নিয়ে চলে গেলেন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। দশটা বাজতেই বেরিয়ে গেলেন আপিসে।

এই সময়ে দেখলাম ব্রজেনদার তপস্বী রূপ।

এমন তন্ময় তপস্যা, এমন বিরামহীন তপস্যা এ যুগে দেখি নি। ধূলিধূসর জরাজীর্ণ কাগজ—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল নিয়ে বসে কাজ করে চলেছেন। কাগজ কাটছেন, আঁটছেন, তার পর লিখছেন মন্তব্য আবার পাতা উল্টাচ্ছেন,

হঠাৎ উঠে চটি পায়ে দিয়ে চলেছেন—সজনীবাবু! সজনীবাবু! সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, পরামর্শ চাই। দিনের পর দিন। রাত্রির পর রাত্রি। কোথায় আছে পুরনো সংস্করণের বই, কোথায় আছে কাগজ, খোঁজ করে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সেখানে। ঠিক তেমনি ভাবে—অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে স্বর্ণসন্ধানীরা যে ভাবে বনের মধ্যে পথ হেঁটে চলে, মাটি খোঁড়ে, সেই ভাবে। যাওয়া-আসার কাজে তিনি একটু অপটু ছিলেন, কোন একজনকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারতেন না। তাঁর ধ্যানজ্ঞান এমন কি নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নও ছিল এই গবেষণা। আমি অবাক হয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, এতটা মানুষ পারে? আমার নিজের জীবনেও আমি নিত্য নিয়মিত শ্রম করি; নিত্য লিখি; এ শৃঙ্খলাকে কোনোদিন ভাঙি না; সে নিয়ে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমিও বিস্মিত হলাম। শিখলাম তাঁর কাছে। শুধু এইটুকুই নয়, আরও দেখলাম মানুষটির জীবনের আর একটি দিক, এই গম্ভীর বাহ্যত-কঠোর মানুষটির স্নেহতৃষ্ণা।

সন্তানসন্ততিহীন জীবন ও সংসার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে নিবিড় ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরেছেন, পরস্পরের জন্য কি ব্যাকুলতা, কি চিন্তা! তারই মধ্যে মাঝে মাঝে সজনীকান্তের শিশুকন্যা রমাকে নিয়ে কতো সমাদর!

জীবনে ব্যয়বাহুল্য নেই—কার্পণ্যও নেই, কেউ একটি পয়সা তাঁর কাছে পেলে কাগজে মুড়ে সেটি পকেটে নিয়ে ফেরেন। ডাকে বিলেত থেকে আসে দুর্লভ বইয়ের পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ। এই সময়ে ব্রজেনদা মধ্যে মধ্যে বসে কবি দেবেন সেনের কবিতা আবৃত্তি করতেন। বধূর পায়ের মল ঝমর ঝম বাজতো তাঁর মুখে। বলতেন—ভায়া, নেহাত 'শুষ্কং কাষ্ঠং' মনে করো না। রসতৃষ্ণা আছে।

পূজার সময় মাসখানেক নিয়মিত তিনি চেঞ্জে যেতেন বউদিদিকে নিয়ে। বলতেন—আমার তো কাজ আছে, গবেষণার অনুসন্ধানের কাজ আছে। ওর কি আছে?

এমন নিবিড় দাম্পত্য জীবন আমি দেখি নি।

ভোরবেলা আমি উঠি। ব্রজেনদাও ভোরবেলা উঠতেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনতাম, এসে বাইরে উঠে তিনি বলছেন—হ্যাঁ গা, গাড়ুতে আজ জল রাখ নি?

মুহূর্তে সচকিত কণ্ঠে বউদির কথা শুনতাম—ঐঃ যাঃ! ভুলে গিয়েছি।

ব্রজেনদার সহাস্য কথা শুনতাম—ঠিক আছে। আমি নিচ্ছি।

আকুল হয়ে উঠতেন স্ত্রী—না না, আমি যাই।

স্বামী উৎকণ্ঠিত হতেন এবার—না। উঠো না, সকালে উঠলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

—না—না—না। আমি যাই। খবরদার তুমি জল নেবে না।

—আঃ! না, উঠো না তুমি। বারণ করছি আমি। আমি নিচ্ছি জল।

—না। আমার দিব্যি রইল। মাথা খাবে আমার।

অবাক হয়ে বসে শুনতাম। কখনোও হাসি আসতো এই প্রৌঢ় দম্পতির ছেলেমানুষি দেখে, কখনোও চোখে জল আসত। বুঝতে পারতাম—মনে হত একটা শূন্য ঘরে অনন্ত শূন্যের বাতাস ভেসে এসে ঢুকছে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো।

এখান থেকে চলে গেলাম আমি বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে!

সেখান থেকে নিত্য দশটা সাড়ে দশটায় আসতাম 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। একদিন হঠাৎ ব্রজেনদার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি তখন 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' সম্পাদনা আরম্ভ করেছেন। এরই মধ্যে মহিলা সম্পাদিত মাসিকপত্র নিয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেন। সেই নিয়েই কথা চলছিল। তিনি বলছিলেন—নসীপুর থেকে 'ভুবনমোহিনী দেবী' একখানি মাসিক পত্র বের করেছিলেন বহুকাল পূর্বে, তারই কথা। এবং পত্রিকার প্রকাশক এবং ম্যানেজার ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শুনে আমি বললাম, দাদা, তা হলে হয়েছে। ভুবনমোহিনী দেবী নামে মহিলা হলেও আসলে মহিলা নন। ওটি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তারের ছদ্মনাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি বললেন—তার অর্থ?

আমি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যগ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। যে কাব্যগ্রন্থের কবি মহিলা ভেবে সমালোচকেরা প্রশংসা করেছিলেন—বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন—এবং পরে কবির সঠিক পরিচয় পেয়ে এই প্রতারণার জন্য তাঁরা তিরস্কার করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন—তা হলেও সম্পাদনার

বেলা ও-কথা খাটবে না। ভুবনমোহিনীকে সামনে রেখে কাজ যেই করুক, সম্পাদনা ভুবনমোহিনীর বলেই গ্রহণ করব আমরা।

বললাম, আসলে যে ভুবনমোহিনী বল্লে কারও অস্তিত্বই ছিল না। আমি খুব ভালো করেই জানি—কারণ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরে গিয়ে লাভপুরের ছ মাইল দূরে কীর্ণাহারে বাস করেছেন। তাঁব দুই স্ত্রী। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এখনোও রয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুতেই মানলেন না, এবং আমাকে কটু কথাই বললেন—বললেন, এ বানিয়ে গল্প লেখা নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমিও কটু উত্তর দিয়ে উঠে এলাম। বললাম—আপনিই বা কি ঐতিহাসিক? একটি তথ্যের সংবাদ আমি দিচ্ছি, আপনি সন্ধান না করেই তাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন?

উঠে চলে এলাম।

ঠিক দিন চারেক পরেই একখানি পত্র পেলাম। ব্রজেনদা লিখছেন—'ভায়া, তোমার কথাই ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। পরে কাগজ ঘাঁটিয়া বাহির করিলাম—ভুবনমোহিনী নবীনচন্দ্র নিজেই। কিছু মনে করিও না। ইতি ব্রজেন্দ্রনাথ।'

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ল। পরের দিন প্রণাম করে এলাম।

এর পর তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' একে একে পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এলাম একদিন। 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' তহবিলে কিছু সাহায্যও দিয়েছিলাম। তাঁর সে কি আনন্দ! আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভায়া, দুটি গুণ তোমার আছে। সে দুটিতে যেন খাদ না মেশে। বুঝেছ? অন্যের কীর্তিকে কর্মকে স্বীকার করা, আর নিজের কর্মে ফাঁকি না দেওয়া। বাস্, ওতেই জীবনযুদ্ধে জয় হয়ে যাবে।

অল্প একটু হেসে ডান হাতখানি বুকের উপর রেখে একটু দুলতেন।

তার পর বললেন—আমাব 'বেগম সমরু' আবার ছাপা হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেব। আমাকে ভূমিকা লিখতে হবে কথাটা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এ কি মানুষ!

কীতির চেয়ে কীর্তিমান আমার কাছে বড়।

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এ তত্ত্ব যার জীবনে সত্য না-হয়ে ওঠে তার তিরোধানে সংসারের ক্ষতি তো বড় নয়; কারণ কীর্তিমানের চেয়ে কীর্তি বড় হলে এবং সেই কীর্তি সংসারে থেকে গেলে হিসেবের অঙ্কেই ওই কথা বলবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের তপস্যার নিষ্ঠা এবং মানুষ হিসেবে খাঁটিত্বই তাঁকে মহত্ত্ব দিয়েছিল। এবং তাঁর সাহচর্যে এসে এর শিক্ষা তাঁর কাছে আমি নিয়েছি।

মোহনবাগান রোয়ের জীবন এই সঞ্চয়ে ধন্য। কয়েক মাসের পক্ষে এ অনেক। সজনীকান্ত, তাঁর পত্নীর যত্ন, ব্রজেন্দ্রনাথকে এইভাবে জানা—নারায়ণের সঙ্গে পরিচয় এবং স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠা—এতো কম নয়।

এখান থেকে মাস কয়েক পরেই উঠলাম—

এখান থেকেই পরে এলাম আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে।

নির্মল বসুমহাশয় আমাকে নিয়ে এলেন। তিনি থাকতেন নিচে। আমি নিলাম দোতালার একখানা ঘর ভাড়া। দোতালাটা গোটাটাই তখন খালি পড়ে রয়েছে। এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই খবর পেলাম আমার স্ত্রীর ঘুষঘুষে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। তাঁকে কলকাতায় দেখানো দরকার। দোতালার বাকী ঘর তিনখানাও ভাড়া করলাম। সব সমেত ভাড়া ২৫৲ টাকা।

বাড়িখানার সামনেই শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি। এ বাড়ি ও বাড়ির মাঝখানে উঠানে একটা পাঁচীল শুধু। প্রথম দিনেই তিনি আমার দাদা হলেন। ভাই সম্বোধন করে যামিনীদা বললেন—ভাই, এইবার—এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন নয় সত্য করে বাঁচবেন। এ কাজ ঠিক করলেন।

হেসে বললেন—এতদিন তো ভূমিকা করেছেন। এবার জীবননাট্য শুরু হল। নির্মল সূত্রধারের কাজ করলে।

সত্যাই, শুরু হল নতুন জীবন। এইখানেই ছেদ টানলাম বর্তমানে।

সমাপ্ত